শহিদ-তর্পণ ঃ প্রসঙ্গ কাশ্মীর

নারায়ণ সান্যাল

SAHID-TARPAN : PRASANGA KASHMIR
Stories based on Kashmir-war by NARAYAN SANYAL
Published by Subhas Chandra Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073
Rs : 60/-

গ্রন্থক্রমিক : 121
রচনাকাল : নভেম্বর, 1999
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, 2000 অগ্রহায়ণ ১৪০৭

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়
পিছন মলাটের অলঙ্করণ : চণ্ডী লাহিড়ী

© মৌ সান্যাল

প্রুফ নিরীক্ষা : সুচিত্রা সান্যাল, অনুপম ঘোষ

দাম : ষাট টাকা

ISBN : 81-7612-688-8

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ সংস্থাপনা : 'দি মনিটর'
১৮ রডন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১৭

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

pathagar.net

ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, আঞ্চলিক রীতিনীতিকে একপাশে সরিয়ে রেখে
পঞ্চাশ বছর ধরে কাশ্মীর উপত্যকায় যাঁরা প্রতিবেশী
হানাদারদের ধর্মান্ধতাকে রুখতে শহিদ হয়েছেন,
সেই অযুত-নিযুত অনামা বীরদের উপলক্ষ করে
আদিসূরী :

- ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং (রাজপুতানা/হিন্দু)
- লেঃ কর্নেল দেওয়ান রঞ্জিৎ রাও (পঞ্জাব/শিখ)
- ব্রিগেডিয়ার এল. পি. সেন (বাঙালী/হিন্দু)
- মেজর সোমনাথ শর্মা (বিহার/হিন্দু)
- লেঃ কর্নেল ভি. ও. টি. ভাইক্স্ (বিদেশী/খ্রিস্টান)
- মিসেস্ ভাইক্স্ (বিদেশী/খ্রিস্টান)
- ব্রিগেডিয়ার ওসমান (যুক্তপ্রদেশ/মুসলমান)
- কর্নেল শিশিরকুমার চক্রবর্তী (ত্রিপুরা/হিন্দু)

প্রভৃতিদের শ্রদ্ধাবনম্র প্রণাম জানিয়ে—

pathagar.net

কৈফিয়ৎ

www.pathagar.net

গ্রন্থরচনার প্রেরণা :

কেন এ গ্রন্থটি রচনা করেছি সবার আগে সেই কৈফিয়তটাই দাখিল করি :

বিংশ শতাব্দি যখন তেতাল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া তখনকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে—

ঘটনা সিঙ্গাপুরের। বাংলার এক দামাল ছেলে তখন আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন সিঙ্গাপুরের বণিকশ্রেষ্ঠ এক ব্যবসায়ী— ব্রিজলাল জয়সওয়াল। নেতাজি তাঁর কাছে আজাদ হিন্দ ফান্ডের চাঁদার খাতাটা বাড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'আমার সহকর্মীরা বুকের রক্ত দিয়ে বন্দিনী দেশজননীকে মুক্ত করতে চাইছে। আমি আপনাদের মতো ব্যবসায়ীর কাছে রক্ত চাইছি না; দাবী করছি অর্থ! সেটাই আপনাদের দেশমাতৃকার প্রতি প্রদেয় অর্ঘ্য।'

ব্রিজলালজি কী বলেছিলেন বা করেছিলেন তা এ কেতাবে বলা হয়েছে। আমি নিজে ব্যবসায়ী নই। তবু সাহিত্য-ব্যবসায়ী তো বটে! তাই মনে হল 'কার্গিল-ফান্ড'-এ সামান্য অর্থদান করেই আমার পক্ষে বলা শোভন হবে না : তামাম শুদ্! কাশ্মীরে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে যা ঘটল— সম্প্রতি কার্গিলে যাঁরা শহিদ হলেন, তাঁদের উদ্দেশে কথাসাহিত্যিক হিসেবে আমি কী দিয়ে গেলাম? জওয়ানদের বীরত্বগাথা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়। সাংবাদিকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেসব কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, প্রকাশ করেছেন দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে। কিন্তু এতদিনে তা তো পুরনো কাগজ খরিদনেবালার তুলাদণ্ডে 'ওজনদাঁড়িত' হয়ে মুড়ি-মশলার ঠোঙায় রূপান্তরিত। ভবিষ্যৎকাল কীভাবে জানবে তাঁদের বীরত্বগাথা? দেবার মতো যথেষ্ট রক্ত নেই শরীরে, নেই প্রয়োজনের তুলনায় সাহায্য করার মতো আর্থিক সামর্থ্য। অথচ দৃষ্টিশক্তি, ডানহাত ও মস্তিষ্ক তো আজও সচল। তাহলে গুণকর্মের বিভাগ মেনে নিয়ে রচনার মাধ্যমেই শহিদ-তর্পণ করি না কেন?

কাশ্মীর-যুদ্ধ অর্ধশতাব্দিব্যাপী। অসংখ্য জওয়ান প্রাণ দিয়েছেন কাশ্মীর যুদ্ধে— প্যাটেলের নির্দেশে, শাস্ত্রীজির আদেশে, ইন্দিরাজির ফরমানে এবং বর্তমানে অটলবিহারীজির আজ্ঞায়— সকলের সব কথা বলা সম্ভবপর নয়, আমি শুধু শতাব্দি, তথা সহস্রাব্দির এই শেষ বছরে যাঁরা কাশ্মীরে শহিদ হয়েছেন তাঁদের ভিতর মাত্র কয়েকজনের কথা এখানে সাজিয়ে দিয়েছি।

তাহলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে শহিদ কী? শহিদ কে?

pathagar.net

শহিদ : কে?

'শহিদ' শব্দের ব্যাখ্যা দিতে সংসদ বাংলা অভিধান বলছেন, 'ধর্মযুদ্ধে নিহত বা ন্যায়সঙ্গত অধিকারলাভের জন্য আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তি'।

রাজশেখর চলন্তিকা-য় বললেন, 'ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি।'

'ন্যায়সঙ্গত অধিকার'-এর প্রসঙ্গ আপাতত মুলতুবি রেখে ওই 'কমন ডিনোমিনেটর'-টিকে প্রথমে সমঝে নেওয়া যাক : 'ধর্ম' কী?

কারণ কাশ্মীর-যুদ্ধে পঞ্চাশ বছর ধরে যুযুধান দু-পক্ষের মধ্যে একদল অব্যতিক্রম ইসলামধর্মী, অপরদলে আছেন— হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক ইত্যাদি, প্রভৃতি।

ফলে 'ধর্মের সংজ্ঞাটা' আবশ্যিক হয়ে পড়ছে। জেনে নিতে : এটা কি সর্বধর্মসমন্বয়ের বিরুদ্ধে ইসলামের জেহাদ?

পণ্ডিতদের মতে : ধর্ম কী?

সংসদ অভিধান বলছেন, 'ধর্ম : ঈশ্বরোপাসনা পদ্ধতি, আচার-আচরণ, পরকাল প্রভৃতি বিষয়ক নির্দেশ ও তত্ত্ব।'

মন মানে না। মনে পড়ে যায় ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির কথা : গৌতম বুদ্ধ ! তিনি এবং তাঁর সংঘ যা গড়ে তুলেছিলেন তা কি তাহলে 'ধর্ম' নয়? কারণ বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বরোপাসনা-পদ্ধতি বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। 'ঈশ্বর' নামক ধারণাটি সেখানে পুরোপুরি অনালোচিত।

মধ্যযুগে ইয়োরোপ শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে একটা ব্যাপক হানাহানিকে জিইয়ে রেখেছিল। ইতিহাস আদর করে তার নাম দিয়েছে : 'ধর্মযুদ্ধ' বা 'ক্রুসেড্স'। হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ যোদ্ধা সে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছেন দু-পক্ষেই। তাঁদের মধ্যে শহিদ কোন্‌জন? কোন্ পক্ষের? 'শহিদ' শব্দের ইংরেজি সমার্থকশব্দ যদি martyr হয়, তাহলে ইংরেজি অভিধান বলছেন, 'Martyr is a person who undergoes death for any great cause, specially one who suffers death on account of his adherence to the Christian faith'।

অথচ এই আরবি শব্দটি— 'শহিদ'— যা মৌরসী পাট্টা গেড়েছে আ-মরি বাংলা ভাষায়, তার অর্থ : 'ধর্মযুদ্ধে নিহত মুসলমান'।

আজ্ঞে না, আরবি-ভাষাটাও আমার কাছে গ্রীক। আমি এ সংজ্ঞাটি সংগ্রহ করেছি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের রচনা থেকে : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাংলা অভিধান*।

আমাদের মতে : ধর্ম কী?

আমাদের মতে 'শহিদ' শব্দটির সংজ্ঞার্থের সঙ্গে না-ঈশ্বর, না-ধর্ম— কোনো কিছুকেই আবশ্যিকভাবে যুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য যদি না 'ধর্ম' শব্দটিকে ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে অতি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়।

ইংরেজিতে religion বলতে যা বুঝি, 'ধর্ম' সে-তুলনায় অনেক ব্যাপক, অনেক বৃহৎ।

pathagar.net

ধর্মের এক খণ্ডিত-অর্থে 'ঈশ্বর-আত্মা-পরকাল' ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক— অপর অর্থে তা নয়। সংজ্ঞার মাধ্যমে পাত্রাধার ও তৈলের পারস্পরিক সম্পর্কটা যাচাই করার চেয়ে বরং দু-একটি উদাহরণের মাধ্যমে তত্ত্বটা বুঝে নেবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

নির্জন অরণ্যে এক মুক্তিসন্ধানী মহাসন্ন্যাসী দীর্ঘদিন ধরে তপশ্চর্যায় মগ্ন ছিলেন। একদিন একটি ক্রৌঞ্চবক তাঁর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় পুরীষত্যাগ করে। দুর্ভাগ্যবশত সেই পুরীষ পতিত হয় সন্ন্যাসীর মস্তকে। ধ্যানভঙ্গ হল মহাতেজা সন্ন্যাসীর। ঊর্ধ্ব-আকাশের দিকে দৃক্‌পাতমাত্র ক্রৌঞ্চবকের মৃতদেহটি সশব্দে পতিত হল সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে। সাধক প্রণিধান করলেন যে, তপশ্চর্যার মাধ্যমে তিনি এক দুর্লভ 'বিভূতি' লাভ করেছেন। পরদিন সকালে নিকটবর্তী গ্রামে ভিক্ষার্থে পরিভ্রমণ করতে করতে উপস্থিত হলেন এক গৃহস্থের কুটির-সম্মুখে। বারংবার দ্বারে করাঘাত করা সত্ত্বেও দ্বার উন্মোচিত হল না। ক্রোধান্বিত সন্ন্যাসী অভিশাপবর্ষণের পূর্বেই অবশ্য দ্বার খুলে গেল। ভিক্ষাপাত্র হাতে একজন সধবা মহিলা অগ্রসর হয়ে এসে বললেন, 'আপনার ঝোলাটা বাড়িয়ে ধরুন, সন্ন্যাসীঠাকুর।'

সন্ন্যাসী সে মিনতিতে কর্ণপাত না করে ক্রুদ্ধস্বরে মহিলাটির কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন, 'প্রথমে বল, কেন এত বিলম্ব হল তোমার? দিবাভাগে কি নিদ্রাগতা ছিলে?'

মহিলাটি শান্তস্বরে বললেন, 'আজ্ঞে না, আমি গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিলাম'।

অগ্নিনেত্র সন্ন্যাসী পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'কী সেই রাজকার্য যার জন্য সন্ন্যাসীকে দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করতে হয়?'

—'আমি আমার স্বামী- পুত্রকে অন্ন পরিবেশন করছিলাম।'

তারপর একটু হেসে বলেন, 'আপনি আমার দিকে অমনভাবে তাকাবেন না, সন্ন্যাসীঠাকুর! আমি ক্রৌঞ্চবক নই। মার্জনা করবেন, ভস্ম হতে পারব না, বাপু! নিন, ভিক্ষাপাত্রটা বাড়িয়ে ধরুন...'

মহাভারতকার এই কাহিনীর মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন মহিলাটির 'গার্হস্থ্যধর্ম', তাঁর ইহকালচর্চা, ওই মুক্তিকামী সন্ন্যাসীর পরলোকচর্চার চেয়ে কোনো অংশেই ন্যূন নয়।

আমার বাল্যকালের আর একটি কাহিনী এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে। তখন আমার বয়স ছয়-সাত। ঘটনাটা নদীয়া কৃষ্ণনগরের। বাবামশায়ের হাত ধরে একটি আসরে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম। কাহিনীতে একটি শ্মশান-চণ্ডালের চরিত্র ছিল। সে শিবভক্ত, কিন্তু পূজা-অর্চনা কিছু জানত না। করেও না। দিবারাত্র গাঁজায় দম দিয়ে ব্যোম হয়ে পড়ে থাকে। অথচ শ্মশানচত্বরে কোনো মৃতদেহ এলেই সে একপায়ে খাড়া। কখনো যদি কোনো 'অভাগী'র সন্তান কপর্দকহীন অবস্থায় মাঁয়ের মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে উপস্থিত হয়, চণ্ডাল তখন আকাশপানে তাকিয়ে কাকে যেন গাল পাড়ে। তবে নিজের গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে মৃতের সৎকারও করে। 'অভাগীর স্বর্গলাভ' ঘটে। সেদিন অর্থাভাবে তার গঞ্জিকাসেবনে ছেদ পড়ে। সেই শ্মশানে একদিন মহাসমারোহে নীত হল এক গুরুমহারাজের মহাশব। ভক্তের দল মহাকোলাহলে হরিসংকীর্তন করে চলে। চিতা যখন দাউ-দাউ করে জ্বলে

pathagar.net

উঠেছে তখন গঞ্জিকা-প্রভাবে শ্মশানচণ্ডাল বে-এক্তিয়ার। কোনোক্রমে সে উঠে দাঁড়ায়; মহাশবকে সম্বোধন করে বলে, 'ঠাউর, তুমি তো দিব্যি পটল তুলে ফ্যালাইলে। এখনি নির্ঘাৎ চইলে যাবে কৈলাশে। তাঁবাবারে টুক শুধিও তো : সাধন-পূজন-ভজন বিনা/আমার গাঁজা ভিজবে কি না?'

বেশ মনে পড়ে, আমার অর্থগ্রহণ হয়নি। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেছিলেন, 'আমার গাঁজা ভিজবে কিনা' কথাটার অর্থ 'আমার সিদ্ধিলাভ হবে কি না।' অর্থাৎ 'আমি মুক্তি পাব কি না।'

যাত্রাপালার নামটা ভুলে গেছি। কাহিনীটাও। শুধু মনে আছে ওই বিচিত্র প্রশ্নটা। আরও মনে আছে গুরুমহারাজ যেতে পারেননি, কিন্তু কাহিনীর শেষে সেই শ্মশানচণ্ডালের আত্মা কৈলাসে স্বয়ং মহাদেবের সকাশে নীত হয়েছিল।

মহাপণ্ডিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব থেকে ওই যাত্রায় গ্রাম্য পালাকার পর্যন্ত জানেন ভারতীয় ঐতিহ্যে ধর্মের কী সংজ্ঞা। Religion-এর লগিতে ধর্মের গভীরতা মাপা যায় না : 'একবাম' সেখানে মেলে না! Dharma, according to Indian heritage, is the justification of one's existence in this cosmic pattern। এই প্রপঞ্চময় জগতে আমরা প্রকৃতি থেকে যা কিছু গ্রহণ করছি— সৌরশক্তি ও উত্তাপ, পর্জন্যদেবের কৃপা, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের আশীর্বাদ, বনস্পতির বদান্যতা, শস্যের আত্মদান— তা কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করে যাওয়াই মনুষ্যধর্ম। প্রাকৃতিক নিয়মের অংশীদার হিসাবে সমগ্র জীবজগত সেই 'জীবধর্ম' পালন করে চলে। একমাত্র ব্যতিক্রম এই সবার উপরে যা নাকি তথাকথিত সত্য : মানুষ!

আমরা এই দ্বিপদী মনুষ্যজাতি সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তালে-তাল দিয়ে গোটা বিশ্বে সেই প্রাকৃতিক নিয়মের মাথায় পয়জার মেরে চলেছি। নির্বিচারে গাছ কাটছি; ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজনে নয়, শিকারের উন্মাদনায় বন্যপ্রাণী হত্যা করে চলেছি। ইদানীং ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যায় মানুষ মানুষকে হত্যা করছে। মানুষ 'ধর্মযুদ্ধ' করছে। ইনসান জেহাদ লড়ছে। হোলি-ক্রুসেডার্সরা মার্টার হয়ে যাচ্ছেন!

আমাদের মতে 'ধর্ম' হচ্ছে সেই বিভ্রান্ত বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার প্রচেষ্টা। 'ধর্মং যো বাধতে ধর্মো, ন স ধর্মঃ কুবর্ত্ম তৎ', বলেছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। তাঁর মতে, ধর্ম হচ্ছে লোকধারক, যা শ্রেয়ঃ, যা শুভাদিষ্ট, পুণ্য— যা সমাজকে সিমেন্টিং ফ্যাকটরের যোগান দেয়, জীবজগতকে স্থিতিশীল করে, যা ধার্মিককে সত্য-শিব-সুন্দরমুখী করে তোলে। সে পথ 'কুবর্ত্মের' একশো-আশি ডিগ্রি উল্টোমুখো।

আমাদের মতে : শহিদ কে?

'এই ধর্মের' প্রয়োজনে যে সজ্ঞানে আত্মাহুতি দেয়, প্রাণদানের সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে যায়— সে-ই শহিদ। সে হিন্দু কি মুসলমান, খ্রিস্টান কি শিখ— এ-প্রশ্ন অবান্তর। অসিদ্ধ। প্রক্ষিপ্ত। বউঠাকুরাণীর হাট-এ বৌঠাকুরাণী অথবা বসন্ত রায়ের মৃত্যু মর্মান্তিক। কিন্তু তাঁরা শহিদ নন। এমনকি সাম্রাজ্যলোভী আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত প্রতাপাদিত্যও তা নন। ছত্রপতি

pathagar.net

শিবাজীর মতো তিনি দেশের আর পাঁচটি প্রতিরোধী শক্তিকে একই ভাগোয়া-ঝাণ্ডার নিচে নিয়ে আসবার চেষ্টা করেননি। বাকি এগারো ভুঁইঞাকে ডাক দিতে পারেননি। উত্তরাধিকার-সূত্রে-প্রাপ্ত সিংহাসনের খাতিরেই তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। ঠিক যেমন সিরাজউদ্দৌল্লা লড়েছিলেন সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজের বিরুদ্ধে।

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রতাপাদিত্য উৎসবে' সামিল হতে পারেননি। সিরাজকে শহিদ বলে মেনে নিতে পারেননি; কিন্তু লোকমান্যের আহ্বানে 'শিবাজী' উৎসবে কলমের খাপ খুলেছিলেন।

সিরাজ নন, কিন্তু তাঁর বেতনভুক সৈন্যদলের দুই হীরে— মীরমদন আর মোহনলাল— ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগল আদি-শহিদ। একজন মুসলমান, একজন হিন্দু। প্রথমজন পাঁচ-ওয়াক্ত নমাজ পড়তেন কি না, দ্বিতীয়জন ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীজপ করতেন কি না— এ প্রশ্ন অবান্তর। এঁরা গদির মোহে প্রাণ দেননি, দিয়েছেন কর্তব্যবোধে। বিদেশী বণিকের হাতে এঁরা মাতৃভূমিকে বিকিয়ে দিতে রাজি হননি, এবং বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর-আলির কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণে স্বীকৃত হননি।

'বউঠাকুরাণী' ঘটনার আবর্তে, মানুষের নিষ্ঠুরতার শিকার; 'নটী' কিন্তু তা নয়। সে সজ্ঞানে স্থিরমস্তিষ্কে মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল। সকল শুভানুধ্যায়ীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে সে জেনে-শুনে তার সংগীতে আর ভঙ্গিতে বুদ্ধপ্রণাম করেছিল। সে শহিদ!

ঈশ্বরের জন্ম :

ভারতে ঈশ্বরের ধারণা ঋগ্বেদে প্রথম পাওয়া গেলেও বহির্ভারতে বিভিন্ন সভ্যতার আদিম পর্যায়ে মানুষ একজন স্রষ্টা ও পালনকর্তার বিষয়ে চিন্তা করেছে। বস্তুত গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবে বিবর্তিত হবার পূর্বযুগে যখন মানুষ ফলমূল আহরণকারী, শিকারী অর্থাৎ চাষবাস বা পশুপালনও জানে না, সবে শিখছে আগুনের ব্যবহার, সমাজ মাতৃতান্ত্রিক, সেই আদিম যুগেও প্রচলিত ছিল : বিনিময় প্রথা। অপরের শিকার করা পশুর মাংসে ভাগ বসাতে হলে প্রাপককে বিনিময়ে দিতে হত কিছু। হয়তো তা শান-দেওয়া একটা পাথরের ফলা, অথবা পশুচর্ম। মানবসভ্যতার সেই প্রাগূষা যুগেই কিছু চিন্তাশীলের প্রতীতি হল--এই যখন রীতি, তখন প্রকৃতি থেকে যা-কিছু গ্রহণ করা হচ্ছে তার প্রতিদানে তো কিছু দেওয়া উচিত। না হলে প্রকৃতি তার একতরফা দান তো বন্ধ করে দিতে পারে। প্রকৃতি কী দেয়? আগেই তা বলেছি। দেয়, সূর্যের উত্তাপ ও আলো, মেঘ থেকে জল, গাছের ফল ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিদানে মানুষ কী দেবে? আর কাকেই বা দেবে? গ্রহীতার যে পাত্তাই পাওয়া যায় না!

বাস্তবে থাকুন বা না থাকুন, আতঙ্কতাড়িত আদিমমানবের অন্তরে সৃষ্ট হলেন : প্রাকৃতিক নিয়মের একজন নিয়ন্তা : ঈশ্বর। শুধু ভয় থেকে নয়, কৃতজ্ঞতাবোধই হচ্ছে ভক্তি-জাহ্নবীর গঙ্গোত্রী-গোমুখ। কিন্তু কীভাবে সেই অদৃশ্য প্রকৃতির মালিককে পরিতুষ্ট করা যাবে? আদিম সরল মানুষ সহজ সমাধানে এল : ঠিক যেভাবে দলপতিকে পরিতুষ্ট করা হয়, সেভাবেই। তাঁর জয়গান গেয়ে। তাঁকে সন্তুষ্ট রেখে।

pathagar.net

দলপতি ফলমূল ভেট গ্রহণ করে থাকেন, মুর্গি বা নধর পাঁঠাটি পেলে খুশি হন, আরও বে-দিল হন যৌবনবতী কোন সুন্দরীর অধিকার লাভ করলে।

আদিম মানুষের কল্পনায় সৃষ্ট হলেন একাধিক দেবতা— সূর্য, অগ্নি, বায়ু বা বজ্র। একই পদ্ধতিতে তাঁদের পরিতুষ্টির আয়োজন হল। ফলমূলে, দীপধূপে, তাঁর জয়গান গেয়ে এবং সুন্দরী দেবদাসীদের উপঢৌকন দিয়ে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, হেরডোটাসের বর্ণনায় দেখি ব্যাবিলোনিয়ায়, সিরিয়ায়, মিটিল্লা মন্দিরে (Mytilla), লিডিয়ায় (Lydea) বা আর্মেনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল। ঈশ্বরের পরিতুষ্টির এই ব্যবস্থাপনা—ভয়েই হোক, অথবা ভক্তিতে, জন্ম দিল : ধর্মের।

কিন্তু এ তো গেল সাধারণ মানুষের স্থূল চিন্তাধারার প্রতিফলন। জ্ঞানী-গুণী চিন্তাবিদেরা কী সংজ্ঞা আরোপ করলেন ধর্মের? যে 'ধর্ম' নিয়ে এত হানাহানি, এত মারামারি? বাবরি মসজিদ আর মুম্বাই বিস্ফোরণ, ক্রুসেড্‌স্ আর কার্গিল যুদ্ধ ?

তাঁদের উন্নততর চিন্তাধারায় ধর্মের তিনটি শ্রেণীবিভাগ করা যায় : প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম, বিচারবুদ্ধি-প্রসূত ধর্ম এবং গুরুমুখী আজ্ঞানুসারী ধর্ম।

প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের লক্ষ্য হল : মানুষের কর্মচেতনা ও তৎসংলগ্ন অনুষ্ঠানাদির পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য বস্তু বা ঘটনার সমপর্যায়ভুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

অপরপক্ষে জগৎপ্রপঞ্চের চরম ও পরম সত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, তাঁর সঙ্গে মানবাত্মার নিগূঢ় সম্পর্ক ও পাপ-পুণ্য, জাগতিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় ইত্যাদি বিষয়ে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগে সত্যাসত্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টাকে বলা যায় বিচারবুদ্ধিমূলক ধর্ম।

প্রথমটি ধর্ম বিষয়ে পরাবিজ্ঞানের জননী, দ্বিতীয়টি ধর্মীয় দর্শনের।

তৃতীয় ধারায়—যেটি আলোচনায় বাকি থাকল— তা প্রকৃতপ্রস্তাবে 'ধর্ম' নয়। ধর্মের যে সংজ্ঞা আমরা ইতিপূর্বে মেনে নিয়েছি সেই অর্থে ধর্ম নয়। এটি ধর্মের ভেক, তার ছদ্মবেশ। গুরুগিরি ব্যবসায়ে আত্মসর্বস্ব কিছু অসৎ ব্যক্তির শোষণ প্রচেষ্টা। সেটাকে লক্ষ্য করেই সাম্যবাদের জনক মার্কস ধর্মকে অহিফেনের সমার্থকরূপে চিহ্নিত করেছিলেন।

দুর্ভাগ্য মানবেতিহাসের—ধর্মের এই তৃতীয় শ্রেণীর সংজ্ঞায়—উভয় অর্থেই—মানুষে-মানুষে এত হানাহানি। এত ভ্রাতৃবিরোধ—এত ধর্মযুদ্ধ, জেহাদ, ক্রুসেডস্, কাশ্মীর যুদ্ধ !

আশ্চর্যের কথা এবং আনন্দের কথা : প্রতিটি ধর্মের প্রবক্তা কিন্তু এই হানাহানির সপক্ষে কখনো কোন নির্দেশ দিয়ে যাননি। তাঁরা প্রতিবেশীকে ভালবাসতেই বলেছেন, অহিংসাকে পরম ধর্ম বলে চিহ্নিত করেছেন, দীন-দরিদ্রকে সেবা করাকেই 'মোমিন'-এর কর্তব্যরূপে চিহ্নিত করেছেন।

প্রায় প্রতিটি ধর্মের আদি প্রবক্তা এবং তাঁর প্রথম যুগের শিষ্যবৃন্দ পরবর্তী ধর্মের অনুসারীদের হাতে অপরিসীমভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। যীশু ক্রুসবিদ্ধ হয়েছেন, প্রথম যুগের খ্রিস্টানদের অত্যাচারের কাহিনী আমরা দেখেছি 'ক্যু-ভাদিস্'-ছায়াছবিতে। নবী হজরত মহম্মদ (দঃ) এবং তাঁর প্রথম পর্যায়ের অনুসারীবৃন্দ আরবের পৌত্তলিকদের হাতে কম যন্ত্রণা সহ্য করেননি। বুদ্ধদেব স্বয়ং নিগৃহীত না হলেও পরবর্তীকালের ইতিহাসে দেখেছি,

pathagar.net

অজাতশত্রু 'শোণিতের স্রোতে' বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। খাল্‌সা-শিখদের জন্মই তো হল মুঘল সম্রাটদের উপর্যুপরি নির্যাতনে।

ঈশ্বরের অবতার দূত বা পুত্ররূপে প্রচারিত ঋষি, মুর্শেদ বা প্রফেট ভিন্ন ভিন্ন দেশকালে মানুষকে জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে উত্তরণের পথনির্দেশ করেছেন। ধর্মের সঙ্গে এই জগৎপ্রপঞ্চের স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা বা যাবতীয় জাগতিক (Cosmic laws) নিয়ন্তার এক অবশ্যিক সত্তার বিদ্যমানতা ও অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ প্রায় সমগ্র বিশ্বধর্মে স্বীকৃত। এই 'আবশ্যিকতা' বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম ভারতবর্ষ।

ব্যতিক্রমের প্রসঙ্গে এখনই অসব। মূলধারায় বলা হয়েছে : জগৎনিয়ন্তা বা ঈশ্বরই মানুষকে যাবতীয় আধিব্যাধি, বিপদ ও পাপচিন্তা থেকে মুক্ত করবেন, যদি আমরা তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে পারি। তাঁকে সন্তুষ্ট রাখার পদ্ধতি বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকম হতে পারে, কিন্তু এটাই অধিকাংশ ধর্মের সার কথা। মনুষ্যজীবনে সফলতা অর্জন করতে হলে—জাগতিক বা পারলৌকিক যে-কোন সফলতাই হোক—শুধুমাত্র নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করলে চলবে না—উপাস্য দেবতার কাছে সর্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই জাতের বিশ্বাস প্রায় সব ধর্মের নির্দেশ।

ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী :

প্রাচীন মিশর এবং মিশর থেকে বিতাড়িত ইহুদিরা কিংবা মেসোপটেমিয়া, ইরান-তুরান অথবা চীনখণ্ডের কন্‌ফুসিয়াস বা লাও-ৎসে প্রবর্তিত ধর্মের আলোচনা বর্তমানক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক ও নিরর্থক। অপ্রাসঙ্গিক এজন্য যে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য কাশ্মীর-যুদ্ধের শহিদদের বিষয়ে আলোচনা। এ-যুদ্ধে দু'পক্ষের কেউই সেইসব ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত নন।

ইতিপূর্বে বলেছি, কাশ্মীর-যুদ্ধে একপক্ষে অব্যতিক্রম ইসলামধর্মী এবং অপরপক্ষে ভারতে প্রচলিত একাধিক ধর্মাবলম্বীরা নিহত হয়েছেন বা হচ্ছেন। ভারতে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সংখ্যালঘুদের মধ্যে মাত্র কয়েকটিকে বেছে নিয়ে আমরা দেখাতে চাই যে, হিন্দুধর্মের মতোই তাঁরা পরধর্মসহিষ্ণু। কোন ধর্মই বলে না অপর ধর্মের মানুষকে বলপূর্বক স্বধর্মে নিয়ে এস—না পারলে তাকে হত্যা কর! খ্রিস্টধর্ম তা বলে না। বলে না ইসলাম।

প্রাগার্য-সভ্যতার যে মুষ্টিমেয় মানুষ এখানে আজও নিজ-নিজ ধর্মের নির্দেশে চলে, সেইসব আদিবাসী—সাঁওতাল, ওরাওঁ, গোণ্ড, মারিয়া, মুরিয়া প্রভৃতিদের মধ্যে নানান দেবদেবীর পূজা প্রচলিত, তাদের উৎসব ও ধর্মীয় আচরণও বিচিত্র। তারা তাদের ধর্মাচরণ নির্বিবাদে করে যায়। ভারত সরকার বা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় তাতে আপত্তির কিছু দেখে না, বাধাও দেয় না। হিন্দু এবং তৎসংপৃক্ত বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। হিন্দুধর্মের মধ্যে যেসব বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে—শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব ইত্যাদির বিষয়ে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মদের আমরা হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বলেই ধরে নিয়েছি—কারণ ব্রাহ্মরা মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী না হলেও বেদ ও উপনিষদকে ধর্মের আকর গ্রন্থরূপে স্বীকার করেন।

pathagar.net

ভারতের যে-কয়টি প্রধান সংখ্যালঘু-ধর্মের কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাইছি, তা হল : পারসিক, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, শিখ ও ইসলাম ধর্ম।

1. পারসিক ধর্ম :

সংখ্যার বিচারে ভারতে এই ধর্মাবলম্বীরা নগণ্য। চলিতকথায় এঁদের আমরা 'পার্সী' বলি। মুম্বাই অঞ্চলে এঁদের অনেকে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করছেন। বাণিজ্যজগতে এঁরা সুপরিচিত। অনেকেই ধনকুবের।

পারসিক ধর্মের আদি প্রবক্তা জরথুশ্ত্র। গৌতম বুদ্ধ বা বর্ধমান-মহাবীরের কয়েকশো বছর আগেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন (আঃ খ্রিঃ পূঃ 628-551)। তাঁর পূর্বকালে ইরানদেশে বা পারস্যে প্রচলিত ধর্মাচারের আমূল সংস্কার করেন তিনি। ব্যাবিলোনিয়া এবং পশ্চিম ইরানের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রভাবমুক্ত জরথুশ্ত্র তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করেন উত্তরপূর্ব পারস্যে—প্রধানত যাযাবর শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে। শোনা যায়, তিনি ছিলেন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। আলেকজান্ডারের পারস্য বিজয়ের অন্তত আড়াইশো বছর আগে তিনি ছিলেন রাজা হিস্তাপের (Histapes) সভাসদ। তিনি মূলত অগ্নি-উপাসক। তাঁর অভিমত : এ-জগতে সৎ-শক্তি এবং অসৎ-শক্তি উভয়ই বিদ্যমান। অসৎ-শক্তির মূল-উৎস ও পরিচালক : অঙগ্র-মইন্যু। হিন্দুর দৃষ্টিতে যে 'অসুর', খ্রিস্টানের কাছে 'সেটান', মুসলমানের কাছে 'ইব্‌লিশ'। বস্তুত কোন ফারাক নেই! জরথুশ্ত্র বলেছেন : মানুষের কৃত্য হচ্ছে ওই অঙগ্র-মইন্যুর খপ্পর থেকে মুক্তিলাভ। চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণ। ঠিক যেকথা বলেন যীশু 'সেটান' প্রসঙ্গে, নবী 'ইব্‌লিশ' প্রসঙ্গে এবং উপনিষদের মন্ত্রে : তমসো মা জ্যোতির্গময়।

জরথুশ্ত্রের মতে, সেই আলোকের উৎস, সৎ-চিন্তা, সৎ-ভাবের ধারক হচ্ছেন কল্যাণময় : অহুর মজ্‌দা। সমান্তরাল চিন্তায় যিনি God, আল্লাহ্, ব্রহ্ম, শিব।

বাইবেল, কুরআন অথবা বেদ-এর সমান্তরাল জরথুশ্ত্রীয় ধর্মশাস্ত্রটির নাম : জেন্দ্-আবেস্তা। শব্দটি পহ্‌লবী 'অপস্তাক-রজন্দ্' অর্থাৎ 'আবেস্তা ও জেন্দ্' (সংহিতা ও ভাষ্য) থেকে গঠিত। জেন্দ্-আবেস্তা একটি অতি বিশাল ধর্মগ্রন্থ। বর্তমানে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থটি মোটামুটি সাত ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ : শুধু প্রার্থনা গাথা। দ্বিতীয় ভাগ : 'যস্ন'। সংস্কৃতে যা : যজ্ঞ।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য : বেদের দু'টি খণ্ড জেন্দ্-আবেস্তায় আগে-পিছে হয়েছে মাত্র। ঋগ্বেদে যজ্ঞের অনুশাসন, সামবেদে প্রার্থনা গাথা।

আবেস্তার তৃতীয় খণ্ড : বীস্‌পেরেদ্। তাতেও কিছু স্তবস্তুতি আছে। এইভাবে সাতটি অধ্যায়ে বা খণ্ডাংশে মানুষের ঐহিক এ পারত্রিক নানা নির্দেশ : বিবাহ, কৃষিকার্য, মৃতাশৌচের ব্যবস্থা—কী নেই?

আলেকজান্ডারের অভিযানে পারস্যে জরথুশ্ত্রের ধর্ম প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ক্রমে তা আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। প্রায় হাজার বছর পরে ইরানে যখন ইস্‌লাম-অভিযান হল তখন জরথুশ্ত্রের ধর্ম সেখানে সগৌরবে বর্তমান। এর দেড়-দু'শ বছরের ভিতর ওই

pathagar.net

ধর্মমত ইরানে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। ইসলাম সে রাজ্য দখল করে। ওই সময়ে ও তার পরে কয়েক শতাব্দি ধরে বেশ কিছু পারসিক ধর্মাবলম্বী হিন্দুকুশ অতিক্রম করে ভারতে চলে আসেন। এখন তাঁদের অতিক্ষুদ্র একটি অংশ ভারতে সগৌরবে বর্তমান। আর্থিক বিচারে তাঁরা অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীর। আর সবচেয়ে বড় কথা মহা-ভারতের 'দিবে-আর-নিবে' মূলমন্ত্রের সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হয়ে গেছেন। হিন্দুধর্মের সঙ্গে কোনো যুগেই তাঁদের কোনো সংঘাত বাধেনি। এদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, শ্রেষ্ঠ আইনজীবী, শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী এবং শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারদের মধ্যে ভারতীয় হিসাবে তাঁরা মিলেমিশে আছেন।

2. ঈশ্বর-বিবিক্ত ধর্মত্রয়ী :

ঈশ্বর-বিবিক্ত তিনটি মূলধারা ভারতে প্রবাহিত : নাস্তিক্যবাদী হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন। একে একে বলি :

2. (ক) ঈশ্বর-বিবিক্ত হিন্দুধর্ম : হিন্দুধর্ম ও দর্শনে ঈশ্বর-বিবিক্ত চিন্তাধারার দুইটি উপধারা। একটিকে বলা যেতে পারে অজ্ঞাবাদ (agnostic); দ্বিতীয়টি নিরীশ্বরবাদ (atheist)। অজ্ঞাবাদীদের বক্তব্য : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরে কোনো কিছু থাকলেও তা মরমানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা অসম্ভব। সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা একটিমাত্র শ্লোকে তাঁর বক্তব্য বলতে পেরেছেন : 'ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ'! অর্থাৎ ঈশ্বরকে মেনে নেওয়া যায় না, ঈশ্বর অসিদ্ধ। হেতু? হেত্যর্থে পঞ্চমী বিভক্তি : প্রমাণাভাবাৎ! তাঁর অস্তিত্বের কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ নেই।

আস্তিক্যবাদীরা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন : সে কী হে! এত বড় জগৎপ্রপঞ্চটাই তো তাঁর বিদ্যমানতার চূড়ান্ত প্রমাণ! স্রষ্টা ব্যতিরেকে সৃষ্টি যে অসম্ভব! ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু তুমি দেখছ—ওই ঘট-পট, এই গাড়ি-বাড়ি— প্রত্যেকটি বস্তুর একজন করে সৃষ্টিকর্তা আছেন। কোনো কিছুই স্বয়ম্ভু হতে পারে না, এটা তো মান? শোন—পরমেশ্বরই এসবের সৃষ্টিকর্তা।

অজ্ঞাবাদী এবং নিরীশ্বরবাদীরা প্রতিবাদ করেন, তোমার যুক্তি স্বয়ংবিরোধী। তুমি বলছ, কোনো কিছুই নিজে নিজে সৃষ্ট হতে পারে না। এই যদি তোমার অভ্যুপগম (hypothesis) হয়, তাহলে প্রশ্ন হবে : ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করলেন?

—বাঃ! তিনিই তো আদিভূত কারণ। তিনিই একমাত্র স্বয়ম্প্রকাশ!

—কোন্ যুক্তিতে? তিনি যদি স্বয়ম্ভু হতে পারেন, তাহলে এই জড়প্রকৃতি—ওই পাহাড়, সমুদ্র, সূর্য-নক্ষত্র, মহাব্যোমই বা স্বয়ম্ভু বা স্বয়ম্প্রকাশ হতে পারবে না কেন?

এ-তর্কের মীমাংসা হয়নি। হয় না।

ঈশ্বরবিশ্বাসীরা তাই বললেন : 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।'

অজ্ঞাবাদীরা বললেন : তাহলে তুমি তোমার অন্ধবিশ্বাস নিয়েই থাক, ভাই, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, এবং যা যুক্তিতর্কেও গ্রাহ্য নয়, তা আমরা মানি না।

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরবিবিক্ত অপর ধারাটি হল—নিরীশ্বরবাদ। ঈশ্বর আছেন কি নেই—এই প্রশ্নটাই তাঁরা তুললেন না। কারণ তাঁদের মতে পাপপুণ্য, কর্মফল, পরলোক, জন্মান্তর তো বটেই, এমনকি স্বয়ং ঈশ্বরও নেই। স্থূল নাস্তিক্যবাদ এই দার্শনিক-চিন্তার মূল প্রতিপাদ্য। এই দার্শনিক মতের আদি প্রবক্তা প্রাক্‌বুদ্ধ যুগের চার্বাক। তাঁর মূল গ্রন্থটি উদ্ধার করা

pathagar.net

যায়নি; কিন্তু সম্ভবত খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে রচিত জয়রাশি ভট্টের *তত্ত্বোপপ্লব-সিংহ* গ্রন্থে এবং মাধবাচার্যের *সর্বদর্শনসংগ্রহ* মহাগ্রন্থে চার্বাকদর্শনের মতবাদ কিঞ্চিৎ বিধৃত। তাঁর মূলনীতি একটি বহুল-প্রচলিত শ্লোকে সুপরিচিত : 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।'

আপাতদৃষ্টিতে যতই স্থূল মনে হোক, এই দর্শনমতই ভারতে স্বাধীন চিন্তাধারার পথিকৃৎ। বৌদ্ধপূর্ব যুগে বৈদিক ঋষিদের এই ব্যতিক্রমী পণ্ডিতের মাধ্যমেই ভারতীয় সংস্কৃতিতে নাস্তিকতা এবং বস্তুবাদের জন্ম।

আরও লক্ষণীয় চার্বাক ঋষি ভারতীয় দর্শনে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরের অনস্তিত্ব তথা বেদের অপৌরষেয়তার কথা প্রচার করার অপরাধে কেউ রে-রে করে তেড়ে আসেনি। চার্বাকের বা তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে কেউ জেহাদ ঘোষণা করেনি। পাশবশক্তিতে সেই দার্শনিক মতবাদকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা কোনো যুগেই হয়নি। A.K. 47 না থাক, তরবারি তো সর্বযুগেই ছিল।

2. (খ) ঈশ্বর-বিবিক্ত বৌদ্ধধর্ম :

ঈশ্বর-বিবিক্ত দ্বিতীয় ধারাটি হল : লোকুত্তম গৌতমের বৌদ্ধধর্ম।

বিশ্বপ্রপঞ্চের আদিভূত কারণ স্রষ্টা বা নিয়ন্তার বিষয়ে বুদ্ধদেব সম্পূর্ণ নীরব। তিনি ছিলেন দৃঢ়ভাবে কর্মবাদে বিশ্বাসী। দুঃখকষ্ট এবং আধিব্যাধি-জর্জরিত মরমানুষ আবশ্যিকভাবে কর্মাধীন। প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণনীতি ভারতীয় দর্শনে গৌতমবুদ্ধের এক অবিস্মরণীয় অবদান। তাঁর মতে, কার্যকারণ-শৃঙ্খলের দ্বাদশটি অঙ্গ। যথা : অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শবেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি এবং জরা-ব্যাধি-মরণ-শোকাদি। বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

উরুবিল্বে (বুদ্ধগয়ায়) বুদ্ধত্ব লাভের পর শাক্যমুনি উপনীত হন বারাণসীর উপকণ্ঠে সারনাথ মৃগদাবে। সেখানে তাঁর প্রথম পঞ্চ শিষ্যের কাছে তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। এই বাণীতে সংক্ষেপে দার্শনিক তত্ত্বচতুষ্টয় বিধৃত। শাক্যসিংহ বললেন, মানবজীবন মূলত দুঃখময়। কিন্তু একান্ত সাধনায় চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে এই জাগতিক দুঃখ অতিক্রম করা সম্ভব।

উভয়বিধ চরম পথই পরিত্যাজ্য। কী সেই চরম দু'টি পথ? প্রথমত, ইন্দ্রিয়জ সুখসন্ধান; দ্বিতীয়ত, চূড়ান্ত ইন্দ্রিয়-নিপীড়ন। তাই আমাদের অবলম্বন করতে হবে : মধ্যপথ।

কী সেই মধ্যপথ?

তা হল : জ্ঞানমার্গ। অষ্টাঙ্গিক সত্যমার্গ।

1. সম্মা দিট্‌ঠ : সত্যদৃষ্টি।
2. সম্মা সঙ্কপ্পো : সত্য সংকল্প।
3. সম্মা বাচা : বাকসংযম, সত্যকথন।
4. সম্মা কম্মো : সৎ কার্যে নিরত থাকা।

pathagar.net

5. সম্মা আজীব : সৎ জীবিকাগ্রহণ।

6. সম্মা ব্যায়ামো : সৎ উদ্যোগ বা সৎ প্রচেষ্টা।

7. সম্মা সতি : সৎ বিষয়ে মনকে সর্বদা তন্নিষ্ঠ রাখা।

8. সম্মা সমাধি : সৎ ধ্যান।

চিত্তশুদ্ধি র মাধ্যমে, চরিত্রগঠন ও সংযমী জীবনযাপনের মাধ্যমে, সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন করে মানুষ জন্মান্তরের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে। নির্বাণ লাভ করতে পারে।

'ঈশ্বরে বিলীন হতে পারে', বা 'জীবাত্মা এভাবে পরমাত্মায় বিলীন হতে পারে', এমন কথা কিন্তু তিনি আদৌ বলেননি।

তাই তাঁর ধর্ম : ঈশ্বর-বিবিক্ত।

বুদ্ধদেবের এই যে ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব থাকা, প্রকারান্তরে উপেক্ষা করা এবং বেদ-বিরোধিতার জন্য তাঁর জীবিতকালে কোনো কট্টর হিন্দু কিন্তু রে-রে করে তেড়ে আসেনি। মহাপরিনির্বাণকালে তাঁর শিষ্যদল কয়েক সহস্র। ভারতবর্ষের একাধিক পরাক্রমশালী নৃপতি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধ্বজাধারীরা, আজ যেভাবে সদলবলে বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলতে শাবল নিয়ে ছুটছে, সেভাবে কখনো তাঁকে আক্রমণ করেনি।

অবশ্য তাঁর প্রয়াণের পরে কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা বুদ্ধশিষ্যরা নির্যাতিত হন। সে যাইহোক, বুদ্ধদেবের এই বেদ-বিরোধী এবং ঈশ্বর-আরাধনার প্রতি উদাসীন ধর্মই হচ্ছে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম। ক্রমে হিন্দুদের মূর্তিপূজার প্রভাবে নানান দেবদেবীর পূজা সেই ধর্মে প্রবর্তিত হল। বিভিন্ন গুণের আরোপ করে পরবর্তীরা— তারা, মঞ্জুশ্রী, প্রজ্ঞাপারমিতা, জম্ভল, হারিতী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি গড়ে হিন্দুদের অনুকরণে তাঁদের পূজার ব্যবস্থা করল। যাঁরা এই পরিবর্তন করলেন তাঁরা নিজেদের বললেন : মহাযানী। প্রাগ্বর্তী থেরবাদীদের বলা হল : হীনযানী। বুদ্ধদেব তাঁর জীবিতকালে সর্বভারতে যে সম্মানলাভ করেছেন তা তুলনাহীন। পৃথিবীর কোথাও অন্য কোন ধর্মের প্রবক্তা জীবিতকালে এত সম্মানলাভ করেননি। অথচ তাঁর মহাপ্রয়াণের অন্তত পাঁচ-ছয় শত বৎসর বুদ্ধদেবের কোনো মূর্তি গড়া হয়নি। তিনি পূজিত হননি। পরে থেরবাদী-বৌদ্ধরা ক্রমশ বহির্ভারতে চলে যান। চীন, জাপান, সিংহল (শ্রীলঙ্কা), বর্মা (মায়নামার) প্রভৃতি দেশে তাঁরা মূর্তিপূজায় বিরত থেকে ধর্মাচরণ করে গেছেন। আত্মসংযমী, দানধ্যান ও জীবপ্রেমীর এক মহান প্রেরণায়।

ভারতে হিন্দু তন্ত্রসাধনার প্রভাবে ওই মহাযানীদের একটি শাখা আবার 'বজ্রযানী' সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। সেখানে মূল লক্ষ্য 'নির্বাণ' লাভ নয়, 'বজ্রসত্ত্ব' লাভ; অর্থাৎ অপরিসীম জাগতিক ও পারলৌকিক ক্ষমতালাভ। তিব্বত, নেপাল, ভুটান, অরুণাচল প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁরা প্রতিষ্ঠা পান।

লক্ষণীয়, রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট অথবা সিয়া-সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে শতাব্দির পর শতাব্দিকাল যে ধরনের হানাহানি, লড়াই-কাজিয়া হয়েছে বৌদ্ধধর্মের এই তিন শাখার ভিতর কোনদিনই তা হয়নি। যেমন হয়নি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার ভিতর—শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতির মধ্যে।

pathagar.net

আরও লক্ষণীয়, আদি শঙ্করাচার্য বুদ্ধদেবের তিরোধানের প্রায় দেড় হাজার বছর পরে ওই ঈশ্বরবিবিক্ত মহাসন্ন্যাসীকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিধির অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রচেষ্টা করেন— ভগবানের দশাবতারের ভিতর নবম অবতাররূপে বুদ্ধদেবকে চিহ্নিত করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্ম হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাননি। ভারতীয় হিন্দুধর্মের—ব্রাহ্মণ্যধর্মের নয়—বৃহত্তর পরিমণ্ডলে এক পরম শ্রদ্ধেয় যুগাবতাররূপে তিনি শাশ্বতকাল চিহ্নিত হয়ে রইলেন। আদিনাথ, বর্ধমান-মহাবীর, গুরু নানক প্রভৃতির সঙ্গে একই সারিতে। ভারত-সংস্কৃতির এক ধারকরূপে।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস—পণ্ডিতেরা আমার সঙ্গে একমত না হতে পারেন— গৌতমবুদ্ধকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ার (প্রসঙ্গত, চার্বাক-আদি নিরীশ্বরবাদীরা বা অজ্ঞাবাদীরা কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মে গৃহীত) একটি বিশেষ হেতু আছে। আদি শঙ্করাচার্য খুব খোলা মনে বুদ্ধদেবের বেদ-বিরোধিতা এবং ঈশ্বর-সম্বন্ধে উদাসীনতাটুকু মেনে নিতে পারেননি। *দশাবতার-স্তোত্রে* কবি জয়দেব (যাঁর পূর্বযুগে একই জাতির *দশাবতার-স্তোত্র* রচনা করেছিলেন আদি শঙ্করাচার্য) লিখলেন, "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং। সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্।" এখানে তিন মাত্রার ওই বিশেষ শব্দটি—'অহহ' কেন এল? 'অহহ' মানে 'হায়-হায়'! এটা আনন্দ প্রকাশের উচ্ছ্বাস নয়। লক্ষণীয়, 'পশুঘাত' শব্দের সঙ্গে কিন্তু 'অহহ' শব্দটি যুক্ত নয়। যুক্ত হয়েছে 'নিন্দসি যজ্ঞবিধেঃ' পদের সঙ্গে। অর্থাৎ এ অধম লেখকের মনে হয়েছে, বুদ্ধদেব যে যজ্ঞবিধির নিন্দা করেছিলেন তাতেই কবি মর্মাহত। এ 'হায়-হায়' পশুবধের জন্য নয়। বেদকে অস্বীকার করার জন্য!

2. (গ) ঈশ্বর-বিবিক্ত জৈনধর্ম : জৈন সন্ন্যাসীরাও প্রকারান্তরে ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন। ঈশ্বর বিষয়ে তাঁরাও উদাসীন। শুধুমাত্র আত্মার ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মুক্তিলাভ সম্ভব— একথা জৈনধর্ম বিশ্বাস করে। ওঁদের মূল লক্ষ্য : শুদ্ধ ও নির্মল আত্মার সঙ্গে কর্মের যে আবরণ অনাদিকাল থেকে বিজড়িত সেই আবরণ ছিন্ন করে শুদ্ধাত্মা হওয়া। জৈন পণ্ডিতেরা আত্মার ক্রমবিকাশের স্তরগুলিকে চৌদ্দটি সোপানে বিভক্ত করেছেন। এই সোপানগুলির উত্তরণকে বলা হয় 'গুণস্থান-সমারোহ'। গুণস্থানগুলির অতিক্রমণে জীব অন্তিমে মুক্তি পায় বা নির্বাণলাভ করে। জৈনধর্মে প্রধান চারজন তীর্থঙ্কর স্বীকৃত : আদিনাথ (খ্রিঃপূঃ 2,550), নেমিনাথ (খ্রিঃপূঃ 1120), পার্শ্বনাথ (খ্রিঃপূঃ 650) এবং বর্ধমান মহাবীর (প্রায় গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রিঃপূঃ 553)। এছাড়াও আরও কুড়িজন স্বীকৃত বেদবিরোধী তীর্থঙ্কর নির্বাণলাভ করেছিলেন। তবে বেদকে অস্বীকার করলেও জগৎস্রষ্টাকে কিন্তু এঁরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি। সে বিচারে এঁরা agnostic বা অজ্ঞাবাদী। নিরীশ্বরবাদী নন। এঁদের মতে, ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিদ্যমান—তিনি নির্লিপ্ত, নির্গুণ, আদৌ পরম করুণাময় নন। তিনি উদাসীন। তাঁর সঙ্গে মানুষের কোনো উপাস্য-উপাসকের সম্পর্ক নেই। থাকতে পারে না।

দানধ্যান, শুদ্ধাচার, অহিংসা, তপস্যা, সর্বজীবে প্রেমবিতরণ প্রভৃতি নানাবিধ সৎকর্মের অনুবর্তনে, বিভিন্ন গুণস্থান-সমারোহপথে মানুষ অন্তিমে নির্বাণলাভ করতে পারে। অল্পকথায় এটাই জৈনধর্মের মর্মকথা।

pathagar.net

ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের ইতিহাস হাতড়ে কোথাও পাইনি যে, অপর ধর্মাবলম্বীকে নিজ ধর্মের আওতায় আনবার উদ্দেশ্যে জৈনরা লড়াই-কাজিয়া করেছেন!

এখানে আপনারা আমাকে একটু মার্জনা করবেন। কী জানেন? আমি লোকটা মূলত গপ্পুড়ে। ধর্মালোচনা আমার ধাতে নেই। নেহাৎ যে গল্পগুলো লিখেছি, তাতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা পরস্পরকে ভালবাসছে অথবা নির্বিচারে হত্যা করছে—তাই এই 'কৈফিয়তে' এত কথা বলে বোঝাতে হচ্ছে। এখানে আমাকে একটু জিরিয়ে নিতে দিন। মওকা পেয়েছি যখন, তখন একটা গল্পই শোনাই। জৈনদের নিয়ে। 'গল্প' নয়, আদ্যন্ত সত্য ঘটনা।

প্রায় বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ আগেকার কথা। আমার অনুজপ্রতিম এক গুণগ্রাহী, অসীম সেবার ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষা দেবে। বেমক্কা একটা কুড়ি নম্বরের প্রশ্ন 'আউট' হয়ে গেল : "জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরের পরধর্মসহিষ্ণুতার (ক্যাথলিসিটির) বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখ।"

জব্বর একজন ইতিহাসের অধ্যাপককে পাকড়াও করে পরীক্ষার্থীরা প্রবন্ধটা লিখিয়ে নিল। সব্বাই ঝেড়ে মুখস্থও করে ফেলল।

কে বলে ঈশ্বর নেই? তিনি আছেন। উদাসীন আদৌ নন, বরং কৌতুকপ্রিয়। প্রমাণ হাতে-হাতে। নিশ্চিত 'আউট' হয়ে যাওয়া কোশ্চেনটা প্রশ্নপত্রে আদৌ আসেনি।

পরীক্ষা-শেষে ওরা চার বন্ধু বেকার। স্থির করল রেজাল্ট বের হবার আগে রাজস্থানটা বেরিয়ে আসবে। ঘুরতে ঘুরতে ওরা এসে পৌঁছাল আবুতে। এখানে সানসেট-পয়েন্ট, নক্কি লেক আর দিলওয়ারা মন্দির দেখে পরদিনই চলে যাবে যোধপুরে। কিন্তু আবুতে থাকবে কোথায়? হোটেল যথেষ্ট, কিন্তু ওদের চারজনের পকেটই গড়ের মাঠ। শোনা গেল, এখানে কিছু জৈন ধর্মশালা আছে—শ্রীজৈন দিগম্বর, শ্রীজৈন সত্যাম্বর প্রভৃতি। সেখানে বিনা কড়িতে রাত্রিবাস করা যায়। তে-রাত্তির।

চারমূর্তি এসে উপস্থিত তেমনি এক ধর্মশালায়। তার অধ্যক্ষ এক পরম ধার্মিক বৃদ্ধ জৈন সাধু-মহারাজ। তিনি জানতে চাইলেন, বাবুজিদের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

দলপতি অসীম জানায়, কলকাত্তাসে।

—আপ্‌কা শুভনাম? ধরম?

অসীম তা জানালো।

—তব্ আপ্ বাংগালি হ্যাঁয়? মছলি খাতে হ্যাঁয়, না?

দেবস্থানে অসীম মিথ্যাকথা বলতে পারল না।

সাধুজী জানালেন, ওই ধর্মশালাটি শুধুমাত্র নিরামিশাষীদের জন্য নির্দিষ্ট।

অসীম যুক্তি দেখায়। কিন্তু আমরা তো এখানে নিরামিষই খাব। আর একটামাত্র রাত থাকব।

সাধুজী করজোড়ে বলেন, আয়াম এক্সট্রিম্‌লি সরি, বাবুজি! প্লিজ এক্সকিউজ মি।

পিছন থেকে ওর পাঞ্জাবিতে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বাবলু বঙ্গভাষে বলে, এখানে চিড়ে ভিজবে নারে অসীম! চল কেটে পড়ি!

pathagar.net

অসীম সে-কথায় কর্ণপাত করে না। সাধুজিকে বলে, আপনাকে মার্জনা করার আমি কে? প্রার্থনা করি, ভগবান বর্ধমান মহাবীর যেন আপনাকে মার্জনা করেন।

সাধুজির বোধকরি মতিভ্রম হল। সকৌতুকে বললেন, আচ্ছা! মছলি খাতে হ্যাঁয় যা নেহী ফির ভি আপ্‌নে বর্ধমান মহাবীরজিকি নাম তো সুনা হ্যায়!

ব্যস, আতসবাজিতে অগ্নিস্পর্শ ঘটে গেল। অসীম অসীম গাম্ভীর্যে বলে, জী হাঁ। তাড়িয়ে দিচ্ছেন, চলে যাচ্ছি। তবে যাবার আগে মহা-অর্হৎ বর্ধমান মহাবীরজির পরধর্মসহিষ্ণুতার কথা কিছু শুনিয়ে যাই। শুনুন :

বিশুদ্ধ ইংরেজিতে অতঃপর ঝাড়া মুখস্থ আউড়ে চলে অসীম :

"বর্ধমান মহাবীরজির অপরিসীম পরধর্মসহিষ্ণুতার বিষয়ে শ্রাবকশ্রাবকাদি আচার-বিষয়ক গ্রন্থে, জীব-অজীব তত্ত্ব-বিষয়ক মহাসংকলনে, বিশেষ করে 'ষট্‌খণ্ডাগম' মহা-আগমে বিভিন্ন প্রকীর্ণকে, চাল্লিকাসূত্রে বলা হয়েছে যে, ভগবান মহাবীর ধর্মসংকীর্ণতার শেষ গুণস্থান-সমারোহ অতিক্রমণে সক্ষম হয়েছিলেন। এই প্রপঞ্চময় জগতের যাবতীয় জীবকে— তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সংখ্যার বিচার না করে, সকল মনুষ্যকে তাদের পূজাবিধি অথবা খাদ্যাখাদ্যের পার্থক্য বিচার না করে নিজ ক্রোড়ে..."

সাধুজি উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছেন। সবিস্ময়ে বলেন, এসব কী বলছেন, বাবুজি?

বিনয়ে বিগলিত অসীম করজোড়ে বলে, লেট মি স্পিক আউট, মহাভাগ! আমি কীটস্য কীট। আপনি মহাসন্ন্যাসী! আমার soul আপনার উপানতের 'হাফসোল' হবারও উপযুক্ত নয়। আমি মছলিখোর বংগালি। নেভার-দ্য-লেস্, শুনুন প্রভু—

"The great compiler Hemchandra of the 11th century composed the famous ত্রিষস্টিশলাকাপুরুষচরিতম্. In its 10th canto he describes the catholicity of Vardhamana Mahavira. According to Suvachandra of the 16th century..."

বৃদ্ধ তখন অশ্রুর বন্যায় ভেসে যাচ্ছেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি এই মছলিখোর বাংগালী ছেলেটা তীর্থঙ্কর মহাবীরের পরম ভক্ত! তিনি অসীমকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, প্লিজ...প্লিজ, বাবুজি! আপনারা এই ধর্মশালায় আতিথ্য না নিলে আমার মহাপাতক হবে। শ্রীজৈনপাতিমোক্ষমতে আমাকে তিন দিন উপবাস করতে হবে। এই অথর্ব শরীরে তিনদিন উপবাস করলে...

অসীম ছেলেটা বুঝমান। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে পাতিমোক্ষমতে প্রায়শ্চিত্ত করতে দিল না। ওই ধর্মশালাতেই সবান্ধবে আশ্রয় নিল। সাধুজি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের নৈশাহারের সময় অতিথিসৎকার করলেন। ঘৃতপক্ক নিরামিষ তণ্ডুল, নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি, অরহড়ের ডাইল, পূর্ণপাত্র মিষ্টান্ন এবং শরদিন্দুর ভাষায় 'কপিত্থসুবাসিত-তক্র'!

তাই বলছিলাম : ধর্মালোচনা কখনো ব্যর্থ হয় না, অপিচ বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। যদিও অধীত বিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল : Commit to memory just to vomit into the answer paper!

pathagar.net

3. শিখধর্ম :

শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক (14.9.1539) ভারতীয় সংস্কৃতির এক দিকচিহ্ন। তিনি বাবরি মসজিদ নির্মাণের পূর্বযুগের মহাপুরুষ। পানিপথের প্রথম যুদ্ধটাও তখনও ইতিহাস বইতে 'মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন'রূপে চিহ্নিত হয়ে ওঠেনি। লাহোরের কাছাকাছি তালওয়ান্দি গাঁয়ে (বর্তমানে পাকিস্তানে) তাঁর জন্ম। বাল্যকাল থেকেই সংসার-বিষয়ে তিনি উদাসীন। বহু দূরাগত এক বংশীধ্বনি তিনি কান পেতে শুনতেন— গৌতমবুদ্ধ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো। সে বংশীবাদক নয়নগ্রাহ্য নন— তিনি 'অলখ'। জগৎসংসারের মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করে না : তিনি 'নিরঞ্জন'।

পিতা তাঁর বিশ বছর বয়সে এক সুলক্ষণী কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিলেন। নাম 'সুলক্ষণী'। এবার বুদ্ধদেবের সঙ্গে তার তুলনা চলবে, রামকৃষ্ণের সঙ্গে নয়। দুই পুত্রের জনককে কিন্তু সংসার ধরে রাখতে পারল না। নির্জন সাধনাকালে তাঁর ধ্যানসমাধি হল ; তিনি 'অলখ-নিরঞ্জনে'র প্রত্যাদেশ পেলেন।

ঘর ছেড়ে পথে বার হলেন নানক। সেই পঞ্চদশ শতাব্দিতে তিনি পদব্রজে এবং অর্ণবপোতে যে দীর্ঘ তীর্থ পরিক্রমা করেছিলেন তার ব্যাপ্তির কথা চিন্তা করলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। ভারত ভূখণ্ডের যাবতীয় হিন্দুতীর্থ পরিক্রমা করেন তিনি। কামরূপ কামাখ্যা থেকে কন্যাকুমারী। কাশী, কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, মথুরা, দিল্লি তো বটেই, এমনকি সমুদ্র পেরিয়ে সিংহল (শ্রীলঙ্কা) অথবা ব্রহ্মদেশ (মায়নামার)। ওদিকে আরবে গিয়ে হজও করেছেন—অর্থাৎ মুসলমান তীর্থ : মক্কা ও মদিনা। দীর্ঘ দুই দশক ধরে।

অতি দীর্ঘ পরিব্রাজন সমাপ্ত করে গুরু নানক ফিরে এলেন তাঁর 'সর্বতীর্থসার' ভারতবর্ষে। রাভি নদীর তীরে কর্তারপুর গ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে শিখধর্মের জন্ম দিলেন।

নানক ছিলেন একেশ্বরবাদী। তাঁর সহজ-সরল ভক্তিমার্গের বাণী সহজেই স্বীকৃত হল। তাঁর উপদেশ পরে শিখদের বাইবেল 'গ্রন্থসাহেবে' সঙ্কলিত হয়েছে। তিনি হিন্দুধর্মের জাতিভেদপ্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যদলের মধ্যে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ হিন্দু তো ছিলই এমনকি মুসলমান ভক্তও ছিলেন।

ভক্তি-গঙ্গোত্রীর উৎসমুখে জন্মগ্রহণ করলেও পরধর্মের উপলবন্ধুর নিষ্ঠুর বাধার সম্মুখীন হয়ে শিখধর্ম অচিরেই ফেনোচ্ছল হয়ে উঠল।

ভারতে মুসলমান শক্তি প্রতিষ্ঠার পর দুই-এক শতাব্দির ভিতরেই বহু হিন্দু দ্রুতহারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিতে থাকেন। কারও লক্ষ্য পদোন্নতি। কারও ব্যবসায়িক সুবিধা— অধিকাংশই সামাজিক নির্যাতনের চাপে। ফলে পঞ্চদশ শতাব্দিতে মুসলমানদের জনসংখ্যা আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

গুরু নানকের দেহান্তের পরে তাঁর প্রিয় শিষ্য গুরু অঙ্গদ (1539-52) হলেন শিখদের দ্বিতীয় গুরু। সেটা বাবুর থেকে শেরশাহ্‌র সংক্রমণের যুগ। এই সময় থেকেই মুসলমান দিল্লীশ্বরের আমীর-ওমরাহ্‌দের ধর্মান্ধতা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিখসম্প্রদায় সচেতন হয়। প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়। তৃতীয় গুরু অমরদাসের (1552-74) সময়েও এ প্রয়োজন

boiRboi.net

ছিল তীব্র। কিন্তু চতুর্থ গুরু রামদাস (1574-81) লীলা করে যান সাম্প্রদায়িকতামুক্ত এক স্বর্ণযুগে—'ধুন্ গুরু রামদাসজি!'

দিল্লির মসনদে তখন আসীন হয়েছেন সাড়ে ছয়শত বছরের মুসলমান শাসনের সর্বশ্রেষ্ঠ অসাম্প্রদায়িক সম্রাট : মহামতি জালালুদ্দিন আকবর। সম্রাট গুরু রামদাসকে দান করলেন একটি ভূখণ্ড—অমৃতসরে। সে জমিতে গড়ে উঠল শিখধর্মের শ্রেষ্ঠ তীর্থ : হরিমন্দির বা স্বর্ণমন্দির। তার কেন্দ্রে : অকাল্-তখ্ত্!

দুর্ভাগ্য ভারতেতিহাসের : পাঠান-মুঘল যুগের শ্রেষ্ঠ শাসক সাম্প্রদায়িকতার কলুষমুক্ত মহামতি আকবরের সেই স্বপ্নটা সফল হতে পারল না—হিন্দু-মুসলমান হাতে হাত মিলিয়ে সোনার ভারত গড়ার কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারল না। কারণ আকবরের প্রয়াণে পরপর দু'জন যুবরাজ—শাহজাদা খস্রৌ অথবা শাহজাদা দারাশুকো ভারতেশ্বর হতে পারেননি। গদি-আসীন হয়েছিলেন পরপর তিন অযোগ্য ধর্মান্ধ : জাহাঙ্গীর— স্ত্রৈণ, অহিফেনসেবী, নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়াসক্ত; শাহজাদা খুর্রম্—ভ্রাতৃহন্তা, আত্মসুখসর্বস্ব; এবং চরম সাম্প্রদায়িক ;ঔরঙ্গজীব—ইনিও ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত শাসনদণ্ড হাতে সিংহাসনে উঠে বসেছিলেন। কপট, কুচক্রী এবং চরম সাম্প্রদায়িক এই বাদশাহ্!

ফলে চতুর্থ গুরু রামদাসের পরে আত্মরক্ষার্থে সচেতন হতে হল পরপর চার গুরুকে : অর্জুন (1581-1606), হরগোবিন্দ্ (1606-45), হররাই (1645-61) এবং হরকিষণকে (1661-64)। নবম গুরু তেগ্বাহাদুরের (1664-75) সময়ে মুঘলসম্রাট কুলাঙ্গার আওরঙ্গজীবের সাম্প্রদায়িকতা মধ্যগগনে। আকবর যে 'জিজিয়া-কর' রদ করে দিয়েছিলেন আওরঙ্গজীব সেটা পুনঃপ্রবর্তন করলেন। তেগ্বাহাদুরকে মুঘলবাহিনী বন্দী করতে সক্ষম হল। আওরঙ্গজীব ফতোয়া জারি করল : ধর্মান্তরিত হতে স্বীকৃত না হলে গুরু তেগ্বাহাদুরকে হত্যা করা হবে। বহু শিখ সর্দার যেমন দিয়েছেন সেভাবেই তেগবাহাদুর ধর্মান্তর-গ্রহণে অস্বীকৃত হয়ে 'বেণীর সঙ্গে মাথা' দিয়ে এলেন মুঘল সম্রাটকে।

তেগবাহাদুরের আত্মদানের পর দশম গুরু হলেন তাঁর পুত্র গুরু গোবিন্দ্ (1675-1708)।

অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, সংগঠনের ক্ষমতা এবং জনপ্রিয়তা। পিতার বীরোচিত আত্মদানে এবং সাধারণ মানুষের নিগ্রহে তিনি শিখ সম্প্রদায়কে শুধু ধর্মীয় নয়, একটি সামরিক শক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন। এ আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছিল প্রচণ্ড। কারণ তেগবাহাদুরকে হত্যা করার পরেও দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর শেষ মুঘল সম্রাট তার কুশাসনের মাধ্যমে আকবরের ভারতবর্ষকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে সফল হয়। বস্তুত ঔরঙ্গজীবই তার সাম্প্রদায়িকতা-বিষপ্রয়োগে ভারতে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটায়।

গুরু গোবিন্দ্ শিখসম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমেই বর্ণবৈষম্যের বাধা দূরীকরণের জন্য 'পাহুল' উৎসবের প্রবর্তন করলেন। দেবতার প্রসাদ ও পবিত্র পানীয় বর্ণনির্বিশেষে সমস্ত শিখ একই সঙ্গে গ্রহণ করতে থাকেন। তিনিই 'খাল্সা' সংস্কারের মাধ্যমে প্রত্যেক শিখের উপাধি 'সিংহ'রূপে চিহ্নিত করেন। বর্ণবৈষম্য বিদূরিত

pathagar.net

করেন। তাদের পঞ্চ -'ক'কে নিত্যসঙ্গী করে তোলেন— কেশ, কুংঘা (চিরুনি), কুচ্চা (ল্যাঙট), কড়া (হাতে লোহার বালা) এবং নিত্যসঙ্গী কৃপাণ!

খাল্‌সা-শিখদের ধর্মীয় নির্দেশ : প্রত্যেককে হতে হবে সত্যাশ্রয়ী, বিনয়ী, ভ্রাতৃবৎসল, পরধর্মসহিষ্ণু এবং দশ-গুরু তথা 'অকাল্‌-তখ্‌ত্‌'-এর প্রতি শ্রদ্ধাবিনম্র থাকা। শেষ জীবনে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী গুরু গোবিন্দ্‌ পাঁচজন প্রধানের একটি 'তখ্‌ত্‌'কে শিখসম্প্রদায়ের পরিচালকরূপে চিহ্নিত করে যান। তাঁর পর আর কেউ শিখগুরু হননি।

এই মহাপ্রাণ গুরু গোবিন্দ্‌-এর দেহান্তও হয় এক মর্মন্তুদ ঘটনায়—বিধর্মী আততায়ীর ছুরিকাঘাতে। দিল্লিতে মুঘলদের গৌরব-রবি অস্তমিত হল অষ্টাদশ শতাব্দির উষাকালে— যুদ্ধক্লান্ত ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুতে। এদিকে পঞ্চনদীর তীরে উদিত হলেন খাল্‌সা-শিখ সম্প্রদায়ের গৌরব-রবি।

সে-সূর্য মধ্যগগনে উপনীত হল পঞ্জাব-কেশরী রঞ্জিত সিংহের জমানায় (1780-1839)। পাঞ্জাবের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তিনি একটি স্বাধীন শিখরাজ্য গড়ে তুললেন। ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে (1809) আবদ্ধ হলেন। শতদ্রু নদীর পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত এই স্বাধীনরাজ্যের সীমানা ইংরেজ কর্তৃক স্বীকৃত হল।

তারপর পাক্কা আড়াইশো বছর—ঔরঙ্গজীব ফৌত হবার পর এবং ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত— শিখসম্প্রদায়ের সঙ্গে কারও কোনো বিবাদ হয়নি। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-পারসিক-জৈন প্রভৃতিদের সঙ্গে তো নয়ই—এমনকি যে ধর্মের আগ্রাসী নির্যাতনে শিখধর্মের অভ্যুদয় সেই মুসলমানদের সঙ্গেও নয়। পাঞ্জাবের অসংখ্য গ্রামে শিখ ও মুসলমান পাশাপাশি মহল্লায় নির্বিবাদে বাস করেছে। আড়াইশো বছর ধরে। দু'পক্ষই মাঠে সোনা ফলিয়েছে। এরা ওদের ঈদ্‌ মুবারকে বাধা দেয়নি। মিলাদ শরিফে অংশ নিয়েছে। ওরাও এদের লাহুল উৎসবে শিখদের হাতে মিষ্টান্ন ভক্ষণ ও সরবত পান করেছে। গুরু নানকের জন্মদিনে প্রসাদ পেয়েছে।

ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু (1707 খ্রিঃ) থেকে এ গ্রন্থ রচনার মধ্যে কালের ব্যবধান প্রায় তিনশত বছরের। এর মধ্যে শিখসম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় ধর্মের অংশীদারদের মাত্র দু'বার সংঘাত বেধেছে। দুটিই মর্মন্তুদ ঘটনা। নতমস্তকে অপরাধ স্বীকার করে যাই।

বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি পর্যন্ত হিসাব করে দেখা গেছে : ভারতের লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রতি একশত ভারতীয়ের মধ্যে মাত্র একজন শিখ। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়, দেশ স্বাধীন হবার সময় সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ ছিল শিখ! খেলার জগতে সে সময় পর্যন্ত মাত্র একটি বিষয়েই গর্ব করতে পারত ভারত : হকি। যে-কোন অলিম্পিকে প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে যখন ভারত টীম গঠন করেছে তখন দেখা গেছে তার আধাআধির মাথায় : বাঁধাকপি! তারা শিখ! অ্যাথলেটিক্সে সেসময় সর্বভারতীয় রেকর্ড খুঁজে দেখবেন : দুই-তৃতীয়াংশ অধিকার করে রেখেছিল ওই 'মিয়ার ওয়ান-পার্সেন্ট'। এভারেস্টের চূড়ায় সেদিন পর্যন্ত যে পাঁচজন ভারতীয় চড়তে পেরেছে—একমাত্র তেনজিং নোরগেকে বাদ দিলে বাকি চারজনই খালসা শিখ!

pathagar.net

আড়াইশো বছর ধরে এভাবে শিখসম্প্রদায় মহা-ভারতের অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতি, সংহতি, সম্প্রীতিকে স্বীকার করে একাত্ম হয়ে ছিল। সম্মাননীয় অংশীদার হিসাবে।

শান্তি প্রথমবার বিঘ্নিত হল স্বাধীনতার প্রাগূষা লগ্নে। ইংরেজের নীতি 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'—'দ্বিজাতি-তত্ত্বের বনিয়াদের ওপর ভারতশাসনের ইমারত খাড়া কর'—এই ছিল শাসকবৃন্দের শেষ মরণ কামড়! মহম্মদ আলী জিন্নার হাতে বিদেশী শাসক তুলে দিয়েছিল প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক পদার্থ। গান্ধীজির 'ক্যুইট ইন্ডিয়া' আর নেতাজির 'জয়হিন্দ্'-এর জবাবে প্রস্থানের প্রস্তুতি হিসাবে এবারে র‍্যাডক্লিফের হাতে তুলে দিল ভারতভাগের রোয়েদাদ্। নেতাজি অনুপস্থিত, গান্ধীজি অস্বীকৃত কিন্তু একদিকে নেহরু-আজাদ-প্যাটেল অন্যদিকে জিন্নাসাহেব তাঁদের জীবদ্দশায় গদিলাভের খোয়াবে খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা মেনে নিলেন। জাপানের আত্মসমর্পণে নেতাজি তখন ফরমোসায় আত্মগোপন করেছেন, গান্ধীজি বেলেঘাটায় অনশনরত, আর নেহ্রু লেডি-মাউন্টব্যাটেনকে বাঁয়ে নিয়ে দিল্লিতে বত্রিশ কোর্সের ডিনার-পার্টিতে অযুত নিযুত স্বাধীনতা শহিদের তর্পণ করছেন!

এদিকে আগুন জ্বলছে, বাঙলায় আর পাঞ্জাবে। *সোনার বাঙলার* কথা অন্যত্র বলেছি—সোনার পাঞ্জাবের কথা বলি : আড়াইশো বছর ধরে পাশাপাশি গ্রামে, শহরের লাগালাগি মহল্লায় যারা নির্বিবাদে বাস করে এসেছে তারা রাতারাতি পরস্পরকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করল। শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা : লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা!

সোনার বাঙলায় যেটা হয়নি, স্বর্ণপ্রসূ পাঞ্জাবে সেটাই ঘটে গেল : 'এক্সচেঞ্জ অব পপুলেশন'। পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চল থেকে দলে দলে চলে গেল মুসলমানেরা হবু পাকিস্তানে; পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে মহামিছিল করে এ-প্রান্তে চলে এল শিখ আর হিন্দু উদ্বাস্তু।

আড়াইশো বছর ধরে খাল্সা শিখের দল বিস্মৃত হয়েছিল তাদের আদিম স্রষ্টাদের ওপর মুঘল শাসকদের বর্বর অত্যাচার। ইংরেজ সেই বিস্মৃতির যবনিকাটা অপসারণে সাফল্যলাভ করল। আবার নতুন করে

"মোঘল-শিখের রণে/মরণ আলিঙ্গনে/কণ্ঠ আঁকড়ি ধরিল পাকড়ি দুইজনা দুইজনে।"

কিন্তু দুই-তিন দশকের মধ্যেই সেই ধর্মগত বৈরীভাব বিদূরিত হল। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে যেসব শিখ ভারতে এল তারা স্বীকার করে নিল এদেশের মুসলমানদের। এর বিপ্রতীপ ঘটনা কিন্তু পাকিস্তানে ঘটল না। সেখানে কোনো হিন্দুই রইল না। গুরু তেগবাহাদুরকে ঔরঙ্গজীব যে দুটি বিকল্প পথ দেখিয়েছিলেন তার যে-কোন একটা বেছে নিতে বাধ্য করা হল ওদের।

কেটে গেল তিন-তিনটি দশক। মাঝে-মাঝে ভারতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছে। দু'তরফের উগ্রবাদীর প্ররোচনায়। শিখ-মুসলমান বা শিখ-হিন্দু দাঙ্গা হয়নি। শিখসম্প্রদায় মহা-ভারতের অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে একাত্ম হয়ে গেল। ভারতীয় ঐতিহ্যের *'দিবে আর নিবে'* মন্ত্রে শুধু হিন্দু বা খ্রিস্টান নয়, মুসলমানদের সঙ্গেও তাদের নতুন করে সৌহার্দ্য সম্পর্ক গড়ে উঠল।

boiRboi.net

তারপর পুনরায় : 'এসেছে সে একদিন!'

উপস্থিত হল ভারতেশ্বরীর সেই হঠকারিতার দিনটি। স্বাধীনতালাভের সাঁইত্রিশ বছর পরে। ততদিনে পূর্ব-পাঞ্জাবে সবুজ-বিপ্লব ঘটে গেছে। অপশাসনে অনশনপীড়িত বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যকে আহার জুগিয়ে চলেছে পাঞ্জাব। শিল্পে, কৃষিতে, বাণিজ্যে পূর্বপাঞ্জাব ও হরিয়ানা ভারতে শীর্ষস্থান লাভ করতে বসেছে। সেখানকার জনৈক জননেতা পাঞ্জাব-কেশরী রঞ্জিত সিংহের মতো সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছেন। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সূচনা!

ভারতেশ্বরী প্রমাদ গণলেন! তাঁর মনে হল : 'নেহেরু-ডাইনেস্টি' টলমল। ওই নয়া পঞ্জাবকেশরীর পক্ষশাতনমানসে মদত দিতে শুরু করলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে—একই শাসন পদ্ধতি : 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'!

কিন্তু জনাব জিন্নার হাতে ইংরেজ সমরাস্ত্র তুলে দেয়নি। ভারতেশ্বরী তাই দিলেন। অতঃপর তাঁরই সৃষ্ট 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' তাঁকেই গ্রাস করতে চাইল। ফলে 2.6.1984 তারিখে পাঞ্জাবের নির্বাচিত শাসককে বিতাড়িত করে কর্তৃত্বভার তুলে দেওয়া হল সেনাবাহিনীর হাতে। যার সিংহভাগ 'সিংহ' অর্থাৎ খাল্‌সা শিখ!

তিনদিন পরে, পাঁচই জুন শুরু হয়ে গেল দিল্লীশ্বরীর পরিকল্পিত 'অপারেশন ব্লু-স্টার'! জার্নেল সিং, ভিন্দ্রানওয়ালা সহ 315 জন শিখ স্বর্ণমন্দিরে অথবা তার আশেপাশে নিহত হলেন! বহুকুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগে অবশ্য নিহত হয়েছিল তার চেয়ে 64 জন বেশি—379 জন। ইন্দিরাজি সে-রেকর্ড ভাঙতে পারেননি।

পাঁচদিন পরে কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাব সম্বন্ধে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করলেন এবং পঁচিশে সেপ্টেম্বর অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হল। শুরু হল 'অকাল-তখ্‌তে'র মেরামতির কাজ।

চাপা বিক্ষোভে গুমরে মরতে থাকে গোটা শিখজাতি। স্বর্ণমন্দিরের ভিতর সেনাবাহিনীর—যার মধ্যে ছিল অনেক আজ্ঞাবাহী শিখ—সশস্ত্র আক্রমণকে খাল্‌সা শিখেরা তাদের ধর্মের প্রতি চরম অবমাননা হিসাবে গ্রহণ করল। প্রায় মাসখানেক পরে, 31.10.1984 তারিখে তারা এর প্রতিশোধ নিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নিজ আবাসে নিহত হলেন। হত্যাকারী তাঁরই শিখ দেহরক্ষী!

পরের সপ্তাহে দিল্লিতে এবং অন্যত্র অসংখ্য নিরীহ শিখকে হত্যা করল প্রতিহিংসাকামী কংগ্রেসীরা। এবার কিন্তু মুসলমান নয়, কট্টর হিন্দু মৌলবাদীর দল!

দু'বছর পরে ইন্দিরা গান্ধীকে খুনের দায়ে তিনজন খাল্‌সা-শিখের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেন সর্বোচ্চ আদালত : সতবন্ত সিং, কেহর সিং এবং তরুণবয়স্ক বলবীর সিং।

দিল্লিতে ব্যাপক দাঙ্গা ও শিখনিধনের বিষয়েও তদন্ত হয়েছিল। কমিশন বসেছিল। কিন্তু কোন মৌলবাদী কংগ্রেসী নেতা এজন্য শাস্তি পেয়েছেন বলে শুনিনি।

তারপর এই চৌদ্দ বছরে অনেক অনেক কোটি গ্যালন জল বহে গেছে বিপাশা ও শতদ্রু দিয়ে এবং গঙ্গা-যমুনা দিয়েও।

pathagar.net

স্বতন্ত্র শিখিস্তানের দাবি ক্রমশ স্তিমিত হয়েছে। অবসান ঘটেছে নেহরু ডায়নাস্টির অপশাসনও।

ধীরে ধীরে খাল্‌সা-শিখ সম্প্রদায় মহা-ভারতের মহামিলনের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। পাকিস্তান থেকে বারে বারে আক্রান্ত হয়েছে কাশ্মীর। তাতে বারে বারে শহিদ হয়েছে খাল্‌সা-শিখের দল—তাদের সহযোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। ধর্মের বিচারে সহযোদ্ধারা হিন্দু, খ্রিস্টান এবং মুসলমান। কিন্তু ওদের অভিমানটা যে আন্তরগভীরে অনির্বাণ ছিল সেটা বোঝা গেল এক সাম্প্রতিক ঘটনায়।

ভূতপূর্বা ভারতেশ্বরীর ইতালিয়ান বধূমাতা কিছুদিন আগে অমৃতসরে পদার্পণ করেছিলেন। 'অকাল-তখ্‌ত্'-এ তিনি শ্রদ্ধার্ঘ্য দেবার বাসনা জানিয়েছিলেন। 'তখ্‌ত্'-এর বর্তমান পরিষদ তাঁকে সে অনুমতি প্রদান করেননি। না, তিনি ইতালিয়ান বা বিধর্মী বলে নয়, ওঁদের শর্ত ছিল : প্রার্থিনীর শ্বশ্রূমাতা 'অকাল-তখ্‌ত্'-কে যে অবমাননা করেছিলেন সেজন্য তাঁর বধূমাতাকে প্রথমে নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে। তারপর তাঁকে শ্রদ্ধানিবেদনের অধিকার দেওয়া হবে!

সোনিয়া গান্ধী স্বীকৃত হননি। ফিরে এসেছিলেন শ্রদ্ধার্ঘ্য না দিয়েই।

শিখ সম্প্রদায়ের এ অভিমান, এ প্রতিবাদ শুধু নেহরু পরিবারের বিরুদ্ধে। মহা-ভারতের মূল স্রোতে তাঁরা আজও শত্রুর মোকাবিলা করতে বুকের রক্ত ঝরাচ্ছেন।

সে-কাহিনীই তো শোনাতে বসেছি।

4. খ্রিস্টধর্ম :

বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু বা শিখধর্মের মতো এ ধর্মমতের উৎপত্তি ভারতে নয়, বরং পারসিক বা ইসলামের মতো এ ধর্ম বহিরাগত।

সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারকে বলা যেতে পারে ভারতে যীশুজাহ্নবীর ভগীরথ। পোর্টুগিজ উপনিবেশ গোয়ায় তিনি উপনীত হন—প্রভু যীশুর বাণী ও ধর্মপ্রচার মানসে। সেটা প্রাক্-মুঘলযুগে। বস্তুত দিল্লিতে তখন শেরশাহ্ শূরের শাসনকাল।

ধর্মপ্রচার মানসে যুগে যুগে অসংখ্য খ্রিস্টধর্ম-প্রচারক ভারতে এসেছেন। অতি দুর্গম স্থানে প্রভু যীশুর গীর্জা নির্মিত হয়েছে। হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রমের কারণে প্রতি এলাকাতেই বিরাট জনসমষ্টি চিরকালই ছিল অনুন্নত, অবহেলিত, অত্যাচারিত ও বর্ণহিন্দু দ্বারা শোষিত। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকেরা তাদের ধর্মান্তরিত করে নানাভাবে সেবা করেছেন। তারা শিক্ষা পেয়েছে, বস্ত্র পেয়েছে, সুসংবদ্ধ ভাবে গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করতে শিখেছে। বর্ণহিন্দু জমিদার ও জোতদারেরা তাদের চিরকাল দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এইসব বিদেশাগত ধর্মপ্রচারকেরা তাদের অন্ধকার থেকে আলোয় মুক্ত করেছিলেন। করছেন। দণ্ডকারণ্যের আদিবাসী অঞ্চলে এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। শতাব্দির পর শতাব্দি তাঁরা নিরুপদ্রবে ওই নিরক্ষর-নিরন্ন-নিঃস্ব গ্রামবাসীর মধ্যে সেবার মাধ্যমে প্রভু যীশুর প্রেমের বাণী প্রচার করে এসেছেন। সম্মানও পেয়েছেন। মুসলমান শাসকদের হাত থেকে শাসনযন্ত্র যখন ইংরেজের হাতে চলে এল তখন ধর্মপ্রচার ও সেবার কাজ ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। ভারতীয় অনুন্নত শ্রেণীর

pathagar.net

মধ্যে তাঁদের সেবা এবং উন্নয়নকার্য ভারত সংস্কৃতিতে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

দীর্ঘ অর্ধসহস্রাব্দিকাল এইসব ধর্মান্তরিতদের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতবাসীর—হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতির সঙ্গে ধর্মের কারণে কখনো কোন বিবাদ বা সংঘর্ষ হয়নি। বহু ইংরাজ অথবা ইউরোপীয় খ্রিস্টান ভারতে এসে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের সন্তান-সন্ততি ইউরেশিয়ান বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরূপে পরিচিত। তাঁরা ধর্মে খ্রিস্টান সন্দেহ নেই—কিন্তু মহা-ভারতের মূল সংস্কৃতি-স্রোতে অনায়াসে মিশে গেছেন। স্বাধীনতাযুদ্ধে, শিক্ষার জগতে, খেলাধুলার প্রাঙ্গণে—হকিতে, টেনিসে—তাঁরা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারতের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন।

ঊনবিংশ শতকের দুইজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের নাম এ প্রসঙ্গে অবশ্য স্মর্তব্য। একজন ভিভিয়ান ডিরোজিও। কলকাতার হিন্দু কলেজে তিনি নবজাগরণের ভগীরথ। অতি অল্পবয়সে তিনি প্রয়াত হন ;কিন্তু তাঁর উপ্ত বীজ ভারত-সংস্কৃতির একাধিক মহীরুহরূপে মাথা তুলে দাঁড়ায়—মাইকেল মধুসূদন, রামতনু লাহিড়ী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ডিরোজিও ঊনবিংশ শতাব্দির বেঙ্গল রেনেসাঁর অবিসংবাদিত আদিসূরী।

দ্বিতীয়জন অ্যান্টনি কবিয়াল। কবিগানের আসরে সমকালীন খিস্তি-খেউড়কে অপসারিত করে তিনি আসর মাতিয়ে তুলতেন। বস্তুত তিনি কবীর-দাদূ প্রভৃতির উত্তরসূরী। কৃষ্ণ ও খ্রিস্টকে মেলাতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা কালীমন্দিরে আজও নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে—বহুবাজারের 'ফিরিঙ্গি কালী'।

খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী বহু মনীষী—ভারতীয় না হয়েও— ভারত-সংস্কৃতিতে তাঁদের অবদান স্বর্ণাক্ষরে রচনা করে গেছেন। হয়তো সেন্ট জেভিয়ার্স দিয়ে সে তালিকার সূচনা; পরে স্যার জোন্স, ডেভিড হেয়ার, বেথুন, দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ, ভগিনী নিবেদিতা পার হয়ে আমাদের সমকালে মাদার টেরিজা, সকলেই ভারত-ঐতিহ্যের নানান দীপবর্তিকা।

অতি সাম্প্রতিককালে অবশ্য এই ধারাটিতে উপদ্রবের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কিছু উগ্রপন্থী সংগঠন এবং প্রতিবেশী রাজ্যের কিছু অনুপ্রবেশকারী দুষমনের নেতৃত্বে ইদানীং সেইসব খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের বিরুদ্ধে নানান অত্যাচার শুরু হয়েছে। যার চরম উদাহরণ উড়িষ্যার বারিপাদায় সম্প্রতি রেভারেন্ড স্টেইনস্-এর উপর কিছু হিন্দু উগ্রপন্থীর নৃশংস আক্রমণ! এমন ঘটনা ইতিপূর্বে ছিল অচিন্ত্যনীয়। সেই অস্ট্রেলিয়ান ধর্মযাজক এবং তার দুই নাবালক পুত্রকে তাঁর জিপের ভিতরে পুড়িয়ে মারা হয়! এ নৃশংসতা অকল্পনীয়। সংবাদপত্রে জেনেছি, আততায়ী স্থানীয় কিছু ধর্মান্ধ উগ্রপন্থীর সহায়তায় দীর্ঘদিন ওই এলাকাতেই আত্মগোপন করে বাস করে। সেকথা সত্য হলে ধরে নিতে হবে : এই অমানুষিক পাপকার্যের সমর্থন ছিল একশ্রেণীর ধর্মান্ধ সংগঠনের।

ধর্মের কারণে ভারতে আগেও হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে সত্তর-আশি বছর পূর্বে একই অপরাধে খুন করা হয়েছিল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় হিন্দুধর্মের আওতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল চোরাগোপ্তা খুন।

pathagar.net

আততায়ীকে ধরা যায়নি। তাকে কোন ধর্মীয় সংগঠন আত্মগোপনে সাহায্য করেছিল বলেও প্রমাণ নেই। মহাত্মা গান্ধী ও ইন্দিরা গান্ধীও বস্তুত নিহত হয়েছেন ধর্মের কারণেই। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আততায়ীরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। রেভারেন্ড স্টেইনস্-এর হত্যাকারীকে কিন্তু একদল মানুষ প্রচ্ছন্নভাবে আত্মগোপনে সাহায্য করেছে। অতি সম্প্রতি একজন দুঃসাহসী পুলিস অফিসারের কৃতিত্বে দারা সিং নামে একজন আসামীরূপে ধরা পড়েছে। তার বিচার চলছে।

এমন ঘটনা ইদানীং কিন্তু প্রায়ই নজরে পড়ছে। কিছু মিশনারী স্বেচ্ছাসেবিকাও আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যত্র গীর্জা আক্রমণ করা হয়েছে। কিছু হিন্দু উগ্রবাদীর বক্তব্য: খ্রিস্টান পাদরীরা লোভ দেখিয়ে হিন্দু আদিবাসীদের ধর্মান্তরিত করছেন। তা সত্য হলেও এই কি তার প্রতিকারের আয়োজন? তাছাড়া এই অভিযোগের পশ্চাৎপটে আদৌ কোন সত্য আছে কিনা, এটা পাকিস্তানী শয়তানদের কাজ কিনা সেটাই প্রথমে বিবেচ্য।

সরকার যদি এইসব উগ্রবাদী নেতাদের কড়া হাতে শাসন করতে না পারেন তাহলে ভারত-সংস্কৃতিতে যে ধর্মনিরপেক্ষ-স্বরূপটা আছে সেটা ক্রমশ ভেঙে পড়বে। উগ্রবাদী হিন্দু বজরঙবলীদের প্রেরণা দু'-তরফে। প্রথমত, রাজনৈতিক মুনাফা লোটা। কট্টর হিন্দু সংগঠন সৃষ্টি করে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করা। দ্বিতীয়ত, আর্থ-সামাজিক প্রেরণা। অনুন্নত আদিবাসী সমাজে যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে তারা গীর্জা থেকে নানাভাবে সাহায্য পায়। তাদের সন্তানেরা ইউনিফর্ম পরে স্কুলে পড়তে যায়, বড়রা শীতে কম্বল পায়। উৎসবে উপহার পায়। প্রতিটি গ্রামেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-খ্রিস্টানরা এই সুযোগ পায় না। ফলে কট্টর হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা তাদের মদতে দল-পাকাবার সুযোগ পায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভোট প্রত্যাশা করে।

খ্রিস্টান পাদরীদেরও যেন লক্ষ্যমুখ ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। এককালে তাঁরা এদেশে আসতেন যীশুর বাণী সার্থক করতে— নিপীড়িত জনগণের সেবায়। যে মনোভাবের চরম উদাহরণ : মাদার টেরিজা।

কিন্তু অধিকাংশ ধর্মযাজকের এখন মূল লক্ষ্য হয়ে যাচ্ছে : 'কনভার্শান' অর্থাৎ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া। স্কুল-হাসপাতাল-কুটিরশিল্প ইত্যাদি হচ্ছে ওই মূল লক্ষ্যের আবশ্যিক, প্রলোভনপ্রতীক!

'অধিকাংশে'র না হোক অনেক খ্রিস্টান ধর্মযাজকের লক্ষ্যমুখ যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে বা যাচ্ছে— সেবাধর্ম থেকে কনভার্শান-প্রয়াসে— তা অনস্বীকার্য।

কিন্তু তাঁদেরই বা দোষারোপ করি কীভাবে? অতি সাম্প্রতিককালে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভ্যাটিকান থেকে মহামান্য পোপ এসেছিলেন ভারতের আতিথ্য স্বীকার করে। কমান্ডো-দেহরক্ষী বেষ্টিত মহামান্য অতিথিকে আগ্রার তাজমহল, দিল্লি, মুম্বাই প্রভৃতি ঘুরিয়ে দেখানো হল। প্রতিটি শহরের গীর্জায় তিনি মহতী সভায় বক্তৃতা দিলেন। প্রভু যীশুর সেবাধর্মের আলোচনার অপেক্ষা সে বক্তৃতাগুলিতে গুরুত্ব পেল—কীভাবে হীদেন্‌দের প্রভু যীশুর ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে আসা যায়।

pathagar.net

বিদায়কালে মহামান্য পোপ শেষ ভাষণ যখন দিচ্ছেন ততদিনে 'Y2K'-র ঝামেলা মিটেছে। মহান পোপ তাঁর বিদায়ী বক্তৃতায় বললেন, 'প্রথম সহস্রাব্দিতে খ্রিস্টধর্ম গোটা ইয়োরোপ জয় করেছিল, দ্বিতীয় সহস্রাব্দিতে আমেরিকা ;এবার এই তৃতীয় সহস্রকে আমাদের লক্ষ্য গোটা এশিয়া জয় করা।' যীশুর 'সেবাধর্ম' সে বক্তৃতায় উপেক্ষিত!

স্বকর্ণে শুনিনি, একাধিক সংবাদপত্রে পড়েছি, দূরদর্শনে দেখেছি। তাতে মনে হল, ভারত সরকার যদি মহামান্য পোপের পরিবর্তে মহামান্য ওমানা বিন লাদেনকে অতিথি করে নিয়ে আসতেন তাহলে তিনিও হয়তো একই সুরে বলতেন, 'প্রথম অর্ধসহস্রাব্দিতে ইসলাম মধ্য এশিয়া ও ইয়োরোপের দক্ষিণাংশ জয় করেছিল, দ্বিতীয় অর্ধসহস্রাব্দিতে গোটা আফ্রিকা। এবার এই তৃতীয় সহস্রকে আমাদের গোটা দুনিয়া জয় করতে হবে!'

হায় আল্লাহ্!

"তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে-মসজিতে,
তোমার ডাক শুনি সাঁই,
চলতে না পাই,
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মোরশেদে।"

5. ঈশ্বরসম্পৃক্ত হিন্দুধর্ম :

হাজার-করা নয় শত নিরানব্বই জন হিন্দু ঈশ্বরবিশ্বাসী। বাদবাকি ওই একজন অজ্ঞাবাদী অথবা নিরীশ্বরবাদী। তা বলে সেই বিন্দুবৎ সংখ্যালঘিষ্ঠকে বাকি সবাই ঠেঙিয়ে দেশছাড়া করেনি। চার্বাক-জবালা ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত মনীষী। অনেক গ্রামেই সসম্মানে আজও বর্তমান 'শচীশের জ্যাঠামশাই'। তাঁরা কোনো দেবমন্দিরে মাথা নোয়ান না। তাঁদের চিন্তা শুধু : 'প্রচুরতর লোকের প্রভূততর মঙ্গল বিধান।' তাঁরাও হিন্দু।

বাকি নয়শত নিরানব্বই জন আস্থা রাখেন নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার ওপর। কেউ শিব, কেউ কালী, কৃষ্ণ, কেউ বা গণপতি। ব্রাহ্মের যেমন ব্রহ্ম, শিখের যেমন অলখ্ নিরঞ্জন, খ্রিস্টানের যেমন গড, মুসলমানের যেমন আল্লাহ্।

প্রভেদ কি নেই? আছে।

খ্রিস্টানের কাছে 'গড' বই উপাস্য নেই,

মুসলমানের কাছে 'আল্লাহ্' ভিন্ন উপাস্য নেই,

হিন্দুর তা নয়। শৈব বলে আমি শিবভক্ত, আর তুমি বুঝি শাক্ত? তা বেশ তো! একখানা কালীকীর্তনই শোনাও তো দাদা!

গাণপত্য বলে, আমি দেব বিনায়কের উপাসক, আর তুমি? ও বৈষ্ণব বুঝি? তা ভালো! একখানা কৃষ্ণকীর্তনই হয়ে যাক!

আবার একটা চুট্‌কি গল্প মনে পড়ছে। এটাও গল্প নয়। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা। সেটা 1940 সাল। আমি তখন মেজদির বাড়িতে আসানসোলে ই. আই. রেলওয়ে স্কুলে পড়ি। জানুয়ারি মাস। সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। রাত জেগে পড়াশুনা করতে হচ্ছে। হঠাৎ নজর হল : মেজদির ঠাকুরঘরে আলোটা জ্বলছে। রাত তখন দুটো।

boiRboi.net

কৌতূহল হল। উঠে গিয়ে দেখি, মেজদির অশীতিপর শাশুড়ি পূজাঘরে কী-সব খুট্-খাট করছেন। আমি শুধাই, কী মাঐমা, মাঝরাতে ওখানে কী করছেন?

বৃদ্ধা নিদন্ত তোবড়ানো গালে একগাল হাসলেন। বললেন, এক্কেরে ভুলে গেস্‌লাম নারায়ণ— গোপালের মশারি না টাঙিয়েই শুয়ে পড়েছি। হঠাৎ স্বপ্নে দেখি, গোপাল বলছেন, 'আজ মশারি টাঙাস্‌নি কেন রে বুড়ি? মশায় কামড়ে শেষ করে ফেলল আমারে'। ঘুমটা তাই ভেঙে গেল।

দেখলাম, তিনি একহাত-বাই-একবিঘৎ নেটের মশারিটা টাঙিয়ে আবার ঠাকুরকে শয়ান দিলেন।

বুঝুন কাণ্ড! অষ্টধাতুর চার-ইঞ্চি মাপের নাড়ুগোপাল! মশার কামড়ে তাঁর নাকি ঘুম হচ্ছিল না! তাই দিদাকে স্বপ্ন দিয়ে ঘুম থেকে টেনে তুলেছেন। নির্ভেজাল কাফেরের পুতুলপুজো!

সেদিন মুখ লুকিয়ে হেসেছিলাম। কিন্তু আজ মনে হয়, বৃদ্ধা তো হাস্যাস্পদ আচরণ কিছুই করেননি! নাতি-নাতনিরা সব বিদেশে—এন. আর. আই.! তাই ওঁর বঞ্চিত 'ঠাকুরমাতৃত্ব' এই বিকল্প পথে সান্ত্বনা খুঁজছে। সান্ধ্যকৃত্যে মশারি টাঙাতে যে ভুল হয়েছে সেটা ওঁর অবচেতন মন ভোলেনি। স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙেছে! তিনি যদি দেবতাকে নাতিরূপে দেখে, তাই নাড়াচাড়া করে তৃপ্তি পান, তাহলে আমি কেন বোকার হাসি হাসি?

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"— যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে আমি তার কাছ থেকে সেভাবেই পূজা গ্রহণ করে থাকি।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলছেন, "বাহির হইতে ভারতে যেসব ধর্ম আসিয়াছে, তাহারাও এখানে আসিয়া সকলের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়াই ধর্মসাধনা করিয়াছে। ধর্মের সংকীর্ণ আত্মসর্বস্ব ও আত্মসীমাবদ্ধ ভাবটা হইল বাহির হইতে হালের আমদানি। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দিন দিন যে তাহাকে ক্রমেই উগ্র করিয়া তোলা হইতেছে (প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের রচনা কিন্তু) তাহা এই দেশের চিরদিনের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

"সমুদ্রে নদীর মতো আগত সব ধর্মই ভারতে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। কোন ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্বকেই ভারত বাধা দেয় নাই বা নষ্ট করে নাই। সকলে মিলিয়া পাশাপাশি সাধনা করিয়াছে। ইনকুইজিশনের * ইতিহাস আমাদের দেশের নয়। তাহা পশ্চিমদেশের। পশ্চিমই আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে অনুদার হইতে শিখাইয়াছে। উৎপীড়িত একদল খ্রিস্টান প্রথম শতাব্দিতেই দেশ ছাড়িয়া এখানে আসেন ও সাদরে গৃহীত হন। রাজারা তাঁহাদের ভূবৃত্তি দেন। উৎপীড়িত পারসী এখানে আদর ও আশ্রয় লাভ করেন। মুসলমান বিজয়ের বহু পূর্বেই দেখা যায় মুসলমান সাধকের দল ভারতে আসিয়া সমাদর আশ্রয় লাভ করেন। জৈনদের পুরাতন প্রবন্ধে পাই অনুপমা দেবী নিজের ব্যয়ে ভারতের নানা স্থানে মুসলমান উপাসকদের জন্য আশিটি মসজিদ তৈয়ারি করাইয়া দেন।"

* ত্রয়োদশ শতাব্দিতে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের আদেশে একটি 'হোলি-অফিস' গঠিত হয়। খ্রিস্টধর্মের এবং পোপের অনুশাসনের বিরুদ্ধে কেউ মতপ্রকাশ করলে এই ট্রিবুনালের বিচারে কঠিন শাস্তির বিধানের ব্যবস্থা ছিল—মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত।

pathagar.net

ক্ষিতিমোহন অন্যত্র আরও বলেছেন, "প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে অবৈদিক বহু সংস্কৃতি ও ধর্ম ছিল। সেইসব অবলম্বন করিয়াই হিন্দুধর্ম। বৈদিকধর্ম কর্মকাণ্ড প্রধান, দ্রবিড়ধর্ম ভক্তিপ্রধান। এইসব নানা সংস্কৃতির ও ধর্মের পলিমাটির স্তর পড়িয়া ভারতের ধর্মভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। খৃষ্ট হইতে যেমন খ্রিষ্টীয় ধর্ম, এমন করিয়া কোনো ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের নামে ভারতের ধর্মকে চিহ্নিত করা যায় না। ভারতে যত ধর্ম আসিয়াছে সকলেরই সাধনা সমন্বিত হইয়া ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দুধর্ম হইয়াছে। 'হিন্দু' অর্থ যাহা 'হিন্দ্'-এর অর্থাৎ ভারতের সকল সাধনার সমন্বয়ে প্রাপ্ত।"

অর্থাৎ আচার্য ক্ষিতিমোহনের মতে, শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব বা গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু 'হিন্দ্'-এর যে মহান ধর্ম—যাকে সংক্ষেপে 'হিন্দু'ধর্ম নামে অভিহিত করা হচ্ছে, তা ভারতের মাটিতে, ভারতের জলহাওয়ায় বর্ধিত বিভিন্ন সাধকদের সাধনার সুমিশ্রিত ফল। সে সাধকদলে আদিনাথ, বুদ্ধদেব, গুরুনানক যেমন আছেন, তেমনি পরোক্ষভাবে আছে জরথুস্ত্র, যীশু, হজরত মহম্মদের চিন্তাধারাও।

কেন নয়? ডিরোজিওর দেশাত্মবোধক রচনা, অ্যান্টনি কবিয়ালের কালীকীর্তন, অধ্যাপক স্যার জন উড্‌রফ-এর শাক্ততন্ত্রের উপর প্রামাণিক গবেষণা কি ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার অঙ্গ নয়? এঁরা তো সকলেই খ্রিস্টান! তেমনি দরাফ খাঁর সংস্কৃত গঙ্গাস্তোত্র, গোলাম মৌলার বাংলার আগমনী গান, লালন-হাসন-মদন প্রভৃতি মুসলমান কবির অধ্যাত্মসাধনা কি হিন্দু সংস্কৃতির সম্পদ নয়? অত কথা কি? কাজী নজরুল ইসলাম যখন তাঁর *শেষ সওগাতে* কাফেরদের ভর্ৎসনা করেন :

"ভারত জুড়িয়া শুধু সন্ন্যাসী, সাধু ও গুরুর ভিড়,
তবু এ ভারত হইয়াছে কেন ক্লীব মানুষের নীড়?

... ...

শুম্ভ-নিশুম্ভরে যে মারিল, সে চণ্ডী কি গেছে মরে?
কুম্ভমেলায় শুধায়েছ কেউ সাধুদের জটা ধরে?
জটা তাহাদের কটা হয়ে গেল, কটাহ হইল চোখ,
আনিতে পারিল তবু কি তাহারা একটি ফোঁটা আলোক?"

তখন তাঁর হিন্দু-ভক্তের দল মাথা নিচু করে তিরস্কারটা শোনে। প্রতিবাদ করে না!

মদন মিঞার বাউল-গান যখন শুনি তখন কি মনে প্রশ্ন জাগে সরস্বতীর বীণার ঝঙ্কারে যিনি নামাজের ধ্বনি শুনতে পান তিনি হিন্দু না মুসলমান?

"যদি করিস্ মানা ওগো বন্ধু
মানি এমন সাধ্য নাই...
কোনো ফুলের নামাজ রংবাহারে
কারো গন্ধে নামাজ অন্ধকারে
বীণার নামাজ তারে তারে, আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।"

pathagar.net

এই বৃহত্তর 'হিন্দ্'-এর ধর্ম—'হিন্দুধর্ম' মানুষে-মানুষে কোনো ভেদাভেদ মানে না। অথর্ববেদ তাই বলেছেন, "যে পুরুষে ব্রহ্মবিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্ (যাঁরা মানুষের মধ্যে পরমেশ্বরকে, ব্রহ্মকে, গডকে, আল্লাহ্‌কে দেখতে পান, তাঁরাই তাঁকে লাভ করেন)।

বলেছেন, "মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে" (আমি যেন সকল জীবকে মৈত্রীর দৃষ্টিতে, বন্ধুভাবে দেখতে শিখি)।

ইতিপূর্বেই আমরা মহাভারতের বনপর্ব থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করে দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তখন তার অন্বয়-ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

এখন আচার্য ক্ষিতিমোহনের *"ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত-সাধনা"* গ্রন্থ থেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব প্রণীত মূল শ্লোকটি এবং আচার্য ক্ষিতিমোহনের অনুবাদ দিয়ে এ পরিচ্ছেদের সমাপ্তি টানি :

ব্যাসদেব বলছেন :

"ধর্মং যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্মঃ কুবর্ত্ম তৎ।"

আচার্য ক্ষিতিমোহন অনুবাদে বলছেন :

"কোনো ধর্ম যদি অন্য কোনো ধর্মকে বাধা দেয়, পীড়া দেয়, তবে তাহা ধর্ম নহে, তাহা কুবর্ত্ম—ভ্রান্ত পথ।"

শ্লোকার্ধে একই কথা বলেছেন ঠাকুর : "যত মত তত পথ।"

এখানে একটা কথা। 'যত মত' মানে ঈশ্বরলাভের, মুক্তি-নির্বাণ-স্যাল্‌ভেশন, বিসমিল্লার কৃপালাভের যে ধর্মমত, তাই। অর্থাৎ হিটলারের 'ইহুদিনিধন' নিপীড়ন মত, অথবা ওসামা বিন লাদেনের কাফের-নিধন মারণমন্ত্র 'মত' নয়, তাই 'পথ'ও নয়—ভ্রান্ত পথ, কুবর্ত্ম!

তাহলে কোন্‌টা 'মত', কোন্‌টা কুবর্ত্ম তা বুঝব কী করে? সে নির্দেশ যুগে-যুগে দিয়ে গেছেন যুগাবতারেরা। আড়াই হাজার বছরের ব্যবধানে দুটি উদাহরণ আপনাদের সামনে দাখিল করি।

কুশীনগরের উপকণ্ঠে লোকুত্তম বুদ্ধদেব যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত (আঃ 488 খ্রিঃ) তখন তাঁর কাছে মাত্র একজন শিষ্য উপস্থিত : ভিক্ষু আনন্দ। তিনি বুদ্ধদেবকে শেষ প্রশ্ন পেশ করলেন : "আপনার মহাপরিনির্বাণের পরে ধর্ম সম্বন্ধে মনে কোনো প্রশ্ন জাগলে আমরা কার কাছে যাব, সমাধান-সন্ধানে?"

বোধকরি আনন্দ জানতে চেয়েছিলেন, বুদ্ধদেবের পরে কে হবেন সঙ্ঘপ্রধান? সারিপুত্ত না মহামৌদ্‌গল্ল্যায়ন?

বুদ্ধদেব সেদিক দিয়ে গেলেন না। প্রশ্নটি সরল অর্থে গ্রহণ করে মাত্র তিনটি পঙ্‌ক্তিতে দিয়ে গেলেন তাঁর শেষ নির্দেশ :

"আত্মদীপো ভব,
আত্মশরণো ভব,
অনন্যশরণো ভব।"

অর্থাৎ নিজেকে প্রদীপ করে জ্বালাও। সেই আত্মদাহনকারী আলোকে বিবেক-নির্দেশিত পথে জীবন-পথ পরিক্রমা করবে। অপরের কথায় কান দিও না!

pathagar.net

মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে এতবড় কথাটা আর কোনো মহাপুরুষ বলতে পেরেছেন বলে তো জানি না।

এই ঘটনার প্রায় 2431 বছর পরে সিঙাপুরে একদিন আজাদ্-হিন্দ্-ফৌজের যুদ্ধমন্ত্রী এস. এ. আইয়ার সর্বাধিনায়কের কাছে তাঁর অটোগ্রাফ খাতাখানা বাড়িয়ে ধরে কিছু উপদেশ লিখে দিতে অনুরোধ করেছিলেন।

নেতাজি লিখে দিয়েছিলেন :

"My knee shall bend I calmly pray
To God and God alone--
My body is in my country's hands,
But my **Conscious** is my own."

অধমের অনুবাদে যা :

"চিরউন্নত বিদ্রোহী শির লোটাব না কারও পায়ে,
তোমারেই শুধু করিব প্রণাম, অন্তরতম প্রভু!
জীবনের শেষ শোণিতবিন্দু দিয়ে যাব দেশভাইয়ে
রহিবে বিবেক সে শুধু আমার! বিকাবো না তারে কভু!"

প্রথম উপদেশটি ঈশ্বরবিবিক্ত মহাপুরুষের ; দ্বিতীয়টি ঈশ্বর (God, ব্রহ্ম, আল্লাহ্, অলখ নিরঞ্জন, যে কোনো অভিধাতেই সেই অন্তরতম প্রভুকে ডাকুন না কেন) বিশ্বাসী মহাবিপ্লবীর। কিন্তু দুজনে একই কথা বলে গেছেন আড়াই হাজার বছরের ব্যবধানে।

কোন্‌টা ধর্মপথ, কোন্‌টা কুবর্ত্ম বুঝে নেবার ওই একটাই কষ্টিপাথর। একটাই অ্যাসিড-টেস্ট : নিজের বিবেক। বেদ, জেন্দ্-আবেস্তা, বাইবেল, কুরআন বা গ্রন্থসাহেব নয়।

6. ইসলাম :

বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মতো এ ধর্মমত ভারত-ভূখণ্ডে জন্মলাভ করেনি। বরং পারসিক অথবা খ্রিস্টধর্মের মতো এই ধর্মমত বহির্ভারত থেকে এসেছে। সেই একই অঞ্চল থেকে : মধ্য এশিয়া।

আরবদেশে বহু পূর্বযুগ থেকেই নানান সম্প্রদায়ের মধ্যে মারামারি, হানাহানি আর নীতিহীনতা চলে আসছিল। তাদের এক-এক সম্প্রদায় এক-এক দেবতার উপাসক।

সপ্তম শতাব্দির প্রথম পাদে সেখানে আবির্ভূত হলেন নবী হজরত মহম্মদ (দঃ)। নেতাজি যাঁকে 'অন্তরতম প্রভু' বলেছিলেন, মহম্মদ সেই দীনদুনিয়ার মালিকের কাছ থেকে (তাঁকে 'আল্লাহ্' নামে অভিহিত করেছেন) তিনি প্রত্যাদেশ পেলেন—এইসব অরাজকতা দূরীকরণ করে সবাইকে এক ছত্রতলে নিয়ে আসতে— মৈত্রী আর শান্তির বন্ধনে।

আচার্য ক্ষিতিমোহন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "সেই যুগ ও সেই দেশের কথা ভাবিলে তাঁহার উপদেশের মহত্ত্বে ও উদারতায় বিস্মিত হইতে হয়। চারিদিকে মারামারি, রক্তস্রোত —আর তিনি তাহারই মধ্যে প্রচার করিতেছেন : শান্তি ও মৈত্রীর সাধনায় যথার্থ ধর্ম!"

pathagar.net

ধর্মমত হিসাবে ইসলাম একেশ্বরবাদী, প্রগতি ও সাম্যের বনিয়াদে তা সুদৃঢ়। সৃষ্টিকর্তা যখন একমাত্র একজন—আল্লাহ্— তখন তাঁর দৃষ্টিতে সকলেই সমান। এ থেকেই ইসলামে 'মিল্লাৎ' বা বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণা গড়ে উঠেছে। জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি এই তিনটি মূল স্তম্ভের উপর ইসলামের ইমারত। সবার উপরে চাই : আল্লাহ্-র প্রতি আবদুল (একান্ত আত্মসমর্পণ)।

আল্লাহ্ বিশ্বস্রষ্টা। তিনি বিশ্বময় বিরাজিতই শুধু নন, বিশ্বাতীতও। তাঁকে একান্তভাবে জিকর-এ (স্মরণ করলে ও শরণ নিলে) তিনি ভক্তের আবেদনে সাড়া দেন। ইসলামে আল্লাহ্ ব্যতীত তাঁর প্রেরিত পুরুষ বর্তমান। নবী হজরত মহম্মদ (দঃ) সেই প্রেরিত পুরুষ।

অন্য ধর্মাবলম্বীকে বলপূর্বক ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা, অন্যথায় তাকে হত্যা করার নির্দেশ ইসলামে নেই। তাই বলা হয়েছে :

"লা ইক্‌রাহা ফিদদিন, কাল্ডারবাইয়ানার রুশদু
মিল গাই নয়ি।" (সুরা বাকারা : রুকু 34)

অর্থাৎ—ইসলাম গ্রহণে বলপ্রয়োগের বিধান নেই। যেহেতু সুপথ এবং কুপথ স্বতঃই পৃথকরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

হজরত মহম্মদের মহাবাণী আর তাঁর সাধনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হইয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে মহম্মদ অন্তরের দিকে, অখণ্ডের দিকে, অনন্তের দিকে লইয়া গিয়াছেন। সহজে পারেন নাই। এজন্য তাঁহাকে সমস্ত জীবন মৃত্যুসঙ্কুল দুর্গম পথ মাড়াইয়া চলিতে হইয়াছে। চারিদিকে শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মতো ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে নিরন্তর আক্রমণ করিয়াছে। ...ইসলাম কথার মূল হইল সল্‌ম। তাহার অর্থ : শান্তি, মৈত্রী, আত্মসমর্পণ, পাপমুক্তি..."

হজরত মহম্মদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে যাঁদের আসবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁদের মতে, কুরআনের মূল বাণীকে যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ সেগুলি স্বয়ংসিদ্ধ।

তাত্ত্বিক দিক থেকে ধর্মপ্রবর্তকের প্রয়াণের পরে তাঁর শিষ্যদলের মধ্যে তিনটি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল :

1. মূতাকল্লিমীন : এঁরা শাস্ত্রপ্রামাণ্যবাদী। শাস্ত্রীয় মতকে যুক্তির দ্বারা সমর্থনে প্রয়াসী।
2. ফলাসীকা : এঁরা প্রচলিত দার্শনিক বিচার-পদ্ধতির উপর আস্থাবান। সম্ভবত গ্রীক-দর্শনের দ্বারা এঁরা কিছুটা প্রভাবিত।
3. সুফীপন্থী : কেতাবি-নির্দেশের বাহিরে এঁরা আধ্যাত্মিক আবেগ তথা প্রত্যক্ষ মানবিক অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত।

ভারত-সংস্কৃতিতে এই সুফীবাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এ মতবাদে মানব-সত্তার উপর অধিক পরিমাণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানব-অন্তরের বাহিরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে এঁরা অনুৎসাহী। তরীকৎ বা মার্গ এবং মরীকৎ বা জ্ঞান এই দুইয়ের সমন্বয়েই

pathagar.net

মানুষ তার আন্তরগভীরে আল্লাহ্-র করুণা লাভ করতে পারে—এটাই ওঁদের বিশ্বাস। মার্গ সাত রকমের : সেবা, প্রেম, ত্যাগ, ধ্যান, যোগ, সংযোগ এবং সমীকরণ।

সুফীধর্ম গুরুমুখাপেক্ষী। গুরু হচ্ছেন পীর বা মুর্শিদ। তিনিই 'সাঁই'-এর সন্ধান বাৎলাতে পারেন।

ভারত-সংস্কৃতির মহাসমুদ্রে যে তিনটি বিদেশী ধর্মের ধারা এসে মিশেছে তার মধ্যে পারসিকরা এসেছিল নিতান্ত আশ্রয়লাভের প্রত্যাশায়। তারা এদেশে রাজত্ব করতেও আসেনি ;কিংবা ধর্মপ্রচার মানসেও নয়।

দ্বিতীয়ত, খ্রিস্টানরা এসেছিল মূলত বাণিজ্য করতে—লুটেরার ভূমিকায়। তাই রাত পোহালে বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছিল খ্রিস্টান ধর্মান্তঃকরণের প্রেরণা। তার মূলে সেবা ধর্ম। ধর্মপ্রচারকেরা ভারতীয় হয়ে যাননি, কিন্তু অধিকাংশ ভারতপ্রেমিক হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের ভিতর অনেকে—স্যার জোন্স্ থেকে হেয়ার, বেথুন, সিস্টার নিবেদিতা, দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ থেকে মাদার টেরিজা ভারত সংস্কৃতিতে অসীম প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। অন্যথায় কিছু ধর্মপ্রচারকের অন্তরে ছিল হিদেন্স্দের বিরুদ্ধে ঘৃণা।

ইসলামও এসেছিল সমান্তরাল দ্বিধারায়।

প্রথম ধারাটি লুট-তরাজ, রাজ্যবিস্তার এবং ইসলামধর্মে ধর্মান্তরকরণের মধ্যে সংকীর্ণ। মহম্মদ (দঃ)-এর মৃত্যুর ঊনআশি বৎসরের মধ্যেই এসেছিলেন মহম্মদ-বিন-কাশিম। তিনি ছিলেন কুরেশী আরব এবং হজরৎ মহম্মদের নিকট গোষ্ঠী আশরাফ সৈয়দ প্রভু বংশোদ্ভব। কিন্তু বিন-কাশেমের (712-714 খ্রিঃ) তিন বছরের ভারত অভিযান ও সিন্ধু জয়ের কোন ধারাবাহিকতা ছিল না। বিন-কাশেম অত্যাচারের চূড়ান্ত করেন। সিন্ধুর পরাজিত রাজা দাহিরের দুই কন্যাকে ভোগ করার পর খলিফার হারেমে প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রথম তিনশ বছর সিন্ধু পর্যন্ত মুসলিম অধিকারের রাজ্য ও বাকি ভারত নিরুপদ্রবে বসবাস করেছে।

সিন্ধু ছাড়া ভারতের অভ্যন্তরে ইসলাম এসেছে মহম্মদ গজনীর (998-1026) আক্রমণের মাধ্যমে। পরে দাস-খল্জী-তুঘলক-লোদী প্রভৃতি দীর্ঘ পাঁচশত বৎসরের সুলতানী শাসনকালে। তারপর বাবুরের (1526-1530) যুগ থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের শুরু এবং অবসান বস্তুত ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুতে (1702 খ্রিঃ)। অষ্টম শতাব্দির প্রথম থেকে মুঘল যুগের শেষ পর্যন্ত (আহমেদ শাহ্ আবদালী—তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ : 1761 খ্রিঃ) ভারতে আরব-তুর্কী-মঙ্গোল-আফগান যত ধারা এসেছে, কেউই তাদের জাতিসূত্রের পরিচয় বহন করে আসেনি। তারা এসেছিল একটিমাত্র পরিচয় বহন করে : ইসলামধর্মী।

কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাসের উপর বিভিন্ন সংস্কৃতির জনসমষ্টি একই জাতিভুক্ত হতে পারে না। ফরাসী দার্শনিক লা পেরা রেনান্ যথার্থই বলেছিলেন, "Man is enslaved neither by race nor by religion, neither by the courses of streams nor by the ranges of mountains—great congregession of people, sane of

pathagar.net

mind and warm of heart, creates a moral consciousness--which is called 'Nation' ".

এই কথাটা নিজের এবং নিজের গোষ্ঠী-স্বার্থে বুঝতে চাননি মহম্মদ আলী জিন্নাহ্। ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে 'মুসলমান-জাতির' জন্য ভারতের দুই প্রান্তে দুটি পাকিস্তানের আবেদন নিয়ে তিনি ইংরাজের দরবারে হাজির হলেন। ইংরেজের নিজের স্বার্থে ভারত দ্বিখণ্ডিত হল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান আবার বুঝিয়ে দিলেন শুধু ধর্মের বন্ধনে একটি দেশ, একটি জাতি তাদের লোকায়ত আচার আচরণ বা ভাষাকে বিসর্জন দিতে পারে না।

ভারত যেভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল সেভাবেই পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে পূর্বপ্রান্তে জন্ম নিল স্বাধীন : বাংলাদেশ।

প্রায় সহস্রাব্দিকাল মুসলমান শাসকেরা ভারতবর্ষে যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করেছে, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের প্রচেষ্টায় চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে, এটা ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য।

কিছু কিছু আধুনিক মুসলমান পণ্ডিত এটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চান। যেমন ধরুন *'ইসলাম সম্পর্কে অমুসলমানদিগের ভুল ধারণা'* গ্রন্থে জনাব আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আলমান্নান লিখেছেন, "প্রচলিত ইতিহাসে আমাদের শেখানো হয়েছে বহির্ভারত থেকে মুসলিম আক্রমণ হল। সঙ্গে সঙ্গে এল অস্ত্রশস্ত্র, হাতি, ঘোড়া আর নিষ্ঠুর অত্যাচারীর দল। ভারতে এসে তাঁরা নাকি শুরু করলেন ভারতীয়দের হত্যা, মন্দিরগুলির ধ্বংসসাধন, হিন্দুদের জোর করে মুসলমান করা, ইত্যাদি...ওগুলো ভিত্তিহীন, অসত্য ও সুপরিকল্পিত সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত।"

লেখক কোন সাম্রাজ্যবাদীকে দোষারোপ করতে চান? যে-যুগের কথা, তখন তো হিন্দু বা খ্রিস্টান সাম্রাজ্য ভারতে ছিল না। মুসলিম ইতিহাসের আকর-গ্রন্থগুলি শুধুমাত্র মুসলমানেরই রচনা। ভিনসেন্ট স্মিথ, ঈশ্বরীপ্রসাদ, যদুনাথ সরকার, রমেশ মজুমদার তো শুধু তথ্য সাজিয়ে গেছেন মাত্র। মূল রচনা তো সব মুসলমান ঐতিহাসিকেরই।

গোয়েবল্‌স্ নীতি— অর্থাৎ সোচ্চারে বারংবার মিথ্যা কথা বলে গেলে সাধারণ মানুষ তা একদিন না একদিন মেনে নেয়—এ-নীতি তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অপ্রমাণিত হয়েছে। তাহলে কেন বলা হচ্ছে—সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠিত হয়নি, ঔরঙ্গজীব 'জিজিয়া'কর পুনঃপ্রবর্তন করেননি? ইসলাম ধর্মগ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় তেগবাহাদুর-সহ অসংখ্য শিখ ও হিন্দুর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি?

ইতিহাসকে অস্বীকার করে নয়, নতমস্তকে স্বীকার করেই বলা যেত, বলা যায় যে, সুলতান-বাদশাহ্-আমীর-ওমরাহদের ওসব অপকীর্তি সত্ত্বেও ইসলাম ভারতের সংস্কৃতিতে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। ইসলামের দানে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাজমহল ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য, মিঞা তানসেন ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ, কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি!

pathagar.net

এ-পর্যন্ত যেসব ধর্মসম্প্রদায়ের কথা আমরা আলোচনা করেছি, তার ভিতর ইসলাম এক বিশিষ্ট স্থান দাবি করতে পারে। একাধিক হেতুতে :

এক : ধর্মীয় বিচারে বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়গুলির ভিতর ইসলাম হচ্ছে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দুধর্মের পরেই জনসংখ্যা অনুসারে মুসলমানদের স্থান।

দুই : ইসলামই বিদেশাগত একমাত্র ধর্ম, যার একাংশ দীর্ঘদিন ভারত শাসন করার পর এদেশে ভারতীয় হয়ে গেছে। ইংরেজ দুশ' বছর ভারত শাসনের পর স্বদেশে ফিরে গেছে। ভারতীয় হয়ে যায়নি।

তিন : যে কাহিনীগুলির মুখবন্ধ হিসাবে এই কৈফিয়তের অবতারণা, তাতে যুযুধান দু'দলের মধ্যে একদল সর্বধর্মের, অপর দল অব্যতিক্রম ইসলামধর্মী।

চার : আফগানিস্তান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের শাসকবৃন্দের অপব্যাখ্যা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের অধিকাংশ বিশ্বাস করেন ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রেম ও প্রীতি প্রার্থনা করে।

পাঁচ : ভারতেতিহাসে আমরা শুধু সুলতান, বাদশাহ্‌দের অপকীর্তির কথাই জেনেছি। এই সহস্রাব্দিকাল ধরে যেসব হিন্দু ও মুসলমান সাধক এবং জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতেরা যৌথ-আয়াসে আজকের ভারত-সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছেন, তাঁদের কথা কেউ বলে না, কেউ আলোচনা করে না। পণ্ডিতেরা অধিকাংশই রাজনৈতিক দলভুক্ত—রাজনৈতিক বিচারেই হিন্দু ও মুসলমানকে তৌল করতে চান। তাঁরা দেশের উন্নতি বা শান্তির চেয়ে বেশি দাম দেন দেশবাসীর ভোটের!

তাই সেই যৌথ সাধনার সামান্য রেখাচিত্র এখানে পেশ করার অনুমতি চাইছি :

ভারত-সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ অবদান :

রাজনীতি ব্যবসায়ী কিছু কট্টর হিন্দু ও মৌলবাদী মুসলমান স্বীকার করতে নারাজ, হিন্দু-মুসলমান সাধকদলের যৌথ সাধনায় বর্তমান ভারত-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে—সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, ক্রীড়াজগৎ ইত্যাদি, প্রভৃতি। অধ্যাত্মসাধনা তো বটেই। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের *ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা* গ্রন্থে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমরা কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় রেখে যাচ্ছি শুধু :

সঙ্গীত : প্রাচীনতম মুসলমান সঙ্গীতগুরু সম্ভবত অমীর খুসরু (জন্ম 1253)। 'প্রাচীনকালের কণকাঙ্গী ঠাট এখন অচল, তার পরিবর্তে বর্তমানে প্রচলিত বেলাওলী ঠাট এই অমীর খুসরুর আবিষ্কার।' বলেছেন আচার্য ক্ষিতিমোহন। খুসরুই পারস্যদেশীয় ইমনরাজের সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় রাগের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নানান নতুন রাগমালায় সঙ্গীত-সরস্বতীকে সাজিয়েছেন। যেমন—ইমন-ভূপালী, ইমন-কল্যাণ, ইমন-পুরিয়া বা ইমন-বেহাগ। মুসলমান উস্তাদদের আমদানী করা পিলু, ঝিঁঝট প্রভৃতি রাগ হিন্দুদের ক্ল্যাসিকাল রাগমালার পাশাপাশি ঠাঁই পেয়ে গেছে। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার জলধারার মতো এরা এমন সুন্দরভাবে মিশে গেছে যে, তাদের বিদেশাগত বলে চিহ্নিত করা যায়

pathagar.net

না। *রাধাগোবিন্দসঙ্গীতসার* প্রভৃতি 'শাস্ত্রীয়সঙ্গীত' গ্রন্থে এই নবাগত রাগগুলিকেও 'শিবপ্রোক্ত' বলা হয়েছে। তাদের ধ্যানরূপও বর্ণিত হয়েছে। কোথাও কারও বাধা হয়নি। এমন বেদাগ মিল। যেমন—বাহাদুর টোরি, বিলাওল টোরি, কাফী টোরি অথবা হুসেনী কানাড়া!

সেই আদি উস্তাদ অমীর খুসরু ছিলেন দিল্লির সূফী সঙ্গীতসাধক নিজমউদ্দীন আউলিয়ার শিষ্য। তিনিই প্রাচীন হিন্দুযুগের বহু দীর্ঘ তালের পরিবর্তন করে আট বা ছয় মাত্রার কওয়ালী, দাদরা প্রভৃতি তালের প্রবর্তন করেন। ভারতীয় মার্গসঙ্গীত যে হিন্দু-মুসলমান সাধকদের সম্মিলিত প্রয়াসে গড়া, এ আমরা ক'জন সজ্ঞানে খেয়াল করি?

মিঞা তানসেন নাকি যৌবনকালে ছিলেন হিন্দুঘরের ছেলে। একজন মুসলমানীকে বিবাহ করে তিনি ধর্মে মুসলমান হয়ে যান। তাঁর যুগল গুরু—হিন্দু গুরু : হরিদাস গোস্বামী এবং মুসলমান উস্তাদ : ঘৌস মহম্মদ।

এখানে প্রসঙ্গত একটা কথা বলতে চাই। হিন্দু-মুসলমানের বিবাহবন্ধনের আয়োজন সম্ভবত প্রথম করেছিলেন আকবর বাদশা। তিনি স্বয়ং মানসিংহের ভগিনীকে বিবাহ করেন। এখন শুনছি, তানসেনও নাকি একটি মুসলমান রমণীকে বিবাহ করার ফলে ধর্মান্তরিত হয়ে যান। আপনারা এই অধম লেখকের গোস্তাকী মাফ করবেন—আমার কিন্তু মনে হয়েছে, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত আকবর বাদশার 'দীন-ইলাহী' ধর্ম এবং হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রণ প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার অন্যতম হেতু এই ব্যবস্থাটি। বিবাহ-অন্তে স্ত্রী স্বামীর উপাধি গ্রহণ করে। হিন্দু-মুসলমান অথবা মুসলমান-হিন্দু বিবাহে প্রাক্‌বিবাহ যুগে যে হতভাগা কাফের ছিল সেই শুধু মুসলমান হয়ে যায়। সে বরই হোক অথবা বধূ, দুলহন অথবা দুল্‌হা। আমি অনায়াসে এককুড়ি মুসলমান যুবকের নাম বলতে পারব— ঐতিহাসিক চরিত্র অথবা আমার পরিচয়ের বৃত্তে—যিনি হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করেছেন, ছেলে-মেয়ের হিন্দু নাম দিয়েছেন—কিন্তু স্ত্রী-পুত্র-কন্যা মুসলমান ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। আপনাদের কি অভিজ্ঞতা জানি না, আমি কিন্তু একজনও হিন্দু যুবকের নাম মনে করতে পারছি না, যিনি মুসলমান-কন্যাকে বিবাহ করেছেন এবং নিজের ধর্ম অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছেন। এ-অপরাধ মৌলবাদী হিন্দু পণ্ডিতদের, মুসলমানদের নয়।

সঙ্গীতের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক :

আবুল ফজল লিখিত *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থের গোটা তৃতীয় খণ্ড সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ে। মার্গ এবং দেশী উভয় রীতির গানের পরিচয়ই তাতে বিধৃত।

আইন-ই-আকবরীর তৃতীয় খণ্ডের পর ইব্রাহিম আদিল শাহ্‌-র *'নবরস'*, ফকির উল্লাহ্‌র *রাগদর্পণ*, মিঞা মির্জা খাঁর *তুহ্‌ফতুল* প্রভৃতি গ্রন্থে সেকালীন হিন্দুস্থানের 'হিন্দু-মুসলিম' যৌথ সঙ্গীতের নানা দিক আলোচিত হয়েছে।

সুবিখ্যাত ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের পূর্বপুরুষ ছিলেন হিন্দু। একই কেন্দ্রাতীগ বেগে—মুসলমানী নারীর পাণিগ্রহণের অপরাধে— তাঁর পূর্বপুরুষ হিন্দুত্ব হারিয়েছিলেন।

পাতিয়ালার ফতে আলি খাঁ সাহেবও একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। এই ধারারই

pathagar.net

প্রতিভা : সঙ্গীতকেশরী উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব। সেই বড়ে গোলাম আলীর গুরু ছিলেন তাঁর পিতৃব্য কালে খাঁ।

তবে এঁদের সঙ্গীত-সাধনার কথা বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক হলে এই অর্বাচীন লেখককে ত্যাগ করে তাঁর পিতৃব্য অমিয়নাথ সান্যালের *স্মৃতির অতলে* গ্রন্থটির সন্ধান করুন। অনবদ্য গ্রন্থ। তাই সেটি 'আউট অফ প্রিন্ট'। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাগারে পেয়ে যেতেও পারেন।

চিত্রশিল্প : অজন্তার দশম বিহারে দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দে আঁকা যে মূর্য্যালগুলি দেখতে পেয়েছিলেন গ্রিফিথ-সাহেব, যা আজও দেখতে পাওয়া যায় তাঁর অ্যালবামে, তাতে বোঝা যায়, হিন্দু ভারতের চিত্রশিল্প দু'হাজার বছর আগেই কী উন্নত পর্যায়ের ছিল।

কোনো কোনো মুসলমান পণ্ডিতের মতে, কুরআনে নাকি চিত্রাঙ্কনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা আছে। এজন্য ইসলাম-ইতিহাসের প্রথম কয়েক শতাব্দিতে চিত্রশিল্পের তেমন বিকাশ হয়নি। তৈমুর বংশের সন্তান বাবুর বাদশাহ্ (1526-1530) ভারত জয়ের পর একটি আত্মজীবনীমূলক সচিত্র গ্রন্থ রচনা করান। হিন্দুস্তানে দেখা যেসব পশু-পাখি গাছ-পালার ছবি তিনি তাঁর রোজনামচায় সঙ্কলন করেছেন, তা অতি নিষ্ঠাভরে আঁকা। তৈমুরের পুত্র হিরাটের শাসনকর্তা শাহ্রুখ নিজে ছিলেন কবি। তাঁর দরবারে চিত্রশিল্পীরাও সসম্মানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পনের শতকের শেষাশেষি সুলতান হুসেন মীর্জার দরবারে উপস্থিত ছিলেন জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বিহ্জাদ। বিহ্জাদের ছবির প্রশংসাই শুনেছি— কোনো কপি কখনো দেখিনি। কিন্তু মহম্মদ বিন্ তুঘলকের দরবারে খোরাসানের শিল্পী শাহ্পুরের আঁকা একটি অনবদ্য চিত্র আছে কলকাতার মিউজিয়ামে : 'গানের জলসা'! সুন্দর ছবিটি। নির্বাসনকালে বাবুর-তনয় হুমায়ুন কাবুল-শিল্পী দাস্তাঁ-ই-আমীর হাম্জাকে অনেকগুলি ছবি আঁকার নির্দেশ দেন।

প্রথম যুগের মুঘল ছবিতে রঙের বাহাদুরি লক্ষ্য করার মতো। প্রাচ্যের হিন্দু রীতিতে ঝকমকে গাঢ় রঙের পশ্চাদ্পট আর চিত্রের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁতভাবে আঁকা। যেন জার্মান-শিল্পী ডিউরর অথবা ক্রানাখের এচিং-কাজ। দুই শৈলী মিলে অনবদ্য!

আকবরের জমানায় এল মুঘল মিনিয়েচার, যার অত্যুৎকৃষ্ট কিছু উদাহরণ আজও দেখতে পাবেন লালকিল্লার সংগ্রহশালায়। 'মিনিয়েচার-চিত্র' ভারত-সংস্কৃতিতে ইসলামের দান। হাতির দাঁতের উপর অসাধারণ নৈপুণ্যে আঁকা 'পোট্রেচার'—আকবর, জাহাঙ্গীর, নূরজাহাঁ, মমতাজ প্রভৃতি।

সম্রাট আকবরের আমলে (1556-1605) চিত্রশিল্পের নানান রকম স্ফূরণ হয়। ছয়খানি বৃহৎ সচিত্র গ্রন্থ রচনার কথা প্রথমেই বলতে হয়। *তুতিনামা, হাম্জানামা, বাবরনামা, আকবরনামা, হরিবংশ* এবং *রমজানামা*। শেষ গ্রন্থটি মহাভারতের কাহিনী। এছাড়া ফতেপুর-সিক্রিতে বড় বড় ম্যুরাল চিত্রও আঁকান বাদশাহ্ আকবর। তাঁর নিযুক্ত চিত্রকরদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয়েই ছিল। পারস্যের শিল্পী আবদুল সামাদ, বিষেণদাস, আবুল হাসান, বিহ্জাদ, মীর সঈদ আলী—আবার এঁদেরই পাশাপাশি : গোবর্ধন, দশবন্ত, কমল কাশ্মীরী, কেশু দাস, সুদর্শন প্রভৃতি হিন্দু-চিত্রকর।

pathagar.net

বিভিন্ন প্রাদেশিক শিল্পীদের মধ্যে ক্রমে নানান মিশ্র রীতির সৃষ্টি হয়—দক্ষিণে বিজাপুর, গোলকুণ্ডায়, উত্তরে রাজপুতানায় কাংড়ায়, কাশ্মীরে, পূর্বাঞ্চলে হায়দ্রাবাদ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠে হিন্দু-মুসলমান শিল্পীদের মিশ্রিত 'কলম' বা রীতি।

এই মিশ্র রীতির ধারা চলে এসেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। আমরা আমাদের যৌবনকালে—তেতাল্লিশের মন্বন্তরে— দেখেছি পথপার্শ্বের মর্মান্তিক চিত্রাবলী এঁকে চলেছেন গোপাল ঘোষ, জয়নাল আবেদিন, খালেদ চৌধুরী। নাম শুনেও বোঝা যায় না কে হিন্দু, কে মুসলমান। জানেন কি, খালেদ চৌধুরী ব্রাহ্মণ? কনফার্মড ব্যাচিলার, অর্থাৎ মিঞা তানসেনের মতো প্রেমে পড়ে ধর্ম খোয়াননি। তবে বাস করেন মুসলমান অধ্যুষিত মহল্লায়, তাদেরই হেপাজতে। তাই শখ করে অমন একটা ছদ্মনাম গ্রহণ করা—খালেদ চৌধুরী!

স্থাপত্য : এবার অনুগ্রহ করে আমাকে মার্জনা করবেন। কীভাবে হিন্দু-স্থাপত্যের 'ট্র্যাবিয়েট' পদ্ধতি নবাগত ইসলাম-স্থাপত্যের 'আর্কুয়েট' পদ্ধতির সঙ্গে মেলবন্ধন করল— খিলান, স্কুইঞ্চ, গম্বুজ, মিনারিকা, গুলদস্তা কীভাবে গুটি গুটি ভারত-স্থাপত্যে স্থান পেল তা এখানে বলব না। কারণ সেবিষয়ে ইতিপূর্বেই একটি ঢাউস বই লেখা গেছে—*লা-জবাব দেহলী-অপরূপা আগ্রা*। শুধু তার উৎসর্গপত্রটা এখানে উদ্ধৃত করে গেলাম :

'ট্র্যাবিয়েট-রাজকুঙারীর মেহ্দীরঞ্জিত হাতে আর্কুয়েট-শাহজাদার সমশেরবন্দ্ হাত মেলাতে চেয়েছিলেন জালালউদ্দীন আকবর ; আর তাঁর আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন তাজমহল-নির্মাতা উস্তাদ ঈশা-আফান্দি'—আমার এই বিতর্কিত-থিসিস যদি মেনে না নিতে পারেন, তবু নিশ্চয় স্বীকার করবেন—আমাদেরই কালে সে কাজে ব্রতী হয়েছিলেন দ্বিতীয় আকবর : কাজী নজরুল ইসলাম। এবং তাঁর উত্তরসূরী দ্বিতীয় আফান্দি : সৈয়দ মুজতবা আলি।

সেই দুইজনের যুক্ত স্মৃতিতে এ-গ্রন্থ অর্ঘ্য হিসাবে উৎসর্গ করে ধন্য হলাম।"

সাহিত্য : ইসলাম-আগমনের ঊষাকালে অথবা সুলতানী-জমানার প্রভাতকালে ভারতে সাহিত্য বলতে বোঝাতো মহাকাব্য, কাব্য ও গীতিকবিতা। গদ্য রচনা তখনও আসর জমাতে পারেনি। কিন্তু কাব্যের উপজীব্য হচ্ছে মানুষের আন্তর অনুভূতি— দুঃখ ও আনন্দের উপাদান : প্রেম-বিরহ-রাগ-অনুরাগ, অভিমান। নিরাকার পরমব্রহ্ম, গড বা আল্লাহ্কে ঘিরে সে কুসুম প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পায় না। একজন ব্রাহ্ম-আচার্য তাঁর ভাষণে বলেছিলেন : 'হে পরমপিতা! তোমার শ্রীমুখনিঃসৃত আশীর্বাদে অভিসিঞ্চিত হয়ে তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম জানাই।' শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জনান্তিকে ভক্তদের নাকি বলেছিলেন, 'পরমপিতার শ্রীমুখটাও বরদাস্ত করলি, ঠ্যাঙ জোড়াতেও আপত্তি নেই দেখছি, তাহলে নিরাকার ব্রহ্ম-বাবামশায়ের বাদবাকি দেহটা কী দোষ করল, বাবা?'

বহির্ভারতে ইসলামী-সাহিত্যে—মূলত ফার্সিতে—নানান রসের কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কারবালা-প্রান্তরের *'বিষাদসিন্ধু'*, লায়লা-মজনুর মহব্বৎ-কিস্সা এবং ওমর খৈয়ামের অনবদ্য *রুবাইয়ৎ*। ওমর খৈয়াম চাণক্যের 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' মতবাদের

সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'কে চমৎকারভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু ভারতে এসে মুসলমান কবিরা ফার্সি বা উর্দুতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো কাব্যগ্রন্থ রচনা করতে পারেননি।

মুসলমান কবিকুলের কাব্যসুরধুনী প্রবাহিত হয়েছিল দ্বিধারায়। সুফী ও মরমিয়া সাধকদের সাঁইসন্ধানী প্রেম-জাহ্নবীতে অথবা হিন্দু কাব্য-পুরাণ-মহাকাব্য অনুসারী যমুনাস্রোতে।

দ্বিতীয় দলের কাব্যের ভাষা তখন আধা-সংস্কৃত, আধা-প্রাকৃত, কিছুটা ভাঙা প্রাদেশিক লব্জ্। দরাফ খাঁর গঙ্গাস্তোত্র অথবা আবদুর রহিমের রচনা পুরোপুরি সংস্কৃতে। আবদুরের অপভ্রংশে রচিত *সন্দেশ-রাসক* কাব্যগ্রন্থটি দ্বাদশ শতাব্দির। তার মুখবন্ধের একটু নমুনা শোনাই :

"রয়ণায়রধরগিরি তরুবরাইঁ
গয়ণংগণংমি রিকখাঁই।
জেনজ্জ সকল সিরিয়ং সো
বুহয়ন বো সিবং দেউ।।

অর্থাৎ "হে বুধগণ, সেই সৃষ্টিকর্তা তোমাদের শিব (মঙ্গল, কল্যাণ) বিধান করুন, যাঁহার দ্বারা রত্নাকর-পৃথিবী-গিরি-তরুবর এবং গগনঅঙ্গনে নক্ষত্রাদি সকল সৃষ্ট।"

পরে কবি লিখছেন, 'চতুর্মুখ ব্রহ্মা চতুর্বেদ উচ্চারণ করেছেন বলে কি অন্যান্য কবিরা কবিতা রচনা করবেন না? সুরেন্দ্রভবনে নন্দনকাননে পারিজাত প্রস্ফুটিত হয় বলে কি বনফুল ফুটবে না?'

মীর আবদুর রহমান চতুর্মুখ ব্রহ্মার কথা, পারিজাত-নন্দনের বর্ণনা করতে কুণ্ঠিত হননি।

মালিক মহম্মদ জায়সীর *পদ্মাবতী* অথবা আলাওলের পৃথক *পদ্মাবতী* প্রভৃতি গ্রন্থে দেখি কবির দল শ্রদ্ধার সঙ্গে পুরাণ ও হিন্দুশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছেন। তা থেকে অলঙ্কার চয়ন করেছেন।

হুসেন শাহ্‌র (1493-1525) রাজসভায় মুসলমান পুরন্দর খাঁ এবং হিন্দু রূপ-সনাতন সমান আদর লাভ করেছিলেন। হুসেন শাহ্‌র উৎসাহেই শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অনুবাদ করেন। সপ্তদশ শতাব্দিতে আরাকান রাজসভায় আলাওল ছিলেন মুসলমান উজিরের বন্ধু। তিনিই মালিক মহম্মদ জায়সীর *পদ্মাবতী* কাব্যগ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেন।

বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দিতে অনেক প্রতিষ্ঠাবান মুসলমান সাধক আছেন। যেমন—আফজল, আমান, কবীর, ফয়জুল্লা, এবাদুল্লা, আলাউদ্দিন, মহম্মদ হামীর প্রভৃতি।

সংস্কৃত বা প্রাকৃত বৈষ্ণব সাহিত্যে যখন ব্রজবুলি অনুপ্রবেশ করল তখন হিন্দু কবি—জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পাশাপাশি অনেক মুসলমান পদকর্তার নামও পাওয়া যায় : নাসীর মামুদ, ভীখন, হবীর, কবীর মহম্মদ, শাহ্ আকবর প্রভৃতি।

pathagar.net

সম্রাট আকবরের সভাসদ, আবদুর রহিম-খান-ই-খানান ছিলেন এক বিরল প্রতিভা। সংস্কৃত, হিন্দী, ফারসী, আরবী, তুরকী এই পাঁচ-পাঁচটি ভাষাতেই তিনি ছিলেন আলিম—সমান পণ্ডিত। তাঁর কাব্যে বারে বারে হিন্দুপুরাণের ছায়াপাত ঘটেছে :

"যে গরীব কো আদরেঁ তে রহীম বড়লোগ।
কহা সুদামা বাপুরো কৃষ্ণ মিতাই জোগ।।'

'হে রহীম! যে গরীবকে আদর করে বুকে টেনে নেয় সেই তো বড়লোক! কোথায় বেচারা দরিদ্র সুদামা, সে কি কৃষ্ণের সখা হবার যোগ্য? তবু সেই সুদামাকে বুকে টেনে নিতে পারেন যে মধুরারাজ, তিনিই তো কৃষ্ণ!'

সপ্তদশ শতাব্দির মাঝামাঝি দেখি এক মহিলা-কবিকে— তাজ বেগম—মীরাবাঈ-এর যেন মুসলমানী সংস্করণ!

"সব জীবনকা জীব জগৎ আধার হৈ।
জো ন ভজে নন্দলালা ছটী মে ছার হৈ।।

'এই প্রপঞ্চময় জীবজগতের আধার নন্দলালাকে যে ভজনা করতে পারল না, তার কপালে ছাই!'

সিন্ধুপ্রদেশের হিন্দু আর সুফী ভক্তদের দোহাঁ এবং গান এমন মিলেমিশে আছে যে তারা একই ধারার বলে মনে হয়। আমরা কাফী রাগে গান গেয়ে থাকি। মহম্মদ লতিফের একটি বিখ্যাত কাফী গানের দুটি চরণ শুনিয়ে এ পরিচ্ছেদের ছেদ টানা যাক :

"ন কা কুন ফৈকুন হঈ/ন কা হুংগন হুঁ।
সজণ তহঁ সাইথ মেঁ ভেটে ডিঠোসি।।"

গান তো নয়, যেন নেয়াপাতি ডাব! কিন্তু ভাষাজ্ঞানের ধারালো কাটারি ব্যতীত এ সঙ্গীত-রসসুধার নাগাল পাওয়া অসম্ভব :

'সৃষ্টির যখন সূচনা হয়নি, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ যখন কল্পনাতেও স্থান পায়নি, জাগেনি শব্দ, শুরু হয়নি শ্বাসগ্রহণ প্রক্রিয়া—হে প্রিয়তম! তোমার মুখখানি যে সেদিন থেকেই আমার হৃদয়ে শাশ্বত আসনে আঁকা হয়ে আছে।'

হিন্দু-মুসলমানের মিলিত যোগসাধনা :

ভারতে এসে বহুকাল পর্যন্ত অনেক মুসলমান সাধক হিন্দু-সাধনমার্গের প্রতি উৎসাহ দেখিয়েছেন, তার চর্চা করেছেন। বল্লভাচার্যের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ইস্‌মাইলি' কিছু গুরুর নাম পাওয়া যায়। এইসব মুসলমান সাধকদের ভিতর রামনবমী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পালিত হত। আগা খাঁ এই দলের গুরু। এই মুসলমান সাধকদের অনেকের নাম— মাধবজী, প্রেমজী, ফুলজী প্রভৃতি।

গুজরাত প্রদেশে খোজা কাকাপন্থীদের মধ্যে এমন মিশ্র নামও পাওয়া যায় : ইব্রাহিম কাহ্নজি। অর্থাৎ ছেলে ইব্রাহিম, বাবা কৃষ্ণজী!

pathagar.net

মাহমুদ গজনীর ক্রমাগত হিন্দুমন্দির ধ্বংস করাটাই ইতিহাস মনে রেখেছে, কিন্তু বহু মুসলমান বাদশা, নবাব, সুলতানেরা হিন্দু মঠ/মন্দির তৈরিও করে দিয়েছেন। ইতিহাসে তার পাত্তা নেই!

ধর্মসাধনায় উদারতার প্রসঙ্গে সবার আগে মনে আসে 'সন্ত কবীর'-এর নাম :

তিনিই প্রথম হিন্দু আর ইসলামের মিলিত 'জম্‌জম্‌গঙ্গার' ভগীরথ। তার ফলে হিন্দু ও মুসলিম দুই দলই বাদশার কাছে তাঁর নামে নালিশ জানাল। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কবীর দেখেন, অভিযোক্তারা মোল্লা এবং পণ্ডিত। কবীর বললেন, 'আরে, আরে এটাই তো চেয়েছিলাম আমি— তোমাদের দুই দলকে একই মঞ্চে নিয়ে আসার স্বপ্ন। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম তোমরা প্রেমে-ভক্তিতে অমন পাশাপাশি উঠে দাঁড়াও। তোমরা সেই একত্রেই মিললে— কিন্তু হায় ঈশ্বর! হায় খোদা! তোমরা মিললে বিদ্বেষে!'

নিরক্ষর কবীর ছিলেন স্বভাবকবি। তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করতেন। ভক্তরা তা লিখে নিতেন। ভক্তরা জিজ্ঞেস করতেন এমনসব গভীর তত্ত্ব তুমি পাও কেমন করে?

কবীর জবাবে বলতেন, 'উচে পানী না টিকে, নীচে হী ঠক্‌রায়।'

ঈশ্বরভক্তি যে জলের মতন সরল ও তরল। সে তো সবসময় নিচের দিকেই চলতে চায়— 'সবার নিচে, সবার পিছে, সবহারাদের মাঝে।'

যাদের বিশেষ অনুগ্রহ করতেন তেমন মুসলমান মোল্লা আর হিন্দু পাণ্ডার দল বারে বারে গোপনে এসে কবীরকে নিজ-নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করার পরামর্শ দেয়। কবীর সখেদে বললেন— 'ব্রেহা দীন্‌হী খেতকো, বেহ্রাহী খেত খায়।' বাইরের ছাগল-গরুর উৎপাতের ভয়ে ক্ষেতে বেড়া দিলাম। কী আপদ! এখন দেখি, বেড়াগুলোই ছাগল-গরুর মতো ক্ষেত খেয়ে উজাড় করে দিচ্ছে!'

বললেন— 'আরে ইন দহূ রাহ না পাঈ।'

হিন্দু কী হিন্দ্‌বাঈ দেখি তুর্কন কী তুর্কাঈ।

হিঁদুর হিঁদুয়ানি আর তুর্কীর তুর্কিনাচন দুটোই তো দেখলাম। কিন্তু কেউই তো তাঁর সন্ধান দিতে পারল না।

তাহলে কোন্‌টা পথ?

কবীর বললেন, এ দুই সম্প্রদায়কে মিলিত করে মধ্যপথই হচ্ছে ঠিক রাস্তা!

'দাস কবীর কাঢ়ী ভলী দৌউ রাহ বিচ্ রাহ।'

দাস কবীর বলে, ভালো পথ হচ্ছে এ দুয়ের মধ্যপথ।

সন্তকবীরের সোজাসুজি প্রশ্ন— 'জো খোদায় মসজিদ বসত্ হৈ ঔর মুলুক কেহিকেরা?'

—খোদা যদি মসজিদের ভিতরে থাকেন, তাহলে বাইরের এই গোটা দুনিয়াটার মালিক কে?

আবার, 'তীরথ মূরত রাম নিবাসী, বাহর করে কো হেরা?'

—তীর্থের মূর্তিতেই যদি শ্রীরামচন্দ্রের অধিষ্ঠান তাহলে বাকি দুনিয়ার মালিকানা কার?

pathagar.net

বলছেন, বোকার মতো 'হিন্দু ধাবে দেহ্‌রা' (হিন্দুরা ছুটছে মন্দিরে) মুসলমান মসীতি (আর মুসলমানরা মসজিদে) অথচ হিন্দুর রাম আর মুসলমানের খোদা কী বলছেন শুনতে পায় না ঐ মূর্খের দল। তিনি বলছেন— 'মো কো কঁহা ঢুঁড়ে বন্দে/মৈ তো তেরে পাস মে।' (আমাকে কোথায় খুঁজে মরছিস রে পাগলা? আমি তো তোর পাশটিতেই আছি।)

'না মৈঁ দেবল না মৈ মসজিদ/না কাবে না কৈলাস মে।' (আমি দেবমন্দিরেও নেই, মসজিদেও নেই। না মক্কার কাবায় না কৈলাসতীর্থের চূড়ায়— আমি তো ছায়ার মতো তোর পাশটিতেই আছি।)

পরবর্তী সাধক দাদূ। তিনি বললেন, সাধক সম্প্রদায়ভেদকে অস্বীকার করার হিম্মৎ যিনি রাখেন তিনিই প্রকৃত সাধক। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে ভয়শূন্য হও (মতি মোটী উস্ সাধকী দ্বৈপথ/রহিত সমান নিভে নির্পথ হোই)।

দাদূ নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন—

'ন হম হিন্দু হোহিঁগে ন হম মুসলমান।/ষট্‌দর্শন মেঁ হম নহী। রহ্‌তে রহিমান।' (আমি হিন্দুও হব না, মুসলমানও নয়;ষড় দর্শনের তত্ত্ব আমার জন্যে নয়। আমি চাই শুধু সেই দয়াময়কে।)

'ন তহাঁ হিন্দু দেহুরা ন তহাঁ তরুক মসীতি।
দাদূ আপৈ আবা হৈ নহী তঁহা রহ রীতি।'

(ভগবানের রাজ্যে হিন্দুর দেবালয় বাহুল্য, আল্লাহ্‌তালার দুনিয়ায় মসজিদও বেফাজুল। দাদূ বলেন, যেখানে তিনি স্বমহিমায় বিরাজিত সেখানে সম্প্রদায় বা সাম্প্রদায়িকতার কোনো ঠাঁই নেই।)

শুধু তত্ত্বকথা নয়, এই তত্ত্ব বোঝাতে দাদূ মাঝে মাঝে কী সুন্দর কাব্য-অলঙ্কারের আশ্রয় নিয়েছেন দেখুন—

'দূন্যুঁ হাথী হৈব রহে, মিলি রস পিয়ান জাই' (দুহাত এক না করলে অঞ্জলিবদ্ধ হবি কেমন করে রে? আর অঞ্জলিবদ্ধ না হলে তো তাঁর অমৃতরস গ্রহণ করতে পারবি না। হিন্দু আর মুসলমান যে তাঁর দুই হাত!)

কবীরের পর দাদূ। দাদূর শিষ্য রঞ্জবজিও সুফী কবি। ষোড়শ শতাব্দির মাঝামাঝি থেকে সপ্তদশ শতাব্দির প্রথম পাদ পর্যন্ত তাঁর জীবনকাল। তিনি বললেন, 'সব সাঁচ মিলে সো সাঁচ হৈ/না মিলে সো ঝূঠ।' অর্থাৎ 'সম্প্রদায়গত পথ সত্য পথ হতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত ঈশ্বরোপাসনাই হচ্ছে সত্য পথ। আর সবই ঝুটা।'

সিন্ধুদেশের সুফীভক্ত শাহ্ লতিফ, কুতুবউদ্দীন, রোহল, বেদিল-মিএগ্র অনেক গান রচনা করে গেছেন। ভক্তিমূলক গান। ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌র প্রেমে। অবিভক্ত বঙ্গদেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে এই মিলিত ভাবনার স্রোত— একদিকে আউল-বাউল-মুরশিদা ফকিরী, অন্যদিকে বাউলিয়া-ভাটিয়ালি, কীর্তন, লালনী ঢঙের গানে কোথাও জম্‌জমের পানী মিশেছে গঙ্গাজলে কোথাও সরস্বতীর বীণার তারে শোনা গেছে আজানধ্বনীর ঝঙ্কার।

pathagar.net

আবদুর রহীম, আজিম শাহ্ প্রভতি বিদগ্ধেরা বৈষ্ণব সাহিত্যের বড় রসজ্ঞ ছিলেন। আকবরের সময় নাগোরী মুবারকের পুত্র আবুল ফজল ও ফৈজী অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেন। সেই যুগে মহাভারত হইতে যোগবাশিষ্ঠ পর্যন্ত অনেক গ্রন্থই ভাষান্তরিত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে দারাশিকো একটি মহনীয় নাম। ইঁহার দরবারে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় ধর্মের যেরূপ গভীর আলোচনা হইয়াছে সেরূপ আর কখনো হয় নাই। দারাশিকোর উপনিষদের অনুবাদ *সির-ই-আকবর* ভাষান্তরিত হইয়া য়ুরোপে উপনিষদের প্রথম পরিচয় দিয়াছে।

দিল্লির সুফী ধারাতে মুসলমান বংশীয়া মহিলা (১৬০০) বাওরী-সাহেব প্রথম সাধনার গুরু হন। তাঁহার শিষ্য বীরু ছিলেন হিন্দু। তাঁহার শিষ্য য়ারী (১৬৭০) আবার মুসলমান। তিনি শূন্যতত্ত্ব আল্লাহ্ ও রামনাম্ একই শ্রদ্ধার সহিত লিখিয়াছেন। বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ বংশীয় মহারাষ্ট্রীয় সাধক তুলসী-সাহেবের জন্ম ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে— পলাশি-যুদ্ধের তিন বছর পরে। তিনি লিখে গেছেন— 'কো তুমে দেগা ফহম/শহরগ পানে কে লিয়ে,/যহ সদা তুলসীকী হৈ/আমিল অসল'পর ধ্যান দে।/কূন কূরাঁ মে হৈ লিখা/অল্লাহ্ আকবর কে দিয়ে।।'

—ক্ষিতিমোহন সেন

অর্থাৎ 'যিনি তোকে সত্যপথের সন্ধান দেবেন সেই সদ্‌গুরুর সন্ধান কর। তুলসীর দোহাই— হে সাধক! নিরন্তর শুধু সাধনার দিকে ধ্যান দে! সৃষ্টি রচনায় পবিত্র কুরাণেই মহান আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলনের পন্থা বর্ণিত আছে।'

দুঃখ এটাই যে, আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি! যেসব বর্বর শাবল-কোদাল ঘাড়ে করে প্রশাসনিক সহায়তায় অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভাঙতে দৌড়েছিল অথবা তার প্রতিশোধ নিতে মুম্বাই শেয়ার বাজারে অসহায় হিন্দু-মুসলমানদের হত্যা করেছিল তারা এসব পড়েনি, জানে না, মানে না!

ভারতবর্ষের সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। একদিকে বাল থ্যাকারে, গোল-ওয়ালকর, সংঘ পরিবারের কট্টর হিন্দু জননেতা— যাঁরা বলেন, পাকিস্তানে যেমন কাফেররা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, সেইভাবে এই ভারতেও দশ কোটি মুসলমানকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকতে হবে। তাঁরা ভুলে যান, পাকিস্তান শরিয়তী শাসনে মুসলিম রাষ্ট্র, ভারত 'সেকুলার' রাষ্ট্র। অপরপক্ষে, একশ্রেণীর মোল্লার প্ররোচনায় ভারতীয় মুসলমানদের একাংশ মনে মনে পাকিস্তানের আগ্রাসী নীতিকে সমর্থন করছে। গোপনে গোয়েন্দাগিরি করছে। পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ জিতলে তারা সানন্দে পটকা ফাটায়। পাকিস্তানী হানাদার ও জঙ্গী দলকে গোপনে আশ্রয় দেয়, ভারতবিরোধী নাশকতায় সাহায্য করে। শুধু আর্থিক প্রলোভনে পড়ে নয়, তারা এই ভারত-বিরোধিতাকে ইসলামের ধর্মীয় নির্দেশ বলে বিশ্বাস করে বলেই।

অথচ ওদিকে কারগিল যুদ্ধে অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান মাতৃভূমি রক্ষার জন্য— কাশ্মীরের হিন্দু-মুসলমানের গ্রামের নিরাপত্তার জন্যে— হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করে চলেছে।

pathagar.net

রাজনীতি-ব্যবসায়ী কিছু হিন্দু এবং মুসলমান নেতা হিন্দু-মুসলমানের এই মিলিত আত্মদানে বিচলিত হন না। তাঁরা শুধুমাত্র তাঁদের পার্টি কী করে ক্ষমতালাভ করবে এই চিন্তাতেই বিভোর। গোটা ভারতের মঙ্গলবিধান তাঁদের চিন্তার বাইরে। প্রশাসনিক সমর্থন না থাকলে একদল বর্বর ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ করতে পারত না। নারীমুক্তির বিরুদ্ধবাদী ধর্মান্ধ না হলে, অন্ধ তামসিক সংস্কারে আবদ্ধ না হলে, দশ কোটি মুসলমানের মধ্যে অন্তত একজনও কৌরবসভায় বিকর্ণের মতো উঠে দাঁড়িয়ে বলতে পারতেন— প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সংখ্যাগরিষ্ঠতায় স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে ওই বর্বরোচিত কাজটা অন্যায় করেছেন— সুপ্রিম কোর্টে জয়ী শাহবানুর মাথায় পয়জার-মারা!

গণিত-বিজ্ঞান-জ্যোতিষ-চিকিৎসাশাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনা :

বিশ্বাস করুন, এইসব প্রত্যেকটি বিষয়ে গত সহস্রাব্দে ভারত যা উন্নতি করেছে তার মূলে আছে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনা। বিস্তারিত বর্ণনায় বিরত থাকতে হচ্ছে তিনটি হেতুতে। প্রথমত, 'কৈফিয়তের' নিদারুণ কলেবরবৃদ্ধি, দ্বিতীয়ত পাঠকের নিদারুণতর ক্লান্তি, তৃতীয়ত, এই অধম পল্লবগ্রাহী লেখকের জ্ঞানভাণ্ডারের অপ্রতুলতা। এই বৃদ্ধ বয়সে আবার তাহলে জাতীয় গ্রন্থাগারে দৌড়তে হবে তাকে।

তবে একটা কথা অনুক্ত রাখা অন্যায় হবে— ভারতবিদ্ অসামান্য পণ্ডিত অধ্যাপক এ. এল. ব্যাশমের মতে— বিশ্বসংস্কৃতিতে এশিয়াবাসীদের মধ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হচ্ছেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি ছাড়া আছেন একজন অজ্ঞাতপরিচয় হিন্দু গণিতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, 'শূন্য'। দশমিক পদ্ধতি। অর্থাৎ স্থানমাহাত্ম্যে সংখ্যার পদবৃদ্ধির ব্যবস্থাপনা। সহজ ভাষায়— 'একক, দশক, শতক' পদ্ধতি।

সম্ভবত সেই হিন্দু গণিতজ্ঞ ছিলেন তৃতীয়-চতুর্থ শতকের পণ্ডিত। তাঁর গণিতের আবিষ্কারটি প্রথম প্রতিফলিত হতে দেখছি সপ্তম শতাব্দির একটি শিলালেখে। শকাব্দটা উল্লেখ করা হয়েছে— গোটা পৃথিবীতে সেই প্রথম— 'একক-দশক-শতক' স্থানমাহাত্ম্য স্বীকার করে।

এই আবিষ্কারটি না হলে রোমক-সংখ্যা পদ্ধতিতে বিশ্ববিজ্ঞান এভাবে আজ ত্রিভুবনজয়ী হয়ে উঠতে পারত না। কিন্তু 'Full many a gem of puresh ray serene'—এর রূপ নিয়ে ওই হিন্দুপণ্ডিতের আবিষ্কারটি হয়তো চিরকাল অজানাই থেকে যেত। থাকেনি, কিছু আরবীয় মুসলমান বণিকের কল্যাণে। তারা এই পদ্ধতি শিখে নেয়, খাইবার-পাস অতিক্রম করে ইয়োরোপ-খণ্ডে নিয়ে যায়। সেই মুসলমান বণিকদের মাধ্যমে হিন্দু পণ্ডিতের আবিষ্কার সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পায়।

ফুল আপন সৃষ্টির তাগিদে পুষ্পরেণু সৃজন করে বটে কিন্তু তার বংশরক্ষা হতে পারে না, যদি না প্রজাপতির পাখায়-পাখায় পুষ্পরেণু দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়!

ছাগল-গরু 'ব্রেহা' ভেঙে শস্যক্ষেত সাবাড় করতে আসছে— বারে বারে। উপায় নেই, কিছুটা ওই রাক্ষসদের পেটে যাবেই। তবু উদ্ভিদজগৎ শাশ্বত হয়ে টিকে থাকবে পুষ্প ও প্রজাপতির যৌথ প্রয়াসে।

pathagar.net

সাচ্চাই ইসলাম :

বছর কয়েক আগে *'রিডার্স ডাইজেস্ট'* পত্রিকায় (জানুয়ারি, 1996) একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন সৈয়দ আল্-আশমানী— *দ্য ট্রু ইসলাম*। লেখক মিশরের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন, রচনার সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনাবাসী মিশরী মুসলমান।

তিনি লিখছেন,

"গত এপ্রিল মাসে কিছু উগ্রপন্থী মুসলমান ধর্মান্ধের অপকীর্তি— ওক্লাহামা-সিটিতে বোমা বিস্ফোরণে নিরীহ খ্রিস্টানদের ধ্বংসলীলা আমি কাইরোতে বসে টেলিভিশনে দেখে মর্মাহত হয়েছিলাম। মনে হল, সারা বিশ্ব বোধহয় মনে করছে— ইসলাম হচ্ছে একদল হত্যা-বিলাসে উন্মত্ত ধর্মান্ধ, যারা অমুসলমান দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

"নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিস্ফোরণ ঘটানোর অপরাধে কিছু ইসলামিক জঙ্গীকে কারাদণ্ডিত করা হয়েছে ; ফিলিপিনে আরও কিছু উগ্রপন্থীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে— দ্বিতীয় পোপ জন পল-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে। লন্ডন, প্যারিস ও বার্লিনে ওইসব উগ্রপন্থীরা ইরানী উদ্বাস্তুদের অনেককে হত্যা করেছে— তাদের একমাত্র অপরাধ— ইরানের মৌলবাদী সরকারকে উদ্বাস্তুরা সমর্থন করেনি, দেশ-ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।...

"আমি মানি না— এই 'অসহিষ্ণু ইসলাম' আমার পিতার বা পিতামহের ধর্ম ছিল কোনোদিন। ইসলামের এই ব্যাখ্যাকে সারা বিশ্বের প্রায় দেড় বিলিয়ন ধর্মাত্মা মুসলমান মানে না— তারা ইসলাম অর্থে বোঝে : প্রার্থনা করা, উপবাস করা, সংযমী জীবনযাপন করা, দরিদ্র মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করা। তারা মক্কার অভিমুখে 'হজ' করতে ছোটে— বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে।

"এই উগ্রবাদীরা ফরমান জারি করেছে যে, কোনো মুসলমান মহিলাকে বাড়ির বাইরে যেতে হলে তাকে আপাদমস্তক 'হিজাব'-এ (বোরখায়) আবৃত করতে হবে। এ নির্দেশ কিন্তু কুর-আনে কোথাও নেই। নবীর আমলে মধ্যযুগে পথেঘাটে আরবী মেয়েরা উন্মুক্তবক্ষারূপে বিচরণ করত। কুর-আন বাস্তবে নির্দেশ জারি করেছিল, বাড়ির বাহিরে আসার আগে স্ত্রীলোকেরা বুকের উপর কাপড় দেবে। অথচ আমি জানি, মাথায় ঘোমটা না দিয়ে স্কুলে আসার অপরাধে আলজিরিয়ায় কয়েকটি স্কুলের কিশোরী ছাত্রীকে মৌলবাদীরা রাস্তার মধ্যে গুলি করে হত্যা করেছিল!

"আজকের ইসলামি মৌলবাদীদের চোখে দুনিয়ার দুটো ভাগ। একভাগে আছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের শরিয়তী শাসন, অপরভাগে আছে— অমৌলবাদীরা। মুসলমান রাষ্ট্রেও যারা মৌলবাদীদের জঙ্গিপনায় আস্থাহীন— যেমন মিশর, আলজেরিয়া, টিউনিশিয়া বা তুর্কিস্থান— মৌলবাদীদের মতে, তারাও বিপক্ষের লোক।"

সৈয়দ আল-আশমানী পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর নির্দেশ বিদেশী মুসলমানদের জন্য। তা সত্ত্বেও এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটা তুলে দিলাম জানাতে যে, মৌলবাদী ইসলাম রাষ্ট্রগুলির

pathagar.net

বাহিরে— আফগানিস্থান, ইরান, পাকিস্তানের শাসকদলের এক্তিয়ারের বাহিরে— বাকি দুনিয়ার চিন্তাশীল মুসলমানেরা কী ভাবছেন তা দেখাবার জন্য।

কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তানের হামলার এ-বছর সুবর্ণজয়ন্তী হচ্ছে। যুদ্ধাস্ত্র ব্যতীত পাকিস্তানে আর কোনো শিল্পের উন্নতি হয় না। যে দেশের শাসক জনসাধারণকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাক্‌স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের অধিকার দিতে পারে না, তাদের পক্ষে এই ভারতে লুটপাট করাই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থাকবে না কেন? শুধু ভারত-বিদ্বেষ ও ক্রিকেট-উন্মাদনার নেশায় সে দেশের শাসকদল নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখে।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান পাঁচ দশক আগেই হয়ে যেত। হতে পারেনি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলালের আজব সিদ্ধান্তে। এ সংগ্রাম চলতেই থাকবে। উপায় নেই। কিন্তু ওইসঙ্গে ভারত সরকারকে সজাগ থাকতে হবে— ভারতের ভিতর প্রতিবেশীর ওই দ্বিজাতিতত্ত্বটা না প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। মৌলবাদী হিন্দু সংগঠনগুলিকে সংযত করতে হবে। একই সঙ্গে মৌলবাদী মুসলমান মোল্লাদেরও দৃঢ় হাতে শাসন করতে হবে। কাণ্ডারীকে আমাদের শোনাতে হবে সেই অসাম্প্রদায়িক সাবধানবাণী—

'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারি বল : ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।'

pathagar.net

পনেরই আগস্ট, 1947।

অবশেষে ত্রিখণ্ডিত হল ভারত উপদ্বীপ। মাঝখানে পণ্ডিত নেহরুর দিল্লি কা লাড্ডু, ওপাশে জিন্না-সাহেবের পশ্চিম পাকিস্তান আর পুবে তার তাঁবেদার পূর্ব পাকিস্তান। সফল হল ইংরেজের নীতি— সামান্য অদল-বদল করে। ছিল divide & rule, হল divide & exploit! সার্থক হল জিন্না-সুরাবর্দী-লিয়াকতের ব্রিটিশ-ছত্রচ্ছায়ায় রণহুঙ্কার : 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান!'

সবচেয়ে বড় কথা : সার্থক হল পণ্ডিত জবাহরলাল প্রমুখ কতিপয় দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী নেতার খোয়াব : নিজ নিজ জীবদ্দশায় রাজা-উজীর বনা।

চণ্ডী লাহিড়ীর ভাষায় : It was the darkest day. To some it was the brightest. It brought joy to a handful and tears to the faithful. The decision to partition India was taken by some people in the backyard and imposed on unsuspecting millions without their consent.

"সেটা ছিল নীরন্ধ্র 'কালা দিবস'। কারো কারো কাছে অবশ্য ছপ্পড়-ফোঁড় ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল। মুষ্টিমেয়র মুষ্টি ভরে গেল সোনায়, কর্তব্যনিষ্ঠরা ভেসে গেল অশ্রু-বন্যায়। ভারত-বিভাগের সিদ্ধান্তটা নিলেন কতিপয় পালের গোদা, গোপনে ;আর সেটা চাপিয়ে দেওয়া হল অপ্রত্যাশিতভাবে কোটি কোটি মানুষের স্কন্ধে, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে।"

ভারত-বিভাগের জন্য দায়ী অপরাধীদের তালিকাটি অতি দীর্ঘ। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মাউন্টব্যাটেন-প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে বসেছিল 2.6.1947-এ। কার্যকরী সমিতির সভ্যদের পাঁচজনকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এ-সভায়। তাঁরা হলেন— ডঃ খান সাহেব, ডঃ জয়রামদাস দৌলতরাম, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রাম মনোহর লোহিয়া এবং আরও একজন। যাঁর পিতৃদত্ত নাম : মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। শেষোক্ত ভদ্রলোক সভায় প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করেছিলেন নেহরু এবং প্যাটেলকে— মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবটি তাঁকে আগেভাগে জানানো হয়নি বলে। তিনি এ-প্রস্তাবের স্পষ্ট বিরোধিতা করেছিলেন। করেছিলেন লোহিয়া এবং জে. পি.-ও।

ভারত-বিভাগের প্রথম প্রস্তাবটি পেশ করা হয়েছিল আরও পাঁচ বছর আগে। সেটির নাম : রাজাজী ফর্মুলা। শরৎচন্দ্র বসু এবিষয়ে রাজাজী সম্পর্কে লিখেছিলেন : "He was the person who wanted to forsake Bengal and the Punjab on the ground that these two provinces were obstacles in the way of the rest of India

pathagar.net

attaining Swaraj. He opposed 'Quit India' resolution, carried on propaganda against it inside and outside the country."

"এই ভদ্রলোকই বলেছিলেন বাঙলা ও পাঞ্জাবকে ত্যাগ করে বাকি ভারতের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করা উচিত, কারণ ওই দুটি প্রদেশই ভারতের স্বাধীনতালাভের পথে মূর্তিমান অন্তরায়। তিনি 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিরোধিতা করে দেশের ভিতরে এবং বাহিরে আন্দোলন চালিয়েছিলেন।"

নেহরুজি তাঁর এই অবদানের কথা বিস্মৃত হননি। তাঁর এমপ্লয়ার অবসর নিয়ে বিলেতে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেহরু তাঁর কৃতজ্ঞতার বাস্তব প্রমাণ রেখেছিলেন—বড়সাহেবের 'ভেকেন্ট চেয়ারে' রাজাজীকে সাড়ম্বরে অধিষ্ঠিত করে। সেসময় চণ্ডী লাহিড়ী সংবাদপত্রে যে অনবদ্য কার্টুনটি এঁকেছিলেন সেটা পরিবেশনের লোভ সামলাতে পারছি না।

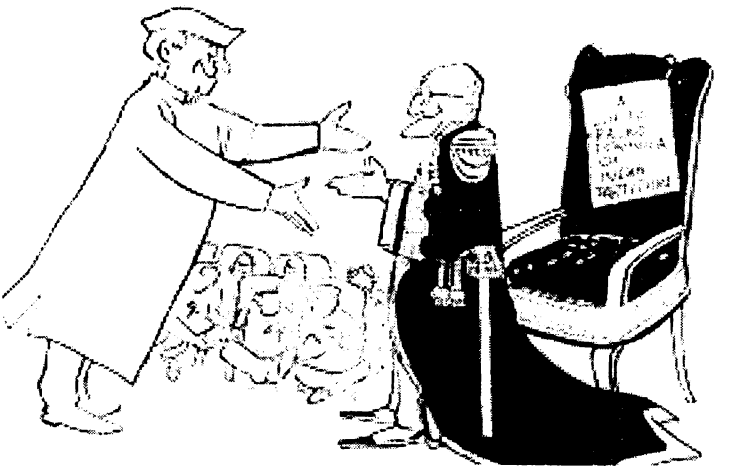

এখানে আবার আমার একটা চুটকি গল্প মনে পড়ছে। আমার এক ভাইপো, অশোক, ভারতে ডাক্তারী পাস করার পর আফ্রিকার একটি সদ্য-স্বাধীন রাজ্যে মেডিকেল কলেজে পড়ানোর চাকরি নিয়ে সপরিবারে আফ্রিকা চলে যায়। দু'বছরের মেয়াদ, তাই দু'বছরের ভিসা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ক্রমাগত এক্সটেনশন দিয়ে দশটি বছর আটকে রেখে দিল। প্রতিবারই অশোক ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করেছে। কোনো জবাব পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত ওকে আশ্বস্ত করে গেছেন, 'আরে আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন, ডঃ সান্যাল? এটাও তো সরকারি প্রতিষ্ঠান। আমাদের অনুরোধেই তো আপনি ভিসার মেয়াদ পার হওয়া সত্ত্বেও এদেশে আছেন।'

কাহিনী দীর্ঘতর করা নিরর্থক। দশ বছর পর সে যখন দেশে ফিরছে, তখনও তার ভিসার হিল্লে হয়নি। বেচারি ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছে। এয়ারপোর্টে ওর এক অনুজ সহকর্মী শেষমেশ বললে, শুনুন স্যার, ইমিগ্রেশন বা কাস্টমস অফিসারকে আপনি দরখাস্তগুলো দেখাবেন। সে যদি মেনে নেয় ভাল, না হলে তাকে আমাদের ভাষায় বলবেন, 'হাজু ওয়ে

pathagar.net

সুঞ্চাই, মাজু ওয়ে সুঞ্চামি!

অশোক বলে, তার মানে কী?

—চিচিংফাঁক!

—চিচিংফাঁক? তারই বা মানে কী?

—'আলিবাবা আর চল্লিশ চোরে'র গল্পটা পড়েননি, স্যার?

অশোক জবাব দেবার সুযোগ পায়নি। কারণ তখনই লাউড-স্পিকারে ঘোষিত হল : 'অমুক ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জাররা এবার ইমিগ্রেশন আর কাস্টম্‌স চেক করাতে এগিয়ে চলুন'—

অশোক দুরুদুরু বুকে লাইনে দাঁড়ালো।

যথাসময়ে ও এসে পৌঁছালো অফিসারটির সামনে। ভিসার প্রসঙ্গে সে ফাইল খুলে তার কাগজপত্র দেখাতে চাইল। নিকষকালো আফ্রিকান অফিসারটি বললে, ফাইলপত্র দেখার সময় আমার নেই। ভ্যালিড ভিসা থাকে তো দেখান, না হলে লাইন থেকে সরে দাঁড়ান। এ-ফ্লাইটে আপনার যাওয়া হবে না। নেক্সট?

বার দু-তিন 'রিপিট-দা-সেম-মিক্সচার' হবার পর অশোক মরিয়া হয়ে বলে বসে, 'হাজু ওয়ে সুঞ্চাই, মাজু ওয়ে সুঞ্চামি!'

শুনে অফিসারটি তাজ্জব। বলে, কী আশ্চর্য! সে-কথা আগে তো বলবেন! বেহুদ্দো আধঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন এক-টেরে। কেন?

অশোকের কাগজপত্রে সীল স্বাক্ষর দিয়ে বলে, এবার আপনার পালা—

— আমার পালা? মানে?

— লে হালুয়া! এখনই কী বললেন আমাদের ভাষায়? 'You help me, so that I may help you!'

অশোক একগাল হেসে হিপপকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করে।

আমার মনে হয়, পণ্ডিত জবাহরলাল এবং পণ্ডিত রাজাগোপালাচারি ওই আফ্রিকান চিচিং ফাঁক মন্ত্রটা জানতেন! রাজাজি প্রধানমন্ত্রীত্বের পথটা সাফা করে দিয়েছিলেন বেয়াল্লিশ সালে; তাই প্রতিদানে পণ্ডিতজিও প্রথম সুযোগেই রাজাজিকে বড়লাট বানিয়ে দিলেন!

: হাজু ওয়ে সুঞ্চাই, মাজু ওয়ে সুঞ্চামি!

কী-কথা থেকে কী-কথায় এসে পড়েছি। প্রাক্‌কথন থেকে Pre-প্রাক্‌কথনে। ফিরে আসা যাক সেই কালা দিবসে : 15.8.1947-এ।

আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তখন তাইহকু বিমানবন্দর থেকে আবার রওনা হয়েছেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়; সীমান্ত গান্ধী রণক্লান্ত দীর্ঘ দেহখানি নিয়ে যুদ্ধান্তে ফিরে চলেছেন তাঁর পুনঃ-পরাধীন মাতৃভূমিতে : পাকতুনিস্তানে। গান্ধীজি বেলেঘাটায় অনশনরত। আর পণ্ডিতজি তখন ডাইনে প্রভু মাউন্টব্যাটেন, বাঁয়ে তাঁর সুন্দরী লেডিকে নিয়ে বড়লাট-বাহাদুরের খানা-কামরায় সপার্ষদ বত্রিশ কোর্স-এর ডিনার খাচ্ছেন। অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদদের উদ্দেশে তর্পণ করছেন আর কি! বাবুর্চিরা যখন মুর্গ-মসল্লম সার্ভ করছে,— নেহরুজি টেংরি চুষছেন—তখন শুরু হল নেপথ্যে একটা মিঠে আবহসঙ্গীত। এতদিন পরে হলফ্ করে বলতে পারব না। তবে বোধহয় সেই গানটা :

pathagar.net

মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হল বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে।।

ভারতীয় রাজন্যবর্গ প্রত্যেকে স্বাক্ষর দিয়ে গেছেন 'ইনস্ট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশনে'। চুক্তি-মোতাবেক স্থির হয়েছে, যেসব রাজের চতুর্দিকেই ভারত অথবা পাকিস্তান, তারা অনিবার্যভাবে যুক্ত হবে সেই-সেই রাষ্ট্রে। কিন্তু যে-রাজ্যের সীমান্তে দুটি সদ্যস্বাধীন-রাষ্ট্র পড়ছে সেক্ষেত্রে কী হবে? স্থির হল : সেক্ষেত্রে ওই রাজ্যের পূর্বতন শাসকের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তিনি যা চাইবেন তাই হবে। কর্তার ইচ্ছায়, আইদার পাক, অর না-পাক। প্রজারা যা পাক তা পাক।

সেই মোতাবেক বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য দুটি সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রে বিলীন হয়ে গেল। গোল বাধল তিনটি ক্ষেত্রে। প্রথমটি হচ্ছে হায়দরাবাদ। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজা হিন্দু, কিন্তু শাসক মুসলমান। নিজাম-উল-মুলুক নবাব স্যার মীর ওসমান আলী খান বাহাদুর সদর্পে ঘোষণা করলেন : তিনি না-ভারত, না-পাক কোনো রাষ্ট্রেই যোগদান করবেন না। স্বাধীনভাবে রাজ্যটি শাসন ও শোষণ করতে থাকবেন। নবাব যত তড়পান তার চতুর্গুণ তর্জন-গর্জন করেন তাঁর সেনাপতি কাশিম রেজভি। সূর্যের চেয়ে উত্তপ্ত বালুকণাই অসহ্য হয়ে ওঠে। এই অজুহাতে হায়দরাবাদে কাশিম রেজভি শুরু করে দিল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। সর্দার প্যাটেল তখন স্বরাষ্ট্র তথা ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী। তাঁর আদেশে শুরু হয়ে গেল—'পুলিশ অ্যাকশন'। ভারতীয় রক্ষীবাহিনী হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল হায়দরাবাদে। নিজাম তৎক্ষণাৎ ইউ. এন. ও.-র দরবারে একটা মস্ত আর্জি পেশ করে দিলেন। কিন্তু তার

জবাব আসার আগেই ভারতীয় বাহিনী ঘিরে ফেলল নিজামের প্রাসাদ। শৃঙ্খলাবদ্ধ করল কাশিম রেজভিকে। নবাবের এবার চৈতন্য হল। তিনি ভারতভুক্তি মেনে নিলেন। ইউ. এন. ও. থেকে আর্জিটা প্রত্যাহৃত হল। এই সময়ে শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী যে অনবদ্য কার্টুনটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছিলেন সেটি তাঁর অনুমত্যানুসারে পূর্বপৃষ্ঠায় আবার আপনাদের খেদমতে পেশ করা গেল।

দু'নম্বর ঝামেলা পাকালেন জুনাগড়ের নবাব। আইনমাফিক তিনি ইতিপূর্বেই ভারতভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। কিন্তু শোনা গেল, রাতারাতি কচ্ছের 'রন্' দিয়ে কয়েকটি নৌকায় প্রতিবেশী রাজ্যের কিছু মেহ্‌মান এসে উপস্থিত হয়েছেন জুনাগড়ে। সে রাজ্যের মহান নেতা জুল্‌ফিকার আলী ভুট্টো হচ্ছেন জুনাগড় নবাবের রিস্তেদার। খুঁটির জোরে মেড়া হুঙ্কার ছাড়লেন : 'আম্মো স্বাধীন!'

এবারও সর্দার প্যাটেল অনায়াসে তাঁকে ঠাণ্ডা করে দিলেন। এবারও একটি অনবদ্য কার্টুন এঁকেছিলেন চণ্ডীবাবু :

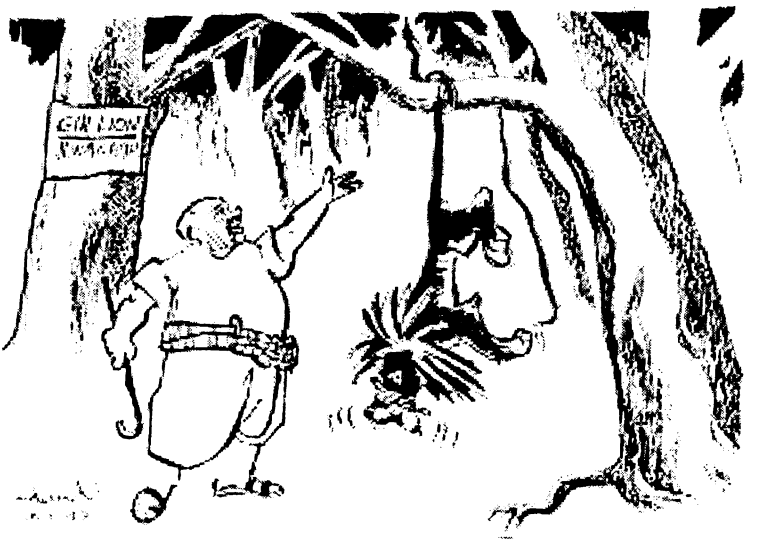

তিন নম্বর : ভূস্বর্গ কাশ্মীর!

তার একদিকে ভারত, একদিকে পাকিস্তান। মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু অধিপতি হিন্দু রাজা : হরি সিং। তিনি বেমক্কা ঘোষণা করে বসলেন, আমি কোনো রাষ্ট্রেই যোগ দেব না। ভারত ও পাকিস্তানের মাঝখানে স্বাধীন কাশ্মীররাজ্য হয়ে থাকবে একটা 'বাফার স্টেট'।

ভারত নীরব রইল। পাকিস্তান রইল না। এই অজুহাতটাই চাইছিল তারা। সেখানে কিছু ব্রিটিশ জেনারেলকে মাইনে দিয়ে পোষা হচ্ছিল। তাদের সহায়তায় ইতিমধ্যেই

pathagar.net

গিলগিটের অনেকটা তুষারাবৃত অঞ্চল পাকিস্তান হাতিয়ে নিয়েছে। এবার হাত বাড়ালো কাশ্মীরের দিকে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে হাজার পাঁচেক আফ্রিদি সৈন্য রওনা হল শ্রীনগর দখল করতে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ছত্রচ্ছায়ায়!

সবগুলি দেশীয় রাজ্যই চিরকাল আপদে-বিপদে ব্রিটিশ মহাপ্রভুদের উপর নির্ভর করেছে। তাদের নিজস্ব সৈন্যসামন্ত ছিল শোভাবর্ধনের জন্য। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজাকে স্যালুট দিতে অথবা প্যারেড করে জৌলুস বর্ধন করতে। কাশ্মীররাজ হরি সিং-এর রাজ্যেও একই হালত।

আফ্রিদি উপজাতীয়রা কাশ্মীরের উত্তরাংশ আক্রমণ করেছে শুনে মহারাজ হরিসিং একেবারে অগ্নিশর্মা! তৎক্ষণাৎ তলব করলেন তাঁর প্রধান সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিংকে। ফরমান জারি করলেন : সাতদিনের ভিতর ওইসব অসভ্য আদিবাসী হানাদারগুলোকে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দিন। তারা যেতে না চাইলে তাদের কচুকাটা করুন।

ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিংজি বললেন, মহারাজ, আপনি বোধহয় বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ঠিক ওয়াকিবহাল নন। আমার মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স বলছে, আক্রমণকারীরা পাকিস্তানী অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই আসছে, তীর-ধনুক-বল্লম নিয়ে নয়। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কয়েকশ' মুসলিম লীগ ভলান্টিয়ার। নিজেদের তারা বলে, 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড'। পাকিস্তান রেগুলার আর্মির কাছ থেকে তারাও সব অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে : রাইফেল, ব্রেনগান, স্টেনগান, কামান, মর্টার।

হরি সিং মুচকি হেসে বললেন, ব্রিগেডিয়ার সাহেব ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?

অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন বীর সৈনিকটি। গম্ভীরভাবে বললেন, তা কিছুটা পেয়েছি, মহারাজ! নিজের জন্য নয়, শ্রীনগরের জন্য, কাশ্মীরের জন্য। আপনি কি অন্তত এটুকু জানেন যে, আপনার সৈন্যদলে মুসলমানেরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর তারা রাতারাতি সদলবলে ওই হানাদারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে?

হরি সিং গর্জন করে ওঠেন : তাদের সবাইকে এক্ষুনি গ্রেপ্তার করুন। কোর্টমার্শাল করুন। কোৎল করুন!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সেনাপতির। হায়রে! এই হচ্ছেন গোটা কাশ্মীর উপত্যকার আত্মসুখসর্বস্ব নির্বোধ নৃপতি।

হরি সিং বললেন, আপনার কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি। অনেকদিন বন্দুক-টন্দুক তো হাতে ধরতে হয়নি! কিন্তু কী করবেন বলুন...

রাজেন্দ্র সিং এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। দৃঢ়স্বরে বললেন, তা ঠিক। অনেকদিন যুদ্ধ করতে হয়নি। কিন্তু যুদ্ধ না-করেই আমি ব্রিটিশ-আর্মিতে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হইনি, মহারাজ! মালয়ে, বর্মায় জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতাও আমার আছে। ইম্ফলে দুর্ভাগ্যবশত তা করতে হয়েছে আজাদ-হিন্দ্

pathagar.net

বাহিনীর সঙ্গেও—

হরি সিং সরলভাবে জানতে চাইলেন, কেন? সেটা দুর্ভাগ্যবশত হতে যাবে কেন?

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ব্রিগেডিয়ারের। জবাব দিলেন না। শুধু মনে মনে বললেন, সে তত্ত্বটা যদি বুঝতেই পারবেন, মহারাজ, তাহলে আজ আপনার এ দুর্দশা হবে কেন?

হানাদারেরা সে-সময় শ্রীনগর থেকে মাত্র পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার দূরে। শ্রীনগরের সৈন্য-ছাউনিতে তখন মাত্র শ'-দেড়েক হিন্দু সৈন্য উপস্থিত। তাদেরই একত্র করে ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং জীবনের শেষ যুদ্ধ করতে গেলেন।

বাড়ি থেকে যখন বার হচ্ছেন ওঁর ছোট্ট মেয়েটা বললে, ড্যাড, প্লিজ বাঈ দ্যাট ডল অ্যান্ড ব্রিং ইট ফর মি, হোয়েন য়ু কাম ব্যাক।

ব্রিগেডিয়ার বললেন, শ্যিওর!

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, কত দিন পরে ফিরতে পারবে মনে হয়?

ব্রিগেডিয়ার ম্লান হেসে বললেন, গুরুজী জানেন! মনে হয় এবার আর ফিরে আসা হবে না।

স্ত্রী ধমকে ওঠেন, ছিঃ! অমন অলুক্ষুনে কথা বলতে নেই!

কোয়ার্টার্স থেকে ওঁকে সেনা-ছাউনিতে পৌঁছে দিল মিলিটারি-জিপের ড্রাইভার বচন সিং। ব্রিগেডিয়ার হিপ্‌-পকেট থেকে ওয়ালেটটা বার করে তার হাতে একটা একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে হিন্দিতে বললেন, সেন্ট্রাল মার্কেটে সেদিন যে পুতুলটা মিশিবাবা পছন্দ করেছিল, সেটা কিনে নিয়ে যেও। তাকে দিও।

—ঔর তোড়ানি মেম-সাব কো দুঁ?

—নেহী। বহ্‌ তুম্‌ রাখ্‌ দো। তুমারা বালবাচ্ছাকো মিঠাই খিলাওগে।

উরি পৌঁছে মুখোমুখি হলেন শত্রুসৈন্যের। ওঁর সঙ্গী দেড়শ, বিপক্ষে দেড় হাজার। ওঁর রাইফেল ছাড়া অস্ত্র নেই, ওদের হাতে অটোমেটিক। ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং-এর মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় পড়া কবিতাটি—'চার্জ অব দ্য লাইট ব্রিগেড!'

'ক্যানন টু রাইট অফ দেম
ক্যানন টু লেফ্‌ট অফ দেম
ক্যানন ইন ফ্রন্ট অব দেম
ভলীড অ্যান্ড থান্ডার্ড!'

এই অসম যুদ্ধে দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা লড়াই করেছিলেন ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং আর তাঁর সাড়ে-সাত-কুড়ি সহযোদ্ধা। তারপর তাঁরা সবাই একে একে শহিদ হয়ে গেলেন! নিঃশেষে!

শ্রীনগরে দুঃসংবাদটা এসে পৌঁছাল। বন্ধ হয়ে গেল দোকানপাট! যে-কোন মুহূর্তে পাকিস্তানী হানাদারেরা এসে শুরু করে দেবে লুটতরাজ! হঠাৎ শ্রীনগরের সমস্ত আলো

pathagar.net

গেল নিবে। কী ব্যাপার! বোঝা গেল—শত্রুসৈন্য মহুরা গ্রাম দখল করেছে!

মহুরায় ছিল ঝরনার জলে চালিত একটি জলবিদ্যুৎ কারখানা। সেই বিদ্যুতেই শ্রীনগরের রোশনাই। হানাদারেরা সেটা বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে।

এতক্ষণে মহারাজের মোটা মাথায় ব্যাপারের গুরুত্বটা ঢুকল। ঘনান্ধকারে দেওয়ানজিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন উপায়?

দেওয়ানজি বললেন, স্বাধীন কাশ্মীরের খোয়াব দেখা বন্ধ করুন, মহারাজ! সরাসরি টেলিগ্রাম করুন পণ্ডিতজিকে। অথবা প্যাটেলজিকে। তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করুন।

হরি সিং তাই করলেন। সেদিন তারিখটা ছিল পঁচিশে অক্টোবর, 1947 ;অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হয়েছে মাত্র দু'মাস দশদিন আগে।

নয়াদিল্লিতে মহারাজ হরি সিংয়ের তারবার্তা পেয়ে সর্দার বল্লভভাই তৎক্ষণাৎ সৈন্য পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু বাধ সাধলেন বড়লাট স্বয়ং। মাউন্টব্যাটেন অবশ্য তখন শুধু নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর জেনারেল। কিন্তু তাঁর যুক্তিটা অকাট্য। বললেন টেলিগ্রাম-বার্তায় তো সে কাজ করা যাবে না। মহারাজকে প্রথমে 'ইনস্ট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশনে' স্বাক্ষর দিতে হবে। ন্যায্য কথা। সংবাদটা মহারাজের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র পাঠিয়ে দিলেন দিল্লিতে। আইন-মোতাবেক কাশ্মীর ভূখণ্ড এল ভারতের এক্তিয়ারে।

কিন্তু মুলুকের মালিকানা কি শুধু আইনের? 'জোর যার'-এর কোনো ভূমিকা নেই? শ্রীনগর ভারত থেকে প্রায় পাঁচশ কি.মি. দূরে। সে-পথও ভাঙাচোরা। মেরামতি হয় না। মোটরগাড়ি কোনোক্রমে হয়তো যেতে পারে, বারে বারে টায়ার বদলিয়ে। সৈন্যবাহিনী সে-পথে যাবে কেমন করে? ওদিকে শ্রীনগরে উড়োজাহাজ ওঠা-নামার যে ল্যান্ডিং-স্ট্রিপটা আছে, তাতে জঙ্গী বিমান সহজে নামতে পারবে না। সেটা শুধুমাত্র মহারাজের শৌখিন বিমান চলাচলের উপযুক্ত।

তবু লেঃ কর্নেল দেওয়ান রঞ্জিৎ রাওয়ের নেতৃত্বে এক ব্যাটেলিয়ান শিখ সৈন্য দিল্লির পালাম বিমানঘাঁটি থেকে আকাশপথে রওনা হল। তিন-তিনখানা ডাকোটা বিমান। স্বাধীন ভারতের তরফে এই প্রথম যুদ্ধযাত্রা! তারিখটা ছিল : 27.10.1947।

ওদিকে হানাদারেরা ততক্ষণে শ্রীনগরের উপকণ্ঠে বারমুলা দখল করে নিয়েছে। ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিংয়ের সৈন্যদল নির্মূল হবার পর তারা বিনা বাধায় এগিয়ে আসছে শ্রীনগরমুখো। পাকিস্তানের শাহেন-শাহ্ জনাব জিন্না করাচী থেকে এগিয়ে চলে এসেছেন অ্যাবটাবাদে। শ্রীনগরের ত্রিশ কি.মি. দূরত্বে। স্বপ্নরাজ্য কাশ্মীর এখন প্রায় তাঁর মুঠোয়। সামনেই ইসলামের সবচেয়ে বড় পরব : ঈদুজ্জুহা! পাকিস্তানের জনক কায়েদে-আজম জিন্না সাহেবের ইচ্ছা—শ্রীনগরের হজরতবাল মসজিদে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে খুদবা পাঠ করবেন তিনি। হরি সিংয়ের রাজপ্রাসাদে পাকিস্তানের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেবার পরেই!

pathagar.net

তিনটি ডাকোটা বিমানে কতজন সৈন্যই বা ধরে? তবু সেই মুষ্টিমেয় সৈন্যদলের

দলপতি কর্নেল দেওয়ান রঞ্জিৎ রাও দখল নিলেন এয়ারপোর্ট-এর। কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকে শ্রীনগর শহরে যাবার জন্য কোনও গাড়ি নেই! হরি সিং-এর সরকার কিছু ট্রাকের ব্যবস্থাও করেনি।

সৈন্যদের নিয়ে ডব্‌ল্ মার্চ করে ওঁরা চলে এলেন শহরে। রাজা খুশি হলেন খবর পেয়ে। শহরের কিছু প্রাইভেট বাস ও ট্রাক 'রিকুইজিশান' করে সৈন্যদের নিয়ে কর্নেল রাও রওনা হলেন হানাদারদের মুখোমুখি হতে। যদিও তাঁর শিখ সৈন্যরা হানাদারদের তুলনায় সংখ্যায় ছিল নগণ্য, তবু পাহাড়ের মাথায় ঘাঁটি করার সুযোগে তাঁরা ওদের উপর অতর্কিতে হানা দিলেন। এবারও হল অসম যুদ্ধ। তবু হানাদারদের অপ্রতিহত গতিটা থমকে গেল। ওদের শ্রীনগর দখল করা হল না। অবশ্য এই যুদ্ধে বীরের মতোই যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিলেন কর্নেল রঞ্জিৎ রাও। বারমুলার পথে যাঁরা যান আজও তাঁরা দেখতে পান পাহাড়ের গায়ে একটা পাইন কাঠের ফলক। তাতে ইংরেজিতে লেখা :

> ভারতের সেইসব বীর সৈন্যদের কথা চিরকাল আমাদের মনে থাকবে।
> তাঁরা কাশ্মীরের স্বাধীনতা রক্ষায় এইখানে হানাদারদের রুখে দিয়েছিলেন।
> তাঁরা শহিদ হয়ে রক্ষা করেছিলেন এই উপত্যকায় হিন্দু-মুসলমান
> জনগণকে।

অদূরেই আছে কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি পাথরের মনুমেন্ট। কর্নেল দেওয়ান রঞ্জিৎ রাওয়ের স্মৃতিচিহ্ন।

"ইংরেজিতে কী লেখা আছে তা না পড়লেও চলে। কারণ লেখাপড়া শেখেনি এমন যে অজ পাড়াগাঁয়ের চাষী সেও জানে, এই স্মৃতিস্তম্ভটি কার জন্য। বলে, কর্নেল রাও বাবর থে! উও ওহি থে জিন্‌হোনে হাম্‌কো বচায়া।"[৩]

কর্নেল রাওয়ের পর কাশ্মীর যুদ্ধে সেনাপতি হয়ে এসেছিলেন একজন বাঙালী—ব্রিগেডিয়ার এল. পি. সেন। তাঁর বাবা ছিলেন রেঙ্গুনের একজন নামকরা ব্যারিস্টার। ওঁর জন্মও রেঙ্গুনে। পড়াশুনা সেখানকার কনভেন্ট স্কুলে। স্যান্ডহার্স্ট থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিখে ভারতীয় সেনাবিভাগে যোগদান করেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর আগে।

ব্রিগেডিয়ার সেন তাঁর গাড়োয়ালী সৈন্যদের নিযুক্ত করেছিলেন এয়ারপোর্টের নিরাপত্তা বিধানে। ওই পোতাশ্রয়ই তখন কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের একমাত্র যোগসূত্র। শত্রুরা ইতিমধ্যে শ্রীনগরের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। একদল আসছে বারমুলা হয়ে পিচ-বাঁধানো সড়কপথে। আসছে মোটর ট্রাকে। মাথায় পাকিস্তানের চাঁদ-তারা মার্কা ঝাণ্ডা উড়িয়ে। দ্বিতীয় দল আসছে গুটি-গুটি পাহাড় টপকিয়ে নানান পাকদণ্ডী পথে। ব্রিগেডিয়ার ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাঁর সৈন্যদের মোতায়েন করলেন।

প্রায় প্রতিদিনই হাতাহাতি যুদ্ধ হতে লাগল। এ-যুদ্ধে মারা গেলেন গাড়োয়ালীদের সেনানায়ক মেজর সোমনাথ শর্মা। কিন্তু তবু তারা এক পাও পিছু হটল না।

ইতিমধ্যে দিল্লির পালাম আর সফদরজঙ বিমানঘাঁটি থেকে ক্রমাগত শতখানেক ডাকোটা

pathagar.net

প্লেন খেয়া নৌকার মতো শ্রীনগরকে যোগান দিয়ে চলেছে শিখ আর গাড়োয়ালী সৈন্য। ওদিকে দিল্লি-শ্রীনগর পার্বত্য সড়কেও দিবারাত্র কাজ করে চলেছে এম. ই. এস.-এর লোকেরা। তিল তিল করে এগিয়ে আসছে তারা। চওড়া হচ্ছে রাস্তা, তৈরি হচ্ছে সাঁকো। ক্রমে একদিন সকালে পাঠানকোটের মাঠ পেরিয়ে, পীরপঞ্জলের চূড়া ডিঙিয়ে, বানিহালের টানেল ঘর্ঘর শব্দে অতিক্রম করে ছোট্ট একটা সাঁজোয়া গাড়ির বাহিনী এসে উপনীত হল শ্রীনগরের সেন্ট্রাল মার্কেটে। লাইনবন্দি আর্মার্ড কার। গাড়ির বনেটে কামান সাঁটা। দেখে শ্রীনগরের ছেলে-বুড়ো উল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল : ভারতমাতাকী জয়! জয় হিন্দ্!

অক্টোবরের রৌদ্রোজ্জ্বল দিনগুলি শেষ হয়ে এল। পড়ল নভেম্বর। হাওয়ায় শীতের আমেজ। সাতই নভেম্বর সেই সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলল গাড়োয়ালী সৈন্যরা হানাদারদের মুখোমুখি হতে। এতদিন ছিল আত্মরক্ষার লড়াই—হানাদারদের ঠেকানো। এবার শুরু হল আক্রমণাত্মক যুদ্ধ— হানাদারদের বিতাড়ণ। বাদগামের যুদ্ধের পরে ভারতীয় সৈন্যদের তরফ থেকে বড় রকমের প্রতিবন্ধকতা পায়নি হানাদারেরা—তারা গুটি গুটি এগিয়ে এসেছে বারমুলা থেকে পাটান, সেখান থেকে সেলাটং। রাজধানী শ্রীনগর ছিল তাদের নাগালে। কায়েদে-আজম জিন্না অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন অ্যাবাটাবাদে। প্রতি মুহূর্তেই আশা করছেন আসবে ডেসপ্যাচ— শ্রীনগর দখল করেছে হানাদারদের ছদ্মবেশে পাকিস্তানী সৈন্যদল। দিনের পর দিন যায়, কিন্তু সে শুভবার্তা আর আসেই না।

পাটান থেকে শ্রীনগর সড়কের ধারে ছাউনি ফেলেছে হানাদারেরা। দশই নভেম্বর রাত্রে অতর্কিতে সেখানে হানা দিল ভারতীয় বাহিনী। মুহুর্মুহু গর্জন করতে থাকে আর্মার্ড কারের কামান। মেশিনগানের অবিশ্রান্ত : খ্যাটা-খ্যাটা-খ্যাটা—

ওরা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। দু'-চারজন নৈশপ্রহরী ছাড়া সবাই ছিল কম্বলের নিচে। গভীর ঘুমে অচেতন। তাদের সেনাপতি দুঃস্বপ্নেও আশঙ্কা করেনি যে, দিল্লি-শ্রীনগর সড়কপথ এই এক মাসে চালু হয়ে যেতে পারে। 'ইয়া আল্লাহ্' বলে হানাদারেরা যে-যেদিকে পারল দিল ছুট। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, লুটের মাল, রসদ, খাদ্যভাণ্ডার ফেলে রেখে।

ভারতীয় বাহিনীর হল নিরঙ্কুশ জয়। হানাদারেরা উল্টোপথে ফিরে এল পাটান থেকে বারমুলায়। তখন সবে ভোর হয়-হয়।

এখানে পাকিস্তানী হানাদারেরা অসভ্য বর্বরের মতো লুটেরার ভূমিকায় বারমুলার গ্রামবাসীদের সর্বস্ব কেড়ে নিল।

হানাদারেরা প্রতিটি গৃহস্থের সব কিছু লুট করল। বাক্স-সিন্দুক ভেঙে নিল টাকাকড়ি, সোনাদানা। মেয়েদের গা থেকে ছিনিয়ে নিল গহনা—গলার হাঁসুলি, হাতের বাজুবন্ধ, কান ছিঁড়ে রূপার ঢেঁড়ি ঝুমকো।

বারমুলায় হানাদারদের পৈশাচিক অত্যাচারের তুলনা নেই। যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষের কোনো বাছবিচার রইল না। স্ত্রীর চোখের সামনে হত্যা করল স্বামীকে, মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হিন্দু বা শিখের শিশু!

বারমুলায় ছিল একটি ক্রিশ্চিয়ান কনভেন্ট— প্রেজেন্টেশন কনভেন্ট। লুণ্ঠিত হল

pathagar.net

সেটাও। সেখানে নিহত হলেন একজন বৃদ্ধ ইংরেজ লেফটেনেন্ট-কর্নেল ভি. ও. টি. ভাইকস্। অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। অবসর নিয়ে ওই কনভেন্টে সস্ত্রীক বাস করতেন। সেবাধর্মে ব্রতী হয়ে। বাতে পঙ্গু। তবু সাধ্যমতো হিসাবের খাতাপত্র লিখতেন। হানাদারদের দেখে বন্দুক হাতে লড়তে গেলেন বৃদ্ধ। নিহত হলেন বন্দুকের গুলিতে।

"ভয়ে ও উদ্বেগে স্বামীর সঙ্গে ঠিক তাঁর পিছনেই ছিলেন মিসেস ভাইকস্। একটি ভীরু খরগোশের ছানার উপর একপাল হিংস্র জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল হানাদারের দল।...দু'দিন পরে মিসেস্ ভাইকস্-এর নগ্ন মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়া গেল একটা গভীর কূপের মধ্যে।"[৪]

যাযাবর আরও বলছেন, "কাশ্মীর আক্রমণকে পাকিস্তান বরাবর বলেছে : ধর্মযুদ্ধ। কাশ্মীরের প্রজারা বেশিরভাগ মুসলমান। মহারাজ অবশ্য ছিলেন হিন্দু। তিনি নাকি কেবলই মুসলিম নির্যাতন করতেন। তাই উপজাতীয় মুসলমানেরা খেপে গিয়ে কাশ্মীরে চড়াও হয়েছে তাদের স্বধর্মীদের ত্রাণ করতে। এ তো যেমন তেমন লড়াই নয়—এ জিহাদ। ওরা তো হানাদার নয়, ওরা মুহাজিদ। বলেছেন পাকিস্তানের কর্তারা।"

বারমুলা গ্রামের চৌদ্দ আনা বাসিন্দা মুসলমান। তারাই লুণ্ঠিত হয়েছিল, নিহত হয়েছিল। গ্রামের প্রধানও ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান—মকবুল শেরোয়ানী। নিহত হয়েছিলেন তিনিও।

বারমুলায় ভারতীয় সৈন্যদল এসে পৌঁছালো সন্ধ্যা নাগাদ। ততক্ষণে লুটপাট সেরে পাকিস্তানী হানাদারেরা আরও পিছু হটেছে। বারমুলায় পড়ে আছে অগুনতি মৃতদেহ। তাদের সৎকার করার দায়িত্বটা বর্তালো ভারতীয় জওয়ানদের।

সে-রাত্রেই শ্রীনগরে ঘটল একটা আজব কাণ্ড। মাঝরাত্রে ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল বিজলী বাতি! কী ব্যাপার? বোঝা গেল ভারতীয় বাহিনী 'মহুরা' পৌঁছে গেছে। দখল নিয়েছে। এঞ্জিনিয়াররা যন্ত্রপাতি মেরামত করে আবার চালু করেছেন মহুরা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।

সে-রাত্রে শ্রীনগরে কেউ আর বিছানায় ফিরে যায়নি। সারারাত নাচগান করেছে। অনেকদিন পরে নিষ্প্রদীপ শ্রীনগর যে আজ হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করে উঠেছে।

অ্যাবটাবাদে একটি সুরম্য দ্বিতল প্রাসাদের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে একান্ত শ্রুতিলেখককে ডিক্‌টেশন দিচ্ছিলেন পাকিস্তান-জনক কায়েদে-আজম জিন্না-সাহেব। অর্ধশয়ান তিনি একটা আরাম-কেদারায়। পরিধানে নরম-উলের ড্রেসিং-গাউন, হাতে পাইপ।

হঠাৎ প্রবেশদ্বারে খট করে শব্দ হল। চোখের মনোক্লটা খুলে কায়েদে-আজম দ্বারের দিকে ফিরলেন। দেখলেন তাঁর তরুণ এ. ডি. কং মহম্মদ মুস্তাক স্যালুট করে নিস্পন্দে দাঁড়িয়ে। 'খট্'-টা তার জুতার নালে-নালে টক্কর। জিন্না প্রশ্ন করেন : ইয়েস?

এ. ডি. কং স্টেনোগ্রাফারের দিকে একনজর দেখে নিয়ে নীরব রইল।

জিন্না এদিকে ফিরলেন। স্টেনোকে বললেন, অনেকক্ষণ একটানা ডিক্‌টেশন দিয়েছি ইসমাইল। য়ু আর নাউ এক্সকিউজড ফর ফিফটিন মিনিটস্। হ্যাভ আ কফি ব্রেক।

pathagar.net

স্টেনোগ্রাফার ওঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ; সব গোপন পত্রাবলীর ডিক্‌টেশন সেই নিয়ে থাকে। এবং সেসব পত্রের সারমর্ম জানতে পায় না ওই এ. ডি. কং মহম্মদ মুস্তাক। কিন্তু কায়েদে-আজমের ডান হাতখানাই কি জানতে পারে তাঁর বাঁ হাতটা কখন কী করছে?

ইসমাইল তার পেনসিল আর নোটবই কুড়িয়ে নিয়ে আভূমি নত হয়ে সেলাম জানালো। নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হল ঘর থেকে। স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত কবাট-রুদ্ধকের অমোঘ আকর্ষণে দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল। জিন্না নীরব জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ধরলেন সংবাদবহর দিকে।

মুস্তাক তখনো অ্যাটেনশনে। সেভাবেই বললে, কিছু দুঃসংবাদ আছে য়োর এক্সেলেন্সি! আমাদের বাহিনী অনেকটা পিছু হটে এসেছে। পাটান থেকে প্রথমে বারমুলা, তারপর কাল রাত্রে বারমুলা থেকে একদল হটে গেছে পশ্চিমে মুজফরাবাদে, আর একদল উত্তরে বিলাস-এর দিকে।

জিন্না অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, বাট হোয়াই? কেন?

—ইন্ডিয়ান কাফেররা আর্মার্ড-কার নিয়ে শ্রীনগর-পাটান সড়কে আমাদের ক্যাম্পে অতর্কিত আক্রমণ করেছিল, য়োর এক্সেলেন্সি!

—আর্মার্ড কার! কাফেরগুলো তা পেল কোথায়? দিল্লি থেকে প্লেনে তো আর সেগুলো উড়ে আসতে পারে না!

—নো, য়োর এক্সেলেন্সি! সেগুলো এসেছে বাই রোড। ভায়া পাঠানকোট, পীরপঞ্জল, বানিহাল পাস।

—বাট দ্যাট্‌স্ অ্যাবসার্ড! সে তো পাঁচশ মাইলের দূরত্ব! সে রাস্তা ওরা একমাসের মধ্যে মেরামত করে ফেলতে পারে না। আফ্রিদি উপজাতীয়রা ওদের বাধা দেয়নি? রাস্তা বানানোর কাজে?

এ. ডি. কং সলজ্জে পেশ করে, ও রাস্তার গোটাটাই শ্রীনগরের দক্ষিণে। আমরা তো এখনো...

—আই নো, আই নো! শ্রীনগরেই পৌঁছতে পারিনি। তার মানে তুমি বলতে চাও, ইন্ডিয়ান আর্মি ফুল-ফ্লেজেড আক্রমণ করেছে আমাদের? কোন রাখ্-ঢাক না করেই?

—ইয়েস য়োর এক্সেলেন্সি! ফুল-ফ্লেজেড মিলিটারি অপারেশন। বাই রেগুলার ইন্ডিয়ান আর্মি!

—ও. কে.! তাহলে আমাদেরও আর কোনও কামোফ্লেজের দরকার নেই। আমরাও রেগুলার আর্মি নিয়ে কাউন্টার-অ্যাটাক করব। অঘোষিত যুদ্ধ। কিন্তু 'ওনাস-অব-রেসপন্সিবিলিটি' ইন্ডিয়ার। তারা আগে আক্রমণ করেছে। তুমি একটা কাজ কর! একটা টেলিফোন কর লাহোরে। আমার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে বল, প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্র্যাসিকে আমার সঙ্গে এই অ্যাবটাবাদে এসে দেখা করতে। উইদিন টুয়েন্টিফোর আওয়ার্স! আমরা এই দণ্ডে পাকিস্তানের সমস্ত সৈন্য নিয়ে কাশ্মীরে যুদ্ধ যাত্রা করব!

এ. ডি. কং স্যালুট করল! কিন্তু স্থানত্যাগ করল না।

—কী হল? হোয়াই আর য়ু স্ট্যান্ডিং লাইক এ জোম্বি?

pathagar.net

মুস্তাক সবিনয়ে বলল, সে ব্যবস্থাটা লাহোর বা করাচীতে গিয়েই করা ভালো, য়োর এক্সেলেন্সি!

—বাট হোয়াই? হোয়াই নট অ্যাট অ্যাবটাবাদ?

—কারণ ইন্ডিয়ান আর্মির দূরত্ব—অ্যাজ দ্য ক্রো ফ্লাইজ—মাইল ত্রিশেক। পাকদণ্ডী পথে অবশ্য প্রায় একশ মাইল। কিন্তু ওরা যদি বমার প্লেনও এনে থাকে...

কথাটা তার শেষ হল না। জনাব জিন্না বললেন, অল রাইট। স্ট্রাইক দ্য টেন্ট টেম্পরারিলি হিয়ার। লেটস্ মুভ ব্যাক টু করাচি। আ স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট!

ইতিমধ্যে ভারত থেকে কাশ্মীরে এসে উপস্থিত হয়েছেন আর এক দুর্ধর্ষ জেনারেল : ব্রিগেডিয়ার ওসমান। পঞ্চাশ নম্বর প্যারা-ব্রিগেডের অধিনায়ক হয়ে তিনি এসেছিলেন ঝানগরে। এর মধ্যে পুঞ্চে এক ভয়াবহ যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী হটিয়ে দিয়েছে হানাদারদের। তারা ক্রমশ পিছনে হটে যাচ্ছে। তবু মাঝে মাঝে তারা ঘুরেও দাঁড়াচ্ছে। ওসমান একজন সাচ্চা মুসলমান। উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার সন্তান। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন বিলাতে। স্যান্ডহার্স্ট-এর তিনিই শেষ ভারতীয় শিক্ষার্থী। স্যান্ডহার্স্টে এক সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতা একবার এক ভোজসভায় বসেছিলেন ওসমানের ঠিক পাশেই। ওঁর নাম শুনে আন্তরিকতার সুরে তিনি বললেন, আচ্ছা! আপনি জাতিতে মুসলমান! কী সৌভাগ্য! আমিও তাই...

ওসমান বাধা দিয়ে বলেছিলেন, আয়াম সরি টু করেক্ট য়ু, স্যর! আমি ধর্মে ইসলাম, কিন্তু জাতিতে ভারতীয়!

ওসমান ভারত-বিভাগের সময় ছিলেন পশ্চিম পাঞ্জাবের মুলতানে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী। বহু বিপন্ন শিখ ও হিন্দুকে তিনি রক্ষা করেছিলেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। গান্ধীহত্যার পরদিন থেকে ওসমান মাছ-মাংস খাওয়া ত্যাগ করে হয়েছিলেন নিরামিষাশী! হিন্দু জওয়ানদের তিনি শুভেচ্ছা জানাতেন 'রাম-রাম' বলে, শিখ সহযোদ্ধাদের সম্বোধন করতেন 'সৎ শ্রী আকাল' ধ্বনি দিয়ে। সেনাপতি প্রায়ই চলে আসতেন সাধারণ সৈনিকদের ছাউনিতে, ডিনার টাইমে। একসঙ্গে টেবিলে বসতেন নিরামিষ আহারে। যেন 'ইফতারি' করতেন। সমস্ত বাহিনী তাঁকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

ব্রিগেডিয়ার ওসমানের নেতৃত্বে ভারতীয় জওয়ানেরা দখল করল : কোট। তারপর নৌশেরা। এগিয়ে চলল তাঁর বাহিনী। জমিতে শিখ সৈন্যদের রাইফেল আর অটোমেটিক এবং আকাশপথে বোমারু বিমানের গুলিবর্ষণ। সহস্র সহস্র হানাদারদের মৃতদেহ মাড়িয়ে এগিয়ে চলল ওসমানের সৈন্যরা। গায়কোটের অরণ্য অতিক্রম করে দখল নিল ঝানগড়। সেখানকার ঝাণ্ডাচকে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে উড়তে লাগল ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা— বৈরাগ্য, শান্তি ও তারুণ্যের প্রতীক : গেরুয়া-সাদা-সবুজ!

তারপর চৌঠা জুলাই, আটচল্লিশ সালে ঘটে গেল একটা দুর্ঘটনা।

সকল সঙ্কটে নিজ সৈন্যের পাশে এসে দাঁড়ান ওসমান। সেদিন সেই

pathagar.net

গ্নিবৃষ্টির মধ্যে তিনি আসা-যাওয়া করছিলেন এক বাঙ্কার থেকে অন্য বাঙ্কারে। এমন সময় একটা বোমা সশব্দে ফেটে পড়ল তাঁর সামনে।[৫]

কিছুতেই কিছু করা গেল না। পরদিন ভোররাত্রে তাঁর সব যন্ত্রণার অবসান হল। ঝানগড়ের ছাউনিতে নেমে এল অন্ধকার। পাকিস্তানে হল আনন্দ উৎসব। দীপাবলী হল হানাদারদের পেশোয়ার-শিবিরে।

যাযাবর লিখছেন, "পুষ্পস্তবকে সাজিয়ে বীরের মরদেহ বিমানযোগে নিয়ে আসা হল নয়াদিল্লিতে। সেখানে হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, পারসিক ও মুসলমানেরা শ্রদ্ধাভরে ফুল ছড়িয়ে দিল শবাধারে। জাতীয় পতাকায় ঢেকে কামানের গাড়িতে তুলে পূর্ণ সামরিক সম্মানে হল শবযাত্রা। শবানুগমন করলেন স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর তিন সর্বাধ্যক্ষ ও অন্যান্য প্রধান সেনানায়ক, মন্ত্রিসভার সমুদয় সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী নেহরু।...স্বাধীন ভারতে একমাত্র গান্ধীজীর শবযাত্রা ছাড়া আর কারও মৃত্যুতে দিল্লিতে পড়েনি এমন সার্বজনীন বিষাদের ছায়া, ঘটেনি এমন রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধানিবেদন।"[৬]

ব্রিগেডিয়ার ওসমান জান দিলেন, কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত রইল। হানাদারেরা ক্রমে পিছু হটতে হটতে পৌঁছে গেল কাশ্মীর রাজ্যের শেষ সীমান্তে।

আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কাশ্মীর সম্পূর্ণ পাকিস্তানী হানাদারমুক্ত হয়ে যাবে বলে আশা করতে লাগলেন ভারতীয় সমরবিশারদেরা। আর আশঙ্কা, পাকিস্তানী রাজনীতিবিদেরা।

তলব পেয়ে করাচীতে কায়েদে-আজমের প্রাসাদে সাক্ষাৎ করতে এলেন ডগল্যাস গ্র্যাসী।

একটা কথা বলা হয়নি। দেশ বিভাগের সময় দু'পক্ষের সম্মতি অনুসারে স্থির হয়েছিল যে, ভারত ও পাকিস্তান যত দিন না সামরিক বিভাগ দুটি সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারছে, ততদিন দু'দেশেরই সামরিক সর্বাধিনায়ক হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবেন সুপ্রীম কমান্ডার-ইন-চীফ জেনারেল অকিনলেক। তাঁর অধীনে থাকবেন দু'জন পৃথক সেনাপতি—সার রব লকহার্ট এবং ডগলাস গ্র্যাসী—যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানের কমান্ডার-ইন-চীফ হিসাবে।

গভর্নর জেনারেলের আহ্বানে তাই হাজির হলেন সি-ইন-সি ডগলাস গ্র্যাসী।

কায়েদে-আজম ঘোষণা করলেন তাঁর ফরমান : অবিলম্বে পাকিস্তানের সব সৈন্য নিয়ে কাশ্মীরে যুদ্ধ যাত্রা করতে হবে। সেখানে এখন ভারতীয় সৈন্যদল অনধিকার প্রবেশ করে মুসলিম-অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে অত্যাচার করছে।

গ্র্যাসী বললেন, য়োর এক্সেলেন্সি! আপনার আদেশই চূড়ান্ত। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে। কিন্তু আপনি যা আদেশ করছেন তা মিলিটারি-অর্ডার! আমি তো জেনারেল অকিনলেকের অধীনস্থ সেনাপতি। আদেশটা তাঁর মারফতে না পেলে...

—অল রাইট! তাঁকে জানিয়ে দিন আমার ইচ্ছা এবং অর্ডারের কথাটা।

গ্র্যাসীর টেলিগ্রাম পেয়ে বিমানযোগে জেনারেল অকিনলেক তড়িঘড়ি ছুটে এলেন লাহোরে। জিন্নাকে বললেন, দেখুন য়োর এক্সেলেন্সি—হানাদারদের গোপনে যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে

pathagar.net

সাহায্য করা এক জিনিস আর প্রকাশ্যে পাকিস্তানী ফৌজ নিয়ে কাশ্মীর আক্রমণ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। সেটা তো দুই রাষ্ট্রের প্রকাশ্য সম্মুখ যুদ্ধ!

জিন্না বললেন, সো হোয়াট? হিন্দুস্তানের ফৌজ এসেছে হিন্দু রাজাকে রক্ষা করতে, পাকিস্তানী ফৌজ যাবে সেখানকার মুসলমান প্রজাদের রক্ষা করতে।

অকিনলেক বললেন, কাশ্মীররাজ দলিলে স্বাক্ষর করে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে যোগ দিয়েছেন। সেটাই ছিল ভারত-ভাগের সূত্র। ফলে কাশ্মীর এখন আইনসঙ্গতভাবে ভারতের অঙ্গ। আপনার তো সেখানে সৈন্য পাঠাবার কোনো আইনত অধিকার নেই।

জিন্না গর্জে ওঠেন, আইন! আইন! আইন! হায়দরাবাদের নিজাম তো ভারতে যোগ দেবার স্বাক্ষর দেয়নি? সেখানে কেমন করে ঢুকে পড়ল ভারতীয় ফৌজ? সেটা বেআইনি নয়?

অকিনলেক বললেন, য়োর এক্সেলেন্সি! আপনি ব্যারিস্টার, আমি সামান্য সৈনিক। আমি আপনাকে আইন কী শেখাব? কিন্তু ভারত-বিভাগের শর্ত অনুযায়ী তো হায়দরাবাদের নিজাম অটোমেটিক্যালি ভারতভুক্ত হয়ে যাবেন। তাঁর চতুঃসীমান্তেই তো ভারতরাষ্ট্র! তাই নয়?

জিন্না গম্ভীর হয়ে বলেন, তাহলে আপনি বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাকে কী পরামর্শ দেন? কীভাবে আমরা কাশ্মীরী মুসলমানদের ধনপ্রাণ রক্ষা করব?—হিন্দুস্থানী হানাদারদের হাত থেকে?

অকিনলেক বুঝতে পারেন যে, জিন্না ব্যাপারটা বুঝেও বুঝতে চাইছেন না। তাই বললেন, আপনি পরামর্শ চাইলেন, তাই বলছি—এক্ষেত্রে আপনি লর্ড মাউন্টব্যাটেন আর ভারতের প্রাইম মিনিস্টারকে লাহোর বা করাচীতে নিমন্ত্রণ করে পাঠান। যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে তা 'অ্যাক্রস্ দ্য টেব্‌ল' সমাধানের চেষ্টা করুন।

অগত্যা তাই।

দিল্লিতে মন্ত্রিসভায় উপস্থাপিত হল পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের আমন্ত্রণলিপি। প্যাটেল বললেন, সমস্যা কিসের? কাশ্মীরের হামলা? সেটা তো করেছে পাকিস্তানী-উদ্যোগে কিছু হানাদার! হানাদারদের পাকিস্তান ফেরত নিয়ে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ নিয়ে আলোচনার কী আছে!

লর্ড মাউন্টব্যাটেন কিন্তু আপসের জন্য ব্যগ্র। তিনি বললেন, একথা অনস্বীকার্য যে, দু'-পক্ষেই বহু প্রাণ অহেতুক নষ্ট হচ্ছে। আলোচনার মাধ্যমে সেটা যদি বন্ধ করা যায়, তাহলে আমাদের তা চেষ্টা করে দেখা উচিত।

প্রধানমন্ত্রী জবাহরলালও তাতে সায় দিলেন। কিন্তু প্রবল আপত্তি জানালেন মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যেরা। তাঁরা বললেন, জিন্না পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল। তাঁর আহ্বানে ভারতের গভর্নর জেনারেল করাচী যেতে পারেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সেখানে যাওয়া শোভন হবে না।

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই হল।

pathagar.net

পশ্চিম পাঞ্জাবের লাটপ্রাসাদে দুই রাষ্ট্রের গভর্নর জেনারেল বসলেন মুখোমুখি। সৌজন্য বিনিময়ের পর জিন্না-সাহেব বললেন, ভারত সরকার অতর্কিতে কাশ্মীরে যে সৈন্য পাঠাতে যাচ্ছে একথা তো পাকিস্তানকে জানানো হয়নি? কেন?

মাউন্টব্যাটেন বললেন, এটা ফ্যাক্ট নয়। মন্ত্রীদের যে-সভায় বিমানে সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেই সভা থেকে বেরিয়ে এসেই নেহরু খবরটা জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কাউন্টারপার্টকে। কেন, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী আপনাকে সে-কথা তখন জানাননি?

জিন্না আবার সেই একই যুক্তি পেশ করলেন, পররাজ্যে ভারত সরকার সৈন্য পাঠায় কোন অধিকারে?

মাউন্টব্যাটেনও দিলেন একই জবাব, পররাজ্য নয়, ইনস্ট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশন মোতাবেক কাশ্মীর বর্তমানে ভারতের অন্তর্গত। সে শর্ত তো আপনারা ভারত-বিভাগের আগেই মেনে নিয়েছিলেন, তাই না?

—তার মানে কাশ্মীরের পঁচিশ লক্ষ মুসলমানের জানমানের কোনো মূল্য নেই?

—আছে! ঠিক যেমন আছে দুই পাকিস্তানে আটক-পড়া কয়েক কোটি হিন্দুর জানমানের মূল্য। প্রথমটির জিম্মাদারী ভারতের, দ্বিতীয়টি আপনার।

জিন্না বললেন, দেখুন, য়োর লর্ডশিপ, কাশ্মীরের 'ভারতভুক্তি' আমরা কোনোকালেই মেনে নেব না। এ শুধু বল প্রয়োগ, শুধু গায়ের জোরে দেশটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা।

মাউন্টব্যাটেন বললেন, খুব সত্য কথা। তবে বল প্রয়োগ এবং গায়ের জোর খাটাতে চাইছে হানাদারেরা। তারাই আক্রমণকারী। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ধরা পড়েছে বা মারা গেছে তাদের কাছে পাওয়া গেছে পাকিস্তানী ফৌজিদের অস্ত্রশস্ত্র। এটার ব্যাখ্যা কে দেবে?

জিন্না গুম খেয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল লর্ড মাউন্টব্যাটেন বেশ বদলে গেছেন। ভারত বিভাগের আগে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানের সপক্ষে বরাবর যুক্তি দেখাতেন। এখন কিন্তু তিনি পুরোপুরি ভারতের গভর্নর জেনারেল।

জিন্না এবার বাধ্য হয়ে অন্য যুক্তি পেশ করলেন, আচ্ছা বেশ, আসুন একটা মিটমাটের চেষ্টা করা যাক। দু'পক্ষই অবিলম্বে একই সঙ্গে কাশ্মীর থেকে সৈন্যসামন্ত সরিয়ে নিক।

মাউন্টব্যাটেন ছদ্ম বিস্ময় দেখিয়ে বললেন, সেটা কেমন করে হবে কায়েদে-আজম সাহেব?

—কেন হবে না? অসুবিধাটা কী?

—ভারতের প্রধানমন্ত্রী আদেশ করলে ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মীর ত্যাগ করে যাবে। কিন্তু আপনারা আদেশ করবেন কাকে? কাশ্মীরে তো অফিশিয়ালি কোন পাকিস্তানী সৈন্য নেই। আপনার আদেশ ওই হানাদারেরা মানবে তো?

জিন্না বললেন, সেটা আমার দায়িত্ব। আপনি ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করুন। আমি কথা দিচ্ছি, হানাদারদের হামলা থামাবার ব্যবস্থা আমি করব।

মাউন্টব্যাটেন একটু হেসে বললেন, দেখুন কায়েদে-আজম, আমি ভারতের নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর জেনারেল মাত্র। মন্ত্রিসভাকে পরামর্শই দিতে পারি শুধু। আপনি

pathagar.net

যেমন 'কথা দিতে' পারছেন আমি তা পারি না।

—বেশ তো! আপনি আপনার পরামর্শটাই ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দিন। আমি যতদূর জানি, আপনার পরামর্শই তাঁর কাছে হাদিশ!

মাউন্টব্যাটেন আবার হেসে বললেন, তাই নাকি? তা বেশ, সেই পরামর্শই আমি দেব ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু একটি শর্তে—

—শর্ত! কী শর্ত!

—আমাদের যা কথোপকথন হল, তা আমি ওয়ার্ল্ড প্রেসকে জানিয়ে দেব। অর্থাৎ আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—ভারত সৈন্য প্রত্যাহার করলে আপনি হানাদারদের ফিরিয়ে নেবেন। ইন ফ্যাক্ট, এ বিষয়ে আপনি 'ওয়ার্ড অব অনার' দিয়েছেন!

জিন্না গম্ভীরভাবে বললেন, তা কী করে হয়? আমাদের যা কথোপকথন হল তা তো নিতান্ত গোপনীয়। আপনি তা প্রেসকে জানাতে পারেন না। তাহলে ওয়ার্ল্ড প্রেস বলবে : হানাদারেরা আমাদেরই লোক। আপনি গোপনীয়তা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

—মানলাম। কিন্তু কথাবার্তা কী হল তা তো আমাকে বলতে হবে ফিরে গিয়ে। শুধু পণ্ডিত জবাহরলালকে নয়, সর্দার প্যাটেলকেও। তাঁরা তো গোপনীয়তা রক্ষার কোনও প্রতিশ্রুতি আপনাকে দেননি। দিয়েছেন?

—তার মানে আপনি চান না সমস্যার কোন সমাধান হোক?

মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, তার মানে তা মোটেই নয়। আমি শুধু আপনাকে বলতে চাইছিলাম—সমস্যা সমাধানের একটাই পথ। আর সেটা শুধু আপনার হাতে।

ওঁরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আন্তরিক হৃদ্যতায় নয়, রাজনৈতিক সৌজন্য মোতাবেক ভদ্রতায়।

স্বীকার্য, লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং জেনারেল অকিনলেকের সঙ্গে জিন্না-সাহেবের কথোপকথন আমি যে ভাষায় লিখেছি, তা ঔপন্যাসিক সত্য মাত্র। কোনো টেপ-রেকর্ডারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মোতাবেক নয়। কিন্তু এ বিষয়ে পরবর্তীকালে যেসব 'রিপোর্টাজ' রচিত হয়—ই. এফ. নাইট-এর *হোয়্যার থ্রি এম্পায়ার্স মীট,* বিলিয়াম এডওয়ার্ডসের *রেমিনিসেন্স অব এ বেঙ্গল সিভিলিয়ান,* ক্যাম্পবেল জনসনের *মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন* এবং যাযাবরের *ঝিলম নদীর তীর* প্রভৃতি সূত্র থেকে এর যাথার্থ প্রতিষ্ঠা করা চলে।

কিন্তু এরপর আমাকে যা লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে তার কোনো কার্যকারণ সূত্র, তার কোনো প্রামাণিক দলিল আমার হাতে নেই। তবু এটা ঐতিহাসিক তথ্য এবং চিরন্তন সত্য :

লর্ড মাউন্টব্যাটেন-সাহেব ভারতে ফিরে এলেন। ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তিনি কোনো লিখিত রিপোর্ট দাখিল করেননি। শুধু প্রধানমন্ত্রীকে জনান্তিকে ডেকে এনে জিন্নার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছিলেন। সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষে মাউন্টব্যাটেন নেহরুজিকে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন—আদৌ কোনো পরামর্শ বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন

pathagar.net

কি না তার কোনো প্রমাণ নেই। কোনো দুঃসাহসিক সাংবাদিক এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারেননি। সমকালীন গুজবে কান না দিয়ে ঐতিহাসিক তথ্যটুকুই এখানে পরিবেশন করা যেতে পারে।

মন্ত্রিসভার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী 1949-এর জানুয়ারি মাসে ভারতীয় সৈন্যদের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করলেন। কাশ্মীর সমস্যাটি তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রেরণ করলেন এই অনুরোধ করে যেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে সেখানে গণভোট গ্রহণ করা হয়। এ সিদ্ধান্ত ভারত-বিভাগ সনদের শর্তানুযায়ী নয়। শর্তানুসারে কাশ্মীর নিরঙ্কুশ ভারতের।

কাশ্মীর থেকে ভারতীয় সৈন্য অপসৃত হল। হানাদারেরা সুযোগ বুঝে আবার খানিকটা ফিরে এল। তারপর একটা নিয়ন্ত্রণ-রেখা বরাবর দুই সৈন্যদল ঘাঁটি গাড়ল।

নেহরুজি এই সিদ্ধান্ত নেবার ঠিক পরেই মাউন্টব্যাটেন সস্ত্রীক বিলেতে ফিরে গেলেন। তাঁর শূন্য গদিতে নেহরু এবার বসিয়ে দিলেন রাজা গোপালাচারীকে।

দুর্জনে বলে—ওই 'মাজু ওয়ে সুঞ্চামি' মন্ত্রবলে!

গান্ধীজি ঠিক তার একবছর আগে নিহত হয়েছেন। নেহরু-শাসিত ভারতে তিনি সাড়ে পাঁচ মাস জীবিত ছিলেন। তার ভিতর কোনো রাষ্ট্রীয় উৎসবে যোগদান করেননি। কোনো পরামর্শও দেননি। না, ভুল হল—একটিমাত্র পরামর্শ তিনি নেহরুজিকে দিয়েছিলেন : কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দিয়ে গ্রাম-পঞ্চায়েতের নির্বাচন-মাধ্যমে স্বরাজকে রূপায়িত করতে।

নেহরু কর্ণপাত করেননি বুড়ো-হাবড়াটার কথায়।

কাশ্মীর-সুন্দরীকে পিছন থেকে ছুরিকাঘাতের সময় গান্ধীজি অবশ্য জীবিত ছিলেন না, কিন্তু রামমনোহর লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণ, স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতারা ছিলেন। নেহরু এতবড় সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে তাঁদের কারও সঙ্গে কোনো আলোচনা করেননি। মন্ত্রিসভার বিশিষ্ট সদস্য—সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, শ্যামাপ্রসাদ, লালবাহাদুর প্রভৃতি তো এ প্রস্তাবের সরাসরি ঘোরতর বিরুদ্ধতা করেছিলেন। নেহরু ভারতের ডিক্‌টেটর ছিলেন না, হিটলার বা ইদি আমিনের মতো। তবু একক সিদ্ধান্তে তিনি এই মহান কীর্তিস্তম্ভটি ভারতের বুকে গেড়ে দিয়ে গেলেন : যদিচ ভারত-বিভাগের সূত্রানুসারে—রাজা হরি সিং-এর স্বাক্ষর মোতাবেক, কাশ্মীর ভারতের অন্তর্গত রাজ্য।

বিগত পঞ্চাশ বছরে ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী স্বাধিকারপ্রমত্ততার এতবড় নিদর্শন—একমাত্র ওঁর দৌহিত্রের শাহ্‌বানুর জেতা-কেস হারিয়ে দেওয়া অথবা কন্যার 'অপারেশন ব্লু-স্টার' ব্যতিরেকে—এমন কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করতে পারেননি।

আর যাই দোষ থাক, নেহরু অন্তত নির্বোধ ছিলেন না। ইন্দিরা গান্ধী কেন 'অপারেশন ব্লু-স্টারে'র সর্বনাশা পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তার অর্থ বোঝা যায়; রাজীব গান্ধীর মতো বিলাতে শিক্ষিত প্রগতিবাদী মানুষ কেন শাহ্‌বানুর জেতা-কেস হারিয়ে দিলেন তার যৌক্তিকতা প্রণিধান করা যায়। কিন্তু পণ্ডিত জবাহরলাল কোন উদ্দেশ্যে, কীসের প্রলোভনে পড়ে সর্দার বল্লভভাই-এর জেতা-কেস হারিয়ে দিলেন তার কোন্ ব্যাখ্যা নেই!

pathagar.net

কেন? কেন? কেন?

জবাব নেই।

ভারতীয় প্রেস রুদ্ধবাক। শুধু কিছু ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী চুপ করে থাকতে পারলেন না। বিদূষকের মৌনতা নামঞ্জুর। বিদূষককে কাঁদতেও নেই। বন্ধুবর চণ্ডী লাহিড়ীও তেমনি সেসময় নিষ্কর্মা দর্শক হতে স্বীকৃত হননি। তাঁর কার্টুনের ক্যাপশন ছিল :

The Tale of a Tail.

ব্যাখ্যায় শ্রীলাহিড়ী লিখেছিলেন—চাইনীজ ইংকে কি চোখের জলে— জানি না :

When the Indian army drove away the invaders and captured most of the strategic points, Nehru suddenly called a halt. Thus he kept the Kashmir question alive when it could have been buried permanently. (ভারতীয় ফৌজ হানাদারদের বিতাড়িত করে কাশ্মীরের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটির অধিকাংশই যখন দখল করে নিয়েছে, তখনই এসে গেল নেহরুজির বেমক্কা ফরমান : 'রোখ যাও!' ঠিক যখন কাশ্মীর-সমস্যা চিরতরে কবরস্থ হতে চলেছে, তখনি এভাবে তাকে কবর থেকে টেনে তুলে চিরজীবী করা হল।)

এরপর দীর্ঘ পনের বছর জীবিত ছিলেন মতিলাল-তনয়। গদি আঁকড়ে। সেই পনের বছরে তিনি নানান কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করে গেছেন। একদিকে বান্দুং সম্মেলন, পঞ্চশীল, হিন্দি-চীনী-ভাই-ভাই,—অপরদিকে চীনের কাছে গো-হারান হারার সব দায়িত্ব কৃষ্ণ মেননের স্কন্ধে চাপিয়ে নিজের গদি বাঁচানো। একদিকে শাহ্ নওয়াজ কমিশন গঠন, তাঁকে রেলমন্ত্রিত্ব দিয়ে পুরস্কৃত করা—অপরদিকে আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর জীবিত সৈন্যদের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে পুনঃপ্রবেশের অধিকার প্রত্যাখ্যান করে। একদিকে পাকতুনিস্তান থেকে আসা ডেলিগেশনকে ইন্টারভ্যু না দিয়ে, অপরদিকে সীমান্ত গান্ধীকে পাকিস্তান জেলে পুরেছে শুনে হঠাৎ 'স্থিতপ্রজ্ঞ' হয়ে যাওয়ায় : 'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা'! শেখ আবদুল্লা শ্যামাপ্রসাদকে বন্দী করেছে শুনে নেহরুজি পুনরায় স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে পড়েন।—'সুখেষু বিগতস্পৃহ' কিনা, খোদায়মালুম। অবশ্য শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু পর্যন্ত 'স্থিতপ্রজ্ঞ' থাকার পর তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ-জননীর কাছে। টেলিগ্রাম পাঠিয়ে।

পণ্ডিতজির দেড়-দশক ভারত শাসনের এইসব উজ্জ্বল অধ্যায়গুলি সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করতে হলে আমাকে আবার একখানা কেতাব লিখতে হবে। নেহরুজির চিতাভস্ম আমরা একটি চার্টার্ড প্লেনে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছি। এজন্য রাজকোষ থেকে বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। তা হোক, তবে দুর্ভাগ্যবশত সেই চিতাভস্ম মাটিতে না ফেলে ফেলা হল নদীতে। মাটিতে ফেললে হয়তো জমি কিছুটা উর্বর হত। হল না। সবটাই জলে গেল।

'নেহরু-জমানা' বহু অতীতের কাহিনী। 'নেহরু ডাইনেস্টি'র স্বাভাবিক অবসান ঘটেছে। গান্ধীজির পরামর্শ উপেক্ষা করলেও তাঁর নির্দেশটি আমরা পরোক্ষভাবে মেনে নিয়েছি।

pathagar.net

কংগ্রেসকে প্রথমে তাঁর কন্যা দু'টুকরো করেন। পরে মোরারজি প্রভৃতিরা আরও সেটাকে 'কিমা'য় পরিণত করেন। বর্তমানে তা প্রায় নিশ্চিহ্ন। এক অনভিজ্ঞা বিদেশিনীর আঁচল-আড়ালে বোফর্স-গর্জনের আতঙ্কে সে বংশপ্রদীপ আজ নিবু নিবু।

মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপনে সেই 'ভারতরত্নের সবকটি রত্নই আজ খোয়া গেছে।

শুধু তাঁর এই মহান কীর্তিটির মৃত্যু নেই। কাশ্মীর-সুন্দরীকে তিনি যে 'জহরব্রত' পালনে বাধ্য করেছিলেন, সেই চিতার আগুন আজ পঞ্চাশ বছর ধরে অনির্বাণ শিখায় ধিকি-ধিকি জ্বলছে। আসমুদ্রহিমাচলের জওয়ান সেই আগুনে তাজা বুকের রক্তে আজও ঘৃতাহুতি দিয়ে চলেছে।

বুদ্ধদেবের জাতক-কাহিনী, বিষ্ণু শর্মার পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশ, ঈশপের ফেবল্‌স-এর মতো পণ্ডিতজির ওই অনবদ্য কাহিনীটিও চিরকাল মানুষের মুখে মুখে ফিরবে। নাতিরা দাদুর কোলে বসে শুনতে চাইবে সেই 'জহরব্রতের কিস্‌সা'!

বলবে : Please tell us again that TALE OF A TAIL. □

1. *Since Freedom,* Chandi Lahiri, New Central Book Agency, 1994, Pg. 2.
2. *Amrita Bazar Patrika,* Sarat Chandra Bose. See details in *Struggle for Freedom,* Bharatiya Vidya Bhawan, P. 644.
3, 4, 5. *ঝিলাম নদীর তীরে,* যাযাবর, 1970, New Age Publishers, Calcutta.

কৃতজ্ঞতা : শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী।

pathagar.net

বন্দিপুরের পণবন্দি

স্থান : বন্দিপুরের বি. এস. এফ. আবাসন
কাল : তেরই জুলাই, ১৯৯৯, রাত্রি দুটো
পাত্র : না, পাত্র নয়—পাত্রী : মুমু—মুন্নি মুনিয়ারাজান্না

।। এক ।।

বন্দিপুর কাশ্মীরে। শ্রীনগরের আশি কিলোমিটার উত্তরে খাড়া পাহাড়ের সানুদেশে এক জনবিরল বসতি। তারই একপ্রান্তে এই বি. এস. এফ, আবাসন। চারিদিকে উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। একটাই প্রবেশদ্বার। তার পাশে বাঙ্কার-গুমটি। সেখানে অতন্দ্র প্রহরায় মেশিনগান হাতে দুজন প্রহরী। নিরাপত্তারক্ষী। প্রতি আট ঘণ্টা অন্তর তাদের ডিউটি বদল হয়। ভিতরে এ. বি. সি. টাইপ অনেকগুলি বাড়ি। সবই দ্বিতল, পাথরের দেওয়াল, অ্যাসবেস্টসের ছাউনি। শুধু মাঝখানে ফ্ল্যাগস্টাফের বিপরীতে একটি ত্রিতল বাড়ি। সেটার একতলায় সেন্ট্রাল অফিস, উপরের দুটি তলায় বাস করেন দু'জন অফিসার। ডি. আই. জি. শিশির কুমার চক্রবর্তী। বাঙালি। ত্রিপুরায় বাড়ি। আর ডেপুটি কমান্ডান্ট হরিন্দর রাজ। কমান্ডান্ট আছেন ছুটিতে। কারগিল যুদ্ধ থেমে যাবার পর।

আবাসনের প্রবেশপথের বাঁ-দিকে প্রথম সি. টাইপ দ্বিতল বাড়িটায় বাস করেন ছয়টি পরিবার। রাস্তার দিকে একতলার প্রথম কোয়ার্টার্সটা কনস্টেবল মহাদেবন মুনিয়ারাজান্নার। ছোট্ট দু'কামরার ফ্ল্যাট। দুই মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর 'ছোট পরিবার—সুখী পরিবার'। আদি নিবাস অন্ধ্রপ্রদেশে —এখানে বদলি হয়ে এসেছেন বছরখানেক। কারগিল যুদ্ধ শুরু হবার অনেক আগেই। এখন তো যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। গতকাল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ পাকিস্তানী সৈন্যদের সীমান্তের ওপারে ফিরে যাবার আদেশ ঘোষণা করেছেন পাক টি.ভি.-তে।

ঘটনার দিন—ওই তেরই জুলাই— নৈশাহার মিটতে ওঁদের বেশ রাত হয়েছে। বিশেষ কারণ ছিল। আজ ওঁর ছোট মেয়ে মুন্নিমাঈয়ার দশম জন্মদিন। সন্ধ্যারাত্রে মুন্নির কয়েকজন বন্ধুবান্ধবীর নিমন্ত্রণ ছিল। সন্ধে থেকে সাজুগুজু করে মুমু সবাইকে আপ্যায়ন করেছে। 'মুন্নি' ওর ঠিক নাম নয়। বাংলায় যেমন সব বাচ্চা মেয়েই 'খুকি'। তাই সবাই ডাকে পুরো নামটার আদ্য অক্ষর দুটি যুক্ত করে। প্রতিবেশীরা নানান উপহার দিয়েছে ওর জন্মদিনে। মায়ের পূর্ব নির্দেশমতো মুমু সবাইকে 'থ্যাঙ্কু' বলেছে। আর মিস্ নাইটিঙ্গেলের শিক্ষা-মোতাবেক ফ্রকের দুই প্রান্ত দু'হাতে ধরে ফরাসী কায়দায় 'বাও' করেছে। মিস্ পামেলা নাইটিঙ্গেল ফরাসি। স্থানীয় সেন্ট অ্যাগনেস্ চার্চের নান এবং চার্চ পরিচালিত

pathagar.net

স্কুলের শিক্ষিকা। সেই স্কুলেই পড়ে ওরা দুই বোন। মুমু আর তিন বছরের বড় দিদি, পুষ্পা। মিস্ পামেলারও নিমন্ত্রণ ছিল—মস্ত একটা ডল-পুতুল উপহার দিয়েছেন তিনি। শুইয়ে দিলে সেটা চোখ বোজে, আর বসিয়ে দিলে প্যাটপেটিয়ে তাকায়। পুতুলটা পেয়ে মুন্নিমাঈ ভারি খুশি। মিস্ পামেলা সাইকেলে চেপে এসেছেন। চার্চ খুব কাছেই। আধ কিলোমিটার হয়-কি-না-হয়। কিন্তু নৈশ আহার শেষ হতে-না-হতেই বেজে উঠল সাইরেন। গোটা এলাকাটায় হয়ে গেল ব্ল্যাক-আউট। কে জানে, হয়তো উত্তর দিক থেকে কোনও বিমান-আক্রমণের অশুভ সংকেত। একে তারিখটা 'তের', তায় ঘোর অমাবস্যা। মহাদেবন তাই মিস্ পামেলাকে আটকে দিয়েছে। চার্চে টেলিফোন করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আজ রাতের মতো সিস্টার পামেলা বি. এস. এফ. আবাসনেই থেকে যাবেন।

দু'কামরার ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট। বাইরের ঘরে থাকে দুই বোন। ভিতরের ডবল-বেড খাটে শোয় সস্ত্রীক মহাদেবন। আজ বাইরের ঘর থেকে একটা নেয়ারের খাটিয়া ভেতরের ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। গোটা বাইরের ঘরটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সিস্টারকে।

সন্ধ্যারাত্রে কত হই-চই। কেক ঘিরে দশটি মোমবাতি। জোরসে ফুঁ দিয়েও একবারে সবগুলো মোমবাতি নেভাতে পারল না মুন্নি। তিন-চারবার ফুঁ পাড়তে হল। তারপর সবাই মিলে শুরু করে দিল : 'হ্যাপি বার্থ ডে টু য়ু—'

শীতের দেশ। বাইরে এই জুলাই মাসেও বেশ ঠাণ্ডা। তাই সব কাচের জানলায় ভারি পর্দা টানা। ভিতরটা ঘনান্ধকার। আবার মোমবাতি জ্বালা হল। ক্যান্ডেল-স্টিক ডিনার। সব রান্নাই করেছে ভারতী—মুমুর মা। অন্ধ্রের মেয়ে, কিন্তু যত্ন নিয়ে উত্তর ভারতের এবং পাঞ্জাবি-খানা পাকানো শিখেছে। আজ সকাল থেকে তাই ভারতীর কাজের বিরাম ছিল না। পুষ্পাও ওকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। তরকারি কুটে দেওয়া, কড়াইশুঁটি ছাড়িয়ে দেওয়া। অবশ্য কেকটা বাজার থেকে কিনে আনা। মহম্মদ ইয়াসিনের কনফেকশনারি থেকে। ইয়াসিন মুন্নিকে চেনে। তাই নিজে থেকেই কেকের ওপর রঙিন ক্রিম দিয়ে লিখে দিয়েছে : হ্যাপি বার্থ ডে টু মু-মু। এছাড়া পুডিংটা বানিয়ে এনেছিলেন নাথানিয়েল, আর ফিরনিটা সাকিনা-আম্মা। একতলায় পাশাপাশি তিনটি অ্যাপার্টমেন্ট। তিনটি পরিবার। মাঝখানে মুসলমান, এপাশে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান ; আর রাস্তার দিকে মহাদেবনের হিন্দু পরিবার। সেনাবাহিনীতে জাতপাতের কোনো ছুঁৎমার্গ নেই। ক্যাম্পাসে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু। তাদের একটি 'মহাবীরজি'র মন্দির আছে, ক্যাম্পাসের ভিতরেই। শিখদের গুরুদ্বার'টি আছে কাছেই—উধমপুরে। ক্যাম্পের বাইরে। শিখদের বড় উৎসবে সবাই সেখানে দল বেঁধে যায়। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সেন্ট অ্যাগনেস্ চার্চ ক্যাম্পাসের আধ কিলোমিটার দূরে— যেখান থেকে মুমুর জন্মদিনে যোগ দিতে এসেছেন সিস্টার নাইটিঙ্গেল।

রাত দশটা নাগাদ আহারাদি মিটল। তখনো ব্ল্যাক-আউট শেষ হয়নি। ঘোর অন্ধকারে পথে নামা বিপজ্জনক। এমন দুর্ঘটনার জন্য কেউই প্রস্তুত হয়ে টর্চ হাতে আসেনি।

পুষ্পা হঠাৎ ধরে পড়ল সিস্টার নাইটিঙ্গেলকে, আপনি একটা জমাটি গল্প বলুন, মিস্! গল্প শুনতে শুনতেই আলো জ্বলে উঠবে।

pathagar.net

সাকিনা-আম্মা বলেন, এমন অন্ধকার রাত্রে ভূতের গল্পই জমাটি হবে।

আপত্তি করল মুমু নিজে, ন্-না, ভূত-টুতের গল্প রাত্রিবেলা শুনলে আমার ঘুম আসে না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়।

ভারতী বলে, মিস্-দিদি, আপনার নিজের জীবনের কথা আমরা কোনদিন শুনিনি। আপনি ফরাসি-দেশের মেয়ে, চার্চে মেয়েদের পড়ান, এটুকুই জানি। কেমন করে আপনি এতদূর চলে এলেন সেই গল্পই বলুন।

ভারতী বা সাকিনা-আম্মা ওঁকে 'মিস্-দিদি' বলে ডাকে, যদিও নাইটিঙ্গেলের বয়স অনেক কম। ওদের তুলনায়।

মিস্ নাইটিঙ্গেল বলেন, আমার নিজের জীবনের কথা বলার মতো কিছু নয়। আমি বাল্যেই পিতৃমাতৃহীন। অর্ফানেজে মানুষ। স্বেচ্ছায় প্রভুর সেবাধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলাম। প্রথমে ছিলাম স্বদেশে, তারপর বছর পাঁচেক ছিলাম আফগানিস্তানে। প্রথমে কাবুলে, পরে গজনীতে। কিন্তু সেসব কথা বিস্তারিত বলার কিছু নেই। আমি বরং আর একজন মহিয়সীর গল্প শোনাই। নামটা আমি আগেভাগে বলে দেব না। আপনাদের গ্যেস করতে হবে। তাঁর গোটা জীবনের চুম্বকসার আমি ধীরে ধীরে বলে যাব। শোন :

আমেরিকান দার্শনিক-লেখক হেনরি ডেভিড থোরো একবার বলেছিলেন :

> If a man cannot keep pace with his companions, it is perhaps because he hears a different drummer. Let him step to the music that he hears, however measured or far away.

সাকিনা-আম্মা বলে, ম্যায় নহি সম্ঝি মিস-দিদি!

মিস নাইটিঙ্গেল পুষ্পার দিকে ফিরে বললেন, ক্যান য়ু ট্রানস্লেট ইট ইন প্লেন হিন্দি, পুষ্পা?

—লেট মি ট্রাই। হেনরি ডেভিড থোরো বলেছিলেন, 'যদি কোন মানুষ তার সহযাত্রীদের সঙ্গে ঠিক পায়ে-পা মিলিয়ে চলতে না পারে তখন তাকে দোষ দিও না। হয়তো সে কোনো অলক্ষ্য ড্রাম-বাদকের ভিন্ন তালের বাজনা শুনতে পাচ্ছে। তাকে তার নিজস্ব সঙ্গীতের তালে তালেই পা ফেলে চলতে দাও। হোক না সেটা ভিন্ন তালের, হোক না তা বহু দূরাগত!'

নাইটিঙ্গেল এবার সাকিনা-আম্মার দিকে ফিরে জানতে চান, অব্ সম্ঝি?

—থোড়া-সা! খ্যয়ের আপ্ কহানী বোল্তে যাইয়ে।

নাইটিঙ্গেল হেসে বললেন, প্রথমেই সবটা বুঝতে পারবেন না। কারণ থোরোর ওই কথাগুলো তো ভিন্ন তালে বাজছে। আমাদের জীবন ও-তালে চলে না। ঠিক আছে, গল্পটাই শুনুন :

সে অনেককাল আগেকার কথা। 1918-র শীতকাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যারা রণদামামা বাজিয়ে চলেছিল পুরো চার-চারটি বছর, তারা তাদের ড্রাম-বাজানো বন্ধ করেছে। য়ুরোপের

pathagar.net

মহারণাঙ্গণে নেমে এসেছে শ্মশানের স্তব্ধতা : All quiet on the Western Front, as well as on the Eastern. সেই পূর্বপ্রান্তের যুদ্ধক্ষেত্রে, যুগোস্লাভিয়ায়, একজন রণক্লান্ত সৈনিককে সেনাবাহিনী দেশে ফেরার অনুমতি দিলেন। প্রৌঢ় সৈনিকটি চার বছর ধরে ক্রমাগত শত্রুনিধন করে করে ক্লান্ত। কেন এই যুদ্ধ, তার কারণটা বেচারি বুঝে উঠতে পারেনি। তার বাড়ি ম্যাসিডোনিয়ার স্কোভিয়ে গাঁয়ে। ম্যাসিডোনিয়া হচ্ছে সেই রাজ্যটা, যেখান থেকে সেকেন্দার শাহ্ একদিন বিশ্বজয় করতে যাত্রা করেছিলেন। ওর কিন্তু বিশ্বজয়ের কোন বাসনা ছিল না। বাড়িতে আছে স্ত্রী আর চুন্নিমুন্নি এক মেয়ে—অ্যাগ্‌নেস—এই মুমুরই বয়সী। চার বছর পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবার আনন্দে সৈনিকটি দারুণ খুশি। ... কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস, গাঁয়ে পৌঁছনোর আগেই সৈনিকটি বেমক্কা খুন হয়ে গেল।

পুষ্পা হঠাৎ বলে ওঠে, কেন মিস্? যুদ্ধ তো তখন শেষ হয়ে গেছে!

—তা গেছে। এ শুধু ধর্মান্ধতার কারণে। যে লোকটা খুন করেছিল, সে হচ্ছে প্রোটেস্ট্যান্ট আর সৈনিকটি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক।

—কিন্তু ওরা দুজনেই তো খ্রিস্টান!

—হ্যাঁ, দুজনেই যাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে মেনে নিয়েছিলেন, তাঁর মূলমন্ত্র ছিল : ল্যভ্ দাই নেবার—প্রতিবেশীকে ভালবাস!

—তাহলে?

—এমনটাই হয়, পুষ্পা! তোমরা বড় হয়ে বরং দেখ, এমন দুর্ঘটনা আর যেন না ঘটে। দুজন খ্রিস্টান না হলেই বা কী? দুজনই তো ঈশ্বর-সৃষ্ট জীব : মানুষ। হোক না একজন হিন্দু, একজন শিখ, খ্রিস্টান অথবা মুসলমান।

—আপনি বরং গল্পটা বলুন। মুন্নির বয়সী ওই পিতৃহীন অ্যাগ্‌নেসের তারপর কী হল?

—তাগাদা দেন মিসেস নাথানিয়েল।

—হ্যাঁ, বলি। অ্যাগ্‌নেসের মাও মারা গেলেন কিছুদিন পরে। ও চার্চে যোগদান করল। উনিশ'শ আঠাশ সালে ও চলে আসে ভারতবর্ষে। তার ছেলেবেলার কথা কেউ লিখে রাখেনি। কিন্তু অ্যাগনেস ছিল অন্য ধরনের মেয়ে। দূরস্থিত কোন ড্রামবাদকের অন্য তালের একটা বাজনা ক্রমাগত তার মস্তিষ্কে অনুরণন তোলে। কে বাজায় ও জানে না। ঘুরতে ঘুরতে চলে এল কলকাতায়। ওর প্রথম নজর পড়ল, কলকাতার ফুটপাথে মরণাপন্ন অনাথদের উপর। তোমরা জান কি জান না, আমি জানি না—কলকাতা হচ্ছে ভারতের পূর্বপ্রান্তে মস্ত বড় একটা শহর। সেখানে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ফুটপাথে ওই ধরনের মুমূর্ষু রুগী বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। কর্পোরেশনের দায়—পচে ওঠার আগে সেই বেওয়ারিশ লাশটাকে পুড়িয়ে দেওয়া। অ্যাগনেসের সেটা বরদাস্ত হল না।

তিনি স্থির করলেন, সেইসব মুমূর্ষু 'তিন-কুলে-কেউ-নেই' রোগীদের একটা ছোট্ট হাসপাতালে নিয়ে এসে শুশ্রূষা করা, চিকিৎসা করা। বাঁচে না প্রায় কেউই, তবু জীবনের শেষ কটা দিন তারা সেবাপরায়ণা নার্সের হাতে সান্ত্বনা তো পায়! মৃত্যুর আগে কিছু

pathagar.net

সেবাপরায়ণার অশ্রুসজল দু'চোখ তো দেখতে পায়! সেটাই তার স্টিজিয়ান-শোরের (বৈতরণীর খেয়াঘাটের) শেষ পারানি-র কড়ি। এছাড়া শুরু হল একটা কুষ্ঠাশ্রম। যেসব কুষ্ঠরোগীকে সমাজ ত্যাগ করেছে, তাদের নিয়ে এসে সেবা-যত্ন করা। সহকর্মীদের সবাই যে খুশি হল তা নয়, কিন্তু অ্যাগ্‌নেসের ঘৃণা নেই— কোনো বিকার নেই। আবার অনেক সিস্টার এগিয়ে এল তাঁকে সাহায্য করতে। অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও অগ্রসর হয়ে এল তাঁর আর্থিক সাহায্যে। ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রতিষ্ঠান বিরাট হয়ে উঠল। তিনি সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পেতে শুরু করলেন। সম্মানও।

একদিন যে ছোট্ট মেয়েটি এই মুমুর মতো ক্লাসে পড়া মুখস্থ করত, এখন সে হয়ে গেল তাঁর প্রতিষ্ঠানের 'মাদার'। তার সহপাঠিনীরা যাকে 'সাফল্য' বলত, সেই জিনিসগুলো— হীরে-মোতি-পান্নার গহনা, বিরাট প্রাসাদ অথবা বাতানুকূল-করা লিমুজিন—তা তিনি পাননি। তবে হ্যাঁ, অন্য জাতের স্বীকৃতি পেয়েছেন। ভারত সরকার থেকে পেয়েছেন : 'ভারতরত্ন' খেতাব। বাইরে থেকে ম্যাগসেসাই, সব শেষে সর্বোচ্চ নোবেল পুরস্কার! সেসব বিপুল অর্থ তিনি ব্যয় করেছেন অনাথ এবং কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসায়, সমাজে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে। ওঁর সহপাঠিনীরা পেয়েছে প্রতিষ্ঠা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ঘর, বর, সন্তান...

না, ভুল হল। সন্তান 'মাদার'ও পেয়েছেন। অযুত-নিযুত। মহাভারতের সেই মাতা গান্ধারীকে লজ্জা দেওয়ার মতো লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি সন্তান।...কী মুমু! তুমি তাঁর নাম বলতে পার?

মুমু বলে, সার্টেনলি, মিস্! 'নোবেল পুরস্কারে'র কথা বলেই তো আপনি ধাঁধার সমাধানটা জানিয়ে দিয়েছেন। আপনি এতক্ষণ বলছিলেন যাঁর কথা, তিনি : মাদার টেরেজা!

—কারেক্ট! ফুল মার্কস্!

রাত তখন সাড়ে দশটা। তবু ব্ল্যাক-আউট চলছে। আর দেরি করা চলে না। দ্বিতলের বাসিন্দারা উপরে উঠে গেলেন। মুন্নির বাবা টর্চ জ্বেলে প্রতিবেশীদের এগিয়ে দিয়ে এলেন। সবাই কাছেপিঠে থাকেন। বি. এস. এফ. আবাসনের ভিতরেই। পরস্পরকে ওঁরা 'শুভরাত্রি' জানালেন। ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার রাত— তারিখটাও অশুভ : 'তের'। তা হোক, রাতটা 'শুভরাত্রি' হতে বাধা কী? বিশেষ, মুমু-মাঈয়ের জন্মদিন বলে কথা!

।। দুই ।।

গভীর রাত্রে কিসের শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল মহাদেবনের। দুই মেয়েকে দু'পাশে নিয়ে ভারতী শুয়েছে বড় খাটে। মহাদেবন শুয়েছিল ও-ঘর থেকে আনা নেয়ারের খাটে। ঘুমের জড়তা ভাঙলে মহাদেবনের মনে হল, শব্দটা ফায়ারিঙের। স্বপ্ন? রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িতে দেখল : রাত দুটো বেজে সাত। পাশের খাট থেকে ভারতী শুধায় : কীসের শব্দ হল বল তো?

—ও, তুমিও শুনেছ? স্বপ্ন নয় তাহলে! মনে হল মেশিনগানের!

—মেশিনগান! তোমার কি মাথা খারাপ? ক্যাম্পের ভিতর মাঝরাতে...

pathagar.net

মহাদেবন ততক্ষণে উঠে বসেছে। পা বাড়িয়ে অন্ধকারে সে চপ্পলজোড়া খুঁজছিল। নীরন্ধ্র অন্ধকার। নিজের হাতটাও দেখা যায় না। পুষ্পা ও মুন্নি তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে। মহাদেবন বললে, তোমার বালিশের পাশে টর্চটা আছে, দাও তো হাত বাড়িয়ে।

ভারতী বলে, দাঁড়াও, আমিই দেখছি।

অন্ধকারে মহাদেবনের মনে হল, ভারতী টর্চ হাতে জানলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পর্দাটা সরিয়ে টর্চের আলোয় সে বাইরেটা দেখতে গেল। সার্সিবদ্ধ পাল্লার ভিতর দিয়ে। পাঁচ সেলের জোরালো টর্চের আলো। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না হতভাগিনী। কারণ টর্চের সুইচে আঙুল ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বুকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগল। দু'চোখে ঘনিয়ে এল নীরন্ধ্র অন্ধকার। লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। টর্চটা কিন্তু নেভেনি। ওর হস্তচ্যুত হয়ে মেঝেতে আছাড়ি-পিছাড়ি লুটিয়ে আলোর অশ্রুধারায় সেটা অঝোরে কাঁদছে।

পরিস্থিতিটা সমঝে নিতে মুহূর্ত দেরি হল না মহাদেবনের। জাত সৈনিক সে। বুঝতে পারল, টর্চের আলো জ্বালামাত্র বাইরে থেকে কেউ ফায়ার করেছে। থ্রি-নট-থ্রি। ভারতী ভেসে যাচ্ছে রক্তের বন্যায়। ফিরেও তাকাল না মহাদেবন। সে ভোলেনি, এ ঘরেই ঘুমাচ্ছে তার তুই নাবালিকা কন্যা। প্রতিবর্তী-প্রেরণায় হুক থেকে রাইফেলটা পেড়ে নামাল। তার সেফ্‌টি ক্যাচটা সরাবার আগেই টর্চের প্রতিফলিত আলোয় মহাদেবনের নজর হল : পুষ্পা ঘুম-ঘুম চোখে মেঝে থেকে টর্চটা তুলে নিয়েছে। সম্মোহিতার মতো পায়ে-পায়ে জানলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মেঝেতে যে ওর মায়ের মৃতদেহটা পড়ে আছে, এটা সে তখনো জানে না। মহাদেবন চিৎকার করে উঠল। একটি মাত্র শব্দ। তেলুগুতে। যার অর্থ : 'যাস্‌নে'।

কিন্তু বোকা মেয়েটা—অথবা হয়তো বোকা সে নয়—ঘুমের জড়তা তার ভাঙেনি—সেও পর্দাটা সরিয়ে বাইরেটা আলো ফেলে দেখতে চাইল। সেও পারল না। কারণ তার আগেই চিতাবাঘের মতো লাফ দিয়ে উঠে মেয়েকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে তার বাবা।

এবার শোনা গেল স্টেনগানের নিরবচ্ছিন্ন খ্যাটা-খ্যাটা-খ্যাটা-খ্যাটা...

তার আগেই বাপের বাঁ-হাতের ধাক্কা খেয়ে পুষ্পা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মায়ের মৃতদেহের ওপর। মহাদেবন ফিরেও তাকাল না। তার মনে হল, পাঁজরের বাঁদিকে কে যেন একটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরোকে চিমটে দিয়ে চেপে ধরেছে। অসহ্য যন্ত্রণা! কিন্তু সৈনিক সে। ইতিমধ্যে তুলে নিয়েছে তার রাইফেল। বাইরে নিকষ-কালো অন্ধকার। কিন্তু সেই অন্ধকারের বিশেষ একটি বিন্দু থেকে স্টেনগানের আলোর ফুলকি একটি অর্ধবৃত্ত রচনা করে চলেছে। সেই অর্ধবৃত্তের কেন্দ্রের দিকে স্থির লক্ষ্যে রাইফেলটা ধরে মহাদেবন দুটো ঘোড়াই একসঙ্গে টেনে দিল। তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল স্টেনগানের বাচালতা।

মহাদেবন এতক্ষণে বুঝেছে বুলেটটা তার হৃদপিণ্ডে বিদ্ধ হয়েছে। মৃত্যু আসন্ন। সে একবার খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে চাইল। কোথায় আকাশ? অ্যাসবেস্টসের সিলিং। এতক্ষণে জীবনসঙ্গিনীর কথা মনে পড়ল তার। বিশ বছরের জীবনসঙ্গিনী। অস্ফুটে তেলুগু ভাষায় বললে, 'রতি! তোর মরদ কিন্তু মরার আগে বদলাটা নিতে পেরেছে রে।'

লুটিয়ে পড়ল তার মৃতদেহ ধর্মপত্নীর রক্তাপ্লুত শবের ওপর।

BanglaBook.org

পাশের ঘর থেকে ততক্ষণে উঠে এসেছেন সিস্টার নাইটিঙ্গেল। এক লহমায় পরিস্থিতিটা তিনি সম্‌ঝে নিলেন। ওরা স্বামী-স্ত্রী মারা গেছে। আর পুষ্পা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। ওদিকে মুন্নি ততক্ষণে উঠে বসেছে বিছানায়। সিস্টার ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছোট্ট মুন্নির ওপর। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন খাটের ওদিকে— জানলার বিপরীতে।

গোটা আবাসন ততক্ষণে জেগে উঠেছে। বিপদসূচক পাগলাঘণ্টি বেজে চলেছে একটানা। প্রতিটি সৈনিক মুহূর্তে পোশাক বদলিয়ে নিজ নিজ আগ্নেয়াস্ত্র বগলদাবা করেছে। তাদের পরিবারের সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে জড়াজড়ি করে বসেছে। কী যে ঘটেছে কেউ জানে না। তবে রাইফেল, থ্রি-নট-থ্রি অথবা স্টেনগান, AK-47-এর শব্দ চিনে নিতে ওদের ভুল হয় না।

।। তিন ।।

ফ্ল্যাগস্টাফের বিপরীতে অফিসার্স-কোয়ার্টার্সের দ্বিতলে একা জেগে বসে কাজ করছিলেন ডি. আই. জি. কর্নেল শিশির চক্রবর্তী। ঘেরাটোপ এমার্জেন্সি ব্যাটারি-সেট টেবিল-ল্যাম্পের আলোয়। একটা জরুরি রিপোর্ট লিখছিলেন তিনি। কাল সকালেই সেটা দিল্লিতে পাঠাতে হবে ক্যুরিয়ার মেসেঞ্জারে। রাত তখন একটা। চরাচর নিস্তব্ধ। ব্ল্যাক-আউট তখনো শেষ হয়নি। ওঁর ঘরের বাইরে বারান্দায়, ভারি পর্দার ওপ্রান্তে একটা টুলের ওপর বসেছিল সাব-ইনস্পেক্টর এস. ভাস্করণ। শ্রীবাস্তব ভাস্করণ। কেরলের মানুষ। ওঁর একান্ত দেহরক্ষী। ডি. আই. জি. তাকে ডাকলেন, ভাস্করণ!

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল দেহরক্ষী। জুতোর নালে-নালে ক্লিক্ করে শব্দ হল। পর্দা সরিয়ে সে জানতে চাইল, স্যার?

—শোন, আমার এ-কাজটা মিটতে আরও ঘণ্টাখানেক লাগবে। তুমি কেন ওখানে বসে বেহুদ্দো রাত জাগবে? যাও, তুমি শুতে যাও। য়ু আর নাউ অফ ডিউটি। গুড নাইট!

ভাস্করণ নত নেত্রে বললে, আপনি কাজটা সেরে ভিতরে যান, ততক্ষণ...

কর্নেল হাসলেন। বলেন, বড় অব্‌স্টিনেট তুমি! এত রাত্রে এখানে আমাকে পাহারা দেবার তো কোনো প্রয়োজন নেই, ভাস্করণ!

কর্তব্যনিষ্ঠ সৈনিক জবাব দিল না। নত নেত্রে দাঁড়িয়েই রইল। কর্নেল বলেন, অল রাইট, অ্যাজ য়ু প্লিজ। 'দে অল্‌সো সার্ভ হু ওনলি স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েট!' বাট ডোন্ট স্ট্যান্ড। বসো, ওই টুলটায়।

ভাস্করণ বুঝতে পারল না কর্নেল-সাহেব মিলটনের একটা উদ্ধৃতি শোনালেন এই মধ্যরাত্রে। কিন্তু নির্দেশটা প্রাঞ্জল। সে আবার গিয়ে বসল তার টুলে। নীরন্ধ্র অন্ধকারে। ওই বারান্দায়।

ভাস্করণের বয়স ত্রিশ। বছর-ছয়েক আছে এই সামরিক চাকরিতে। বিয়ে-থা করেনি। দেশে আছে ওর মা, আর এক ছোট ভাই— এখন স্কুলে পড়ে। ভাস্করণ বাল্যকালে পিতৃহীন। মানুষ হয়েছে ওর দাদুর কাছে। দাদু একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। কৃষ্ণমাচারি ভাস্করণ। তিনি চাকরি করতেন বর্মায়, আজাদ-হিন্দ্-ফৌজে। তিনি ছিলেন নামকরা

pathagar.net

স্টেনোগ্রাফার। নির্ভুল বানানে মিনিটে তিনশো শব্দ টাইপ করতে পারতেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং সকলের প্রিয়পাত্র। তাঁর চাকরি ছিল দুর্লভ সম্মানের। স্বয়ং নেতাজির একান্ত-স্টেনোগ্রাফার। বাল্যকালে দাদুর কাছে কত-কত গল্প শুনেছে শ্রীবাস্তব। গল্প নয়, বাস্তব ঘটনা। ওঁর প্রত্যক্ষ করা ঘটনাপ্রবাহ—কিন্তু গল্পের মতো আকর্ষণীয়, উত্তেজনায় ভরা।

আজ এই অন্ধকার বারান্দায় কর্নেলের নিরাপত্তা-বিধানরত সৈনিকটি আবার ভেসে চলল তার বাল্যস্মৃতির উজানে। দাদুর স্মৃতিকথায়। দাদুর কোলে বসে শোনা বিচিত্র সব গল্প। নেতাজির গল্প :

প্রায় সাতান্ন বছর আগেকার কথা। উনিশশ' তেতাল্লিশের শেষাশেষি। নেতাজি তখন সিঙ্গাপুরে। দিবারাত্র পরিশ্রম করেন। দিনে গড়ে চার ঘণ্টা নিদ্রা দেন কি দেন না। তবু ওরই মধ্যে সময় করে মাঝে-মাঝে চলে যান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে। ফৌজি পোশাক ছেড়ে ধুতি পরে, খালি গায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করেন। প্রতিদিন নয়, সপ্তাহে বা দু'সপ্তাহে একদিন, সুযোগমতো। আশ্রমের মহারাজ সব ব্যবস্থা করে দেন। বাইরে হয়তো তখন এইরকম ব্ল্যাক-আউট চলছে। ব্রিটিশ বা মার্কিন বিমান হয়তো তখন সিঙ্গাপুরে কার্পেট বম্বিং চালিয়ে যাচ্ছে। ধ্যানমগ্ন নেতাজি তা টেরও পেতেন না।

একদিনের কথা ওকে গল্প করেছিলেন দাদু। সেদিন সকালে আজাদ-হিন্দ্ লীগের দপ্তরে বসে নেতাজি ডিক্টেশন দিচ্ছেন, হঠাৎ ওঁর অ্যাডজুটেন্ট এসে বলল, সরি টু ডিসটার্ব য়ু, নেতাজি, ব্রিজলালজি এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। ওঁকে কি অপেক্ষা করতে বলব?

ব্রিজলাল জয়সওয়াল হচ্ছেন সিঙ্গাপুরের ধনিকশ্রেষ্ঠ। গুজরাতী চেট্টিয়ার। তিনপুরুষ ধরে ওঁরা বর্মামুলুকে ব্যবসা করছেন। শহরের অন্যতম মাথা।

নেতাজি অ্যাডজুটেন্টকে প্রশ্ন করেন, তার আগে বল তো, ব্রিজলালজি কি আমাদের আজাদ-হিন্দ্ ফান্ডে কিছু চাঁদা দিয়েছেন?

—আজ্ঞে না, উনি নিজে এখনো কিছু দেননি।

—ও আচ্ছা। ওঁকে পাঠিয়ে দাও ভিতরে।

ভিতরে এলেন বৃদ্ধ জয়সওয়ালজি। ভারতীয় পোশাক। সিল্কের চোগা-চাপকান। মাথায় উষ্ণীষ, তাতে একটি মুক্তার মালা জড়ানো। হাতে হাতির দাঁতের মুঠওয়ালা ছড়ি। যুক্তকরে নেতাজিকে নমস্কার করলেন। নেতাজি সাদরে তাঁকে আসন গ্রহণ করতে বলে প্রথমেই বললেন, সুপ্রভাত জয়সওয়ালজি! আপনি নিজে থেকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন দেখে ভাল লাগছে। এই তো আমি চাই। আমি কেন চাইব? আজাদ-হিন্দ্ ফান্ডে আপনারা যা দান দেবেন তা তো নিজে থেকেই এসে দিয়ে যাবেন। আপনি সিঙ্গাপুরের শ্রেষ্ঠ ধনী—আপনিই তো আদর্শ স্থাপন করবেন।

ব্রিজলালজি একেবারে থতমত খেয়ে যান। কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি এসেছিলেন কিছু ফৌজি অর্ডার সাপ্লাইয়ের বিষয়ে কথা বলতে।

—টাকাটা কি আপনি ব্যক্তিগতভাবে দিতে এসেছেন? না কি আপনার মালয়

pathagar.net

অটোমোবাইলস্ দিচ্ছে? অথবা আপনাদের চেট্টিয়ার মন্দির পরিষদ?

এতক্ষণে হালে পানি পান ব্রিজলাল। দানটা যদি চেট্টিয়ার মন্দির পরিষদের স্কন্ধে চাপানো যায়, তাহলে ওঁর নিজের পকেটে টানটা পড়বে আংশিকভাবে। তাই বলেন, আজ্ঞে, আমাদের মন্দির পরিষদই আজাদ-হিন্দ্ ফান্ডে দানটা করতে চান, কিন্তু একটি শর্ত আছে, নেতাজি!

—শর্ত? না, শর্ত তো আমি কিছু শুনব না। দান হবে নিঃশর্ত। আপনারা মালয়-বর্মা অঞ্চলে এসে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছেন, করেছেন, ভারতীয় হিসাবে। এ তো দান নিচ্ছি না আমরা, দাবি করছি। হাজার হাজার ভারতীয় এই স্বাধীনতাযুদ্ধে বুকের রক্ত দিচ্ছে—আপনাদের কাছে রক্ত আমি চাইছি না, দাবি করছি অর্থ। এখানে শর্ত কিসের?

যুক্তকরে ব্রিজলাল বলেন, অগর আপ বুরা না মানে তো সচ্মুচ্ বতাউঁ—'শর্ত' শব্দটা ভুল বলেছি আমি। আসলে এ আমাদের একটা আবদার, একটা প্রার্থনা! আপনি যদি অনুগ্রহ করে ট্যাঙ্ক রোডে আমাদের মন্দিরে পদধূলি দেন, তাহলে সেখানেই আমরা চেকটা হস্তান্তর করে ধন্য হই।

নেতাজি তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, এবারও আপনি ভুল বলেছেন, ব্রিজলালজি! মন্দিরে আমি 'পদধূলি' দেব কেমন করে? ভক্তদের পদধূলিই তো মাথায় তুলে নিতে যাব। আপনি শুনে থাকবেন, সুযোগ পেলেই আমি এখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে প্রণাম করে আসি। কিন্তু সেসব করি ব্যক্তিগতভাবে—সুভাষ বোস হিসাবে। আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মন্দিরে যাওয়া তো সম্ভব নয়!

—কেন নয়, নেতাজি? আপনি তো হিন্দু?

—না। 'সুভাষ বোস' হিন্দু। 'নেতাজি' শুধুমাত্র ভারতীয়।

—তবে সুভাষ বোস হিসাবেই আসুন আপনি?

—যাব। তবে ফৌজি পোশাকে নয়। আর তখন টাকাটাও নিতে পারব না আমি।

একটু চিন্তায় পড়ে যান ধনকুবের। শেষে বলেন, আমরা কিন্তু চাইছিলাম আপনি নেতাজি হিসাবেই যাবেন। সেখানে আমাদের সম্বোধন করে কিছু উপদেশও দেবেন। তা কি কিছুতেই হতে পারে না নেতাজি?

চোখ দুটি ধক্ করে জ্বলে উঠল নেতাজির। বললেন, পারে। এক শর্তে। নেতাজি হিসাবে যদি আমি যাই, তাহলে আমার সহযোদ্ধারাও যাবেন আমার সঙ্গে। সে দলে শিখ আছেন, খ্রিস্টান আছেন, মুসলমানও আছেন। এঁরা সবাই আমার সহধর্মী। এঁরা সবাই স্বাধীনতাসংগ্রামরত। সবাই ভারতীয়। এঁদের সবাইকে মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করতে দেবেন তো?

একেবারে নিভে গেলেন ব্রিজলাল জয়সওয়াল। তিনি জানেন—এ অসম্ভব! গুজরাটি চেট্টিয়ারদের এ মন্দিরে কোনো বিধর্মী কখনো প্রবেশ করেনি। দু'শ' বছরের পুরাতন ঐতিহ্য। হিন্দু ব্যতীত কেউ কখনো বাইরের ফটকের ভিতর মাথা গলায়নি। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ছেড়ে 'অন্তরালে' দাঁড়িয়ে দেবদর্শন করেনি। একমাত্র মন্দিরের পুরোহিত ব্যতীত গর্ভগৃহে কেউ কখনো প্রবেশ করেনি।

pathagar.net

নেতাজির সাফ কথা, না-হয় মন্দির কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে পরে আমাকে জানাবেন। আজ আসুন।

মাথা নিচু করে উঠে গিয়েছিলেন ব্রিজলালজি।

বালক শ্রীবাস্তবকে তার বৃদ্ধ দাদু কৃষ্ণমাচারি ভাস্করণ বলেছিলেন, বুঝলি দাদু, ঘর খালি হলে আমি সাহস করে তাঁকে বলেছিলাম, এ-শর্তে ওরা কিছুতেই রাজি হতে পারবে না, নেতাজি! তার মানে, কয়েক লক্ষ টাকা ফসকে গেল!

শুনে নেতাজি কী বলেছিলেন জানিস, দাদু? উনি বলেছিলেন, যাক! তোমাদের নেতাজির বিবেকের দাম 'বেশ কয়েক লক্ষ টাকা'র চেয়েও বেশি, ভাস্করণ!

শ্রীবাস্তব নীরন্ধ্রঅন্ধকারে বসে বসে একটা মানসিক অঙ্ক কষতে থাকে। সময় কাটাবার জন্য। উনিশশ' তেতাল্লিশ সালের 'কয়েক লক্ষ' মানে এই নিরানব্বই সালে কত শ' কোটি?

হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে কর্নেল আবার ডাকলেন, ভাস্করণ!

চট করে উঠে দাঁড়ায়। পর্দা সরিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করে, স্যার?

—ঘুম পাচ্ছে না তোমার? রাত যে দেড়টা হয়ে গেল! আর কখন শুতে যাবে?

ভাস্করণ জবাব দেয় না। উনি আবার বলেন, ওই ফ্লাস্কটায় কফি আছে। আমাকে এক কাপ দাও। তুমিও এক কাপ নিয়ে বস। কী করবে বল, ভাস্করণ! পড়েছ পাগলের হাতে, কফি খেতে হবে সাথে!

কর্নেল চক্রবর্তী এমনি মজার মজার কথা বলতে ভালোবাসেন। সকলের সঙ্গেই। ভাস্করণ একথার কোনো জবাব দিল না। সাহেবকে এক কাপ কফি ঢেলে দিয়ে 'ফ্লাস্ক-কাপ'-এ কিছুটা ঢেলে নিয়ে আবার এসে বসল টুলে। কফিটা উপকারই করল : ঘুমতাড়ানিয়া।

আবার সে ফিরে গেল তার বাল্যের স্মৃতিচারণে। বৃদ্ধ দাদু ওকে শুনিয়েছিলেন ওই ঘটনার উপসংহার :

পরদিনই আবার ফিরে এলেন ব্রিজলালজি। সঙ্গে মন্দির কমিটির আরো পাঁচ-সাতজন কর্মকর্তা। ওঁদের সকলের তরফে ব্রিজলাল জয়সওয়াল বলেছিলেন, আমরা আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি নেতাজি! বলুন, কবে আপনারা আসবেন?

—আমার মুসলমান আর খ্রিস্টান বন্ধুরাও আমার সঙ্গে যাবে তো?

—নিশ্চয়ই! আমরা বিবেচনা করে দেখেছি, নেতাজি! ওঁরা মায়ের চোখে মুসলমানও নন, খ্রিস্টানও নন—ওঁরা বন্দিনী মায়ের মুক্তিযোদ্ধা। আমরা ফুল দিয়ে অর্ঘ্য দিই, ওঁরা বুকের রক্ত দিয়ে অর্ঘ্য দেন। ওঁরা আরও বড় জাতের ভক্ত!

কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! নেতাজির আদর্শে দুশ' বছরের সংস্কারকে ছিন্নভিন্ন করে সেদিন সিঙ্গাপুরের চেট্টিয়ার মন্দিরের দ্বার ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

সিঁড়ির ধাপের পাশে নেতাজি খুলে রাখলেন তাঁর মিলিটারি টপবুট। দেখাদেখি নগ্নপদ হলেন নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান আইয়ার, ধার্মিক মুসলমান জামান কিয়ানী আর হবিবুর রহমান।

pathagar.net

মন্দির পুরোহিত প্রত্যেকের কপালে এঁকে দিলেন হোমশিখার জয়তিলক। নেতাজির দেখাদেখি ওঁরা তিনজন যুক্ত করে দেবীপ্রণাম করলেন। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—হর হর মহাদেও নয়, আল্লাহ্-উ-আকবর নয়—ধ্বনি উঠল : জয় হিন্দ্!

"মিথ্যা শুনিনি ভাই/এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।"

প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে বিদেশে নেতাজি যেটা পেরেছিলেন, আজকালকার রাজনৈতিক নেতা স্বদেশে সেটা পারছেন না কেন? কেন এই ধর্মের হানাহানি? কেন এই ইন্দো-পাক যুদ্ধ?

হঠাৎ চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল ভাস্করণের। অন্ধকারের ভিতরেই রাত্রির স্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে জেগে উঠল একটা মেশিনগানের : খ্যাটা-খ্যাটা-খ্যাটা-খ্যাটা...

আর তারপরেই জোড়া বন্দুকের শব্দ।

তীরবেগে উঠে দাঁড়িয়েছে ভাস্করণ। পর্দা সরিয়ে দেখে কর্নেল-সাহেব একটা গরম উলের গাউন জড়িয়ে নিয়েছেন গায়ে। টানা-ড্রয়ার থেকে বার করে নিয়েছেন একটা রিভলভার আর টর্চ। তিনি মুখ তুলতেই ভাস্করণ বলে ওঠে, আপ্ মৎ যাইয়ে, স্যার! ম্যয় দেখ্‌তা হুঁ।

ওপাশের অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে AK-47 হাতে ততক্ষণে বার হয়ে এসেছেন ডেপুটি কমান্ডান্ট হরিন্দর রাজ। ভাস্করণকে চাপা ধমক দিয়ে ওঠেন, দেখনেকা কেয়া সওয়াল? উই আর ইনসাইড আওয়ার ক্যাম্পাস! আর্ন্ট উই? কাম অন।

সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলেন তিনজন। হরিন্দর রাজ হাতের টর্চটা জ্বেলে সিঁড়ির ধাপগুলো দেখতে চাইলেন। আর তৎক্ষণাৎ নিচে থেকে ছুটে এল একঝাঁক স্টেনগানের বুলেট : খ্যাটা-খ্যাটা-খ্যাটা-খ্যাটা...

পরপর মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন ওঁরা তিনজন। তিনটি স্বাধীনতারক্ষক এখন তিন মুর্দা!

।। চার ।।

আবাসনের আর এক প্রান্তের কথা বলি। বি. এস. এফ. আবাসনের একটিমাত্র প্রবেশদ্বার। তার একান্তে একটি ছোট্ট গুমটি ঘর। আড়াই মিটার বর্গক্ষেত্র। তাতে একটি প্রবেশদ্বার, লোহার পাতে মোড়া। জানলা নেই। তিনদিকে চৌকো খুপ্‌রি—'অবজারভেশন হোল'। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ায় গুমোট গরম হয় না। ঘরে দু'জন প্রহরীর জন্য একটিমাত্র ফোল্ডিং চেয়ার। কারণ পালা করে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সর্বক্ষণ দু'পায়ে খাড়া হয়ে থাকতে হয়। প্রতি একঘণ্টা অন্তর যুগল প্রহরী নিজেদের আসন বদল করে। একজন বসে, একজন দাঁড়ায়।

ব্ল্যাক-আউটের ঘনান্ধকারে ওরা দু'জন ডিউটিতে 'জয়েন' করেছে রাত দশটায়। সারাটা রাত দু'জনে পালা করে জেগে ওই ছিদ্রপথে পাহারা দেবে। ঘরে স্তিমিত নাইট-লাইট। সকাল ছ'টা বাজার দু'-চার মিনিট আগে এসে পৌঁছাবে ওদের 'রিলিভার'—ছুট্টি-দেনেবালা।

pathagar.net

গুমটিঘরে পাহারা দেবার সময় ধূমপান মানা—দারু পীনা তো বেশক্ গুনাহ্। তাহলে ওরা ঘুম তাড়ায় কী করে? কফি পান করে আর গল্পগুজবে। নাইট-লাইট ছাড়া ঘরের ভিতর কোনো বাতি নেই, আছে একটা সুইচ। সেটায় আঙুল ছোঁয়ালে রাস্তার বিপরীতে পাইন গাছের উপরে ঝোলানো একটা সার্চ-লাইট জ্বলে উঠবে—সামনের সড়কটা পরিষ্কার দেখা যাবে। ব্ল্যাক-আউট বা লোডশেডিং হলেও সেই ব্যাটারি-সেট এমার্জেন্সি-লাইটটা প্রয়োজনে জ্বালানো যায়।

এখন পাহারায় আছে যে দু'জন, তাদের একজন খাল্‌সা শিখ—কনস্টেবল হরগোবিন্দ্ সিং। সাতাশ বছরের নওজোয়ান। দিলদরাজ ব্যক্তি। সকলের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব আর সর্বক্ষণ খোশমেজাজ। আবাসনে ওর ডাকনাম—'আন্‌সেল্‌ফিশ জায়েন্ট'। অস্কার-ওয়াইল্ডয়ের বিখ্যাত গল্পটির অনুকরণে। ওর এই খেতাব লাভের পশ্চাদ্‌পটে আছে গুরুজীদত্ত ওর খানদানি বদনখানি। দৈর্ঘ্যে ছ'ফুট তিন ইঞ্চি , ছাতি বিয়াল্লিশ ইঞ্চি । ইচ্ছে করলে একটা প্রমাণ মানুষকে মাথার উপর তুলে আছাড় মারতে পারে। মারে না। কারণ ও প্রকৃতিগতভাবে বিশ্ববন্ধু! আনসেলফিশ জায়েন্ট।

ওর সঙ্গে পাহারা দিচ্ছে প্রৌঢ় ল্যান্সনায়েক নাজির আহ্‌মেদ। বয়স সাতচল্লিশ। শ্রীনগরে বাড়ি। বাড়ি নয়, বোট! ঝিলাম নদীর কিনারে একটা হাউস-বোট সংলগ্ন গেরস্থালী-নৌকায় ওদের দু'পুরুষের বাস। ভিটে-মাটি যা বল তা ওই ভাসমান নৌকাখানি।

ফ্লাস্ক থেকে র-কফি ঢালতে ঢালতে হরগোবিন্দ তার সঙ্গীকে বলে, কী বড়াভাই, তোমার ছুটি স্যাংশন হল, না হল না?

নাজির একটা পাখ্‌পালকে কানে সুড়সুড়ি দিতে ব্যস্ত ছিল। বললে, হো গয়া, পরসো।

অনেক—অনেক দিন পর এবার নাজির ঘর যাবে। 'ঘর যাবে' বলাটা ঠিক হল কি? তবে কী বলব? 'নৌকা যাবে?' মোট কথা তার বুঢ়্‌ঢা আব্বাজান, মা, আর ঘরওয়ালীর সাথে অনেকদিন পরে মুলাকাৎ হবে। কার্গিল যুদ্ধের আগে থেকেই ওর ছুটি মঞ্জুর হয়ে আছে। লেকিন অচানক পাকিস্তান ভারত-ভূখণ্ডে আবার নতুন করে কিছু পেশাদারি হানাদার ঢুকিয়ে দেওয়ায় শুরু হয়ে গেল এক অঘোষিত হানাহানি : কার্গিল যুদ্ধ। সব মঞ্জুর-ছুটি বাতিল হয়ে গেল। আহ্‌মেদের 'দেশ-নৌকা' যাওয়াও ঝুলে রইল সেই অঘোষিত লড়াই খতম হওয়া-তক। এই কয়মাস ধরে ভারতীয় জওয়ানেরা ওইসব পেশাদারি হামলাবাজদের মেরে ধরে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। 'দেশে' মানে, যে-দেশ ওদের ভাড়াটে সৈনিক হিসাবে নিয়োগ করেছিল। এতদিনে সেই একতরফা হামলাবাজি খতম হল। বেধড়ক ঠ্যাঙানি খেয়ে সম্ভবত চৈতন্য ফিরেছে পাকিস্তানের উজীরে-আজম নওয়াজ শরিফের। তিনি বেতারতরঙ্গে ফতোয়া জারি করেছেন '—ভো, ভো, হামলাকারির দল! তোমরা সীমান্তের এপারে প্রত্যাবর্তন কর।'

এতদিনে তাই আহ্‌মেদের ছুটিটা পুনরায় স্যাংশন্‌ড হয়েছে।

র-কফির কাপটা হরগোবিন্দ্-এর হাত থেকে নিয়ে নাজির আহ্‌মেদ জানতে চায়, বাতাও তো ইয়ার, ক্যা বহ্ সচ্ বাত? তুই এক দশাসই জওয়ানকে পিঠে নিয়ে টাইগার হিল টপকেছিলি?

pathagar.net

হরগোবিন্দ্ হাত নেড়ে মাক্ষিকাবিতারণ ভঙ্গি করে বলে, ছোড় দো, বড়াভাই! এসব ওরা আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে বলে। গোটা রাস্তাটা কি আমি ওই কমরেডকে বয়ে নিয়ে আসতে পারি? খানিকটা পথ এনেছিলাম। লেকিন দেখো মেরা বদনসিব...

একটা পর্বতশৃঙ্গ—টাইগার হিল—জয় করতে এই ক্যাম্প থেকে গিয়েছিল মাত্র দু'জন। কনস্টেবল হরগোবিন্দ্ আর ল্যান্সনায়েক শরিফ ইসলাম। দুজনেই জিন্দা ফিরে এসেছে। পর্বতশৃঙ্গটি জয় করে—হানাদারদের বিতাড়ন করে। কিন্তু হরগোবিন্দের বদ্নসিব— তার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি। আর ইসলামের বাঁ কাঁধে বিদ্ধ হয়েছিল একটা বুলেট! বেসক্যাম্পের ডাগ্দার-সা'ব—ক্যা নাম উন্কা?—খ্যয়ের, তিনিই তুরন্ত্ বুলেটটা ওর কাঁধ থেকে বার করে দিলেন। ব্যান্ডেজ করে হাতে বেঁধে দিলেন একটা স্লিং! ব্যস! কিল্লা ফতে—

আহ্মেদ জানতে চায়, এতে তোর আফসোস করার কী আছে রে? তোর কাঁধেও একটা গুলি লাগলে তুই খুশি হতিস?

—বিলকুল! লেকিন এক ছোটি-মোটি গোলি! বুঝিয়ে বলে : হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর শরিফ ইসলামকে দশ দিনের ছুট্টি মঞ্জুর করা হয়েছে। সে ওই বেস-ক্যাম্প থেকে সোজা চলে গেছে নিজের গাঁ-ঘরে— পহেলগাঁও! আর যেহেতু হরগোবিন্দ্ বহাল তবিয়ৎ, তাই তাকে সরাসরি আবার ফিরে এসে জয়েন করতে হয়েছে এই বি. এস. এফ. ক্যাম্পে। এখন রাত জেগে গুমটিতে পাহারা দিতে হচ্ছে। কোনো মানে হয়? এখন এই অতন্দ্র প্রহরার কী জরুরৎ? যেসব দুশমন শীতকালের সুযোগ নিয়ে রে-রে করে ঢুকে পড়েছিল আমাদের এলাকায়, তারা তো তিন-চার মাস পরে কেঁউ-কেঁউ করতে করতে ফিরে গেছে। তাহলে এই রাত জেগে পাহারা দেবার দর্শনধারী এন্তাজামের মানেটা কী?

হো-হো করে হেসে ওঠে আহমেদ। রেডিয়াম-ডায়াল হাতঘড়িতে নজর করে দেখে। রাত তখন একটা। মানে ডিউটি খতম হতে এখনো পাক্কা পাঁচ ঘণ্টা। বলে, একটা কহানি শুনাও গোবিন্দ্-ভেইয়া। তোমার ওই টাইগার হিল জয়ের বীরত্বগাথা নয়, বেশ জমাটি একটা মহব্বতের কিস্সা। তোমার নিজের জীবনের—

—মহব্বৎ! এই হাতির মতো দৈত্যটার সঙ্গে কোনো খুবসুরত লেড়কির প্যার-মহব্বত হওয়া সম্ভব?

—কেন নয়? তোমাদের বাৎস্যায়ন-পীর না বলেছেন—পদ্মিনী, চিত্রানী, শঙ্খিনীর তরিকা তোমার মতো মানুষের জন্যে আল্লাহ্তালা কিছু 'হস্তিনী'ও পয়দা করেছেন! বলেননি?

—আচ্ছা! তুমি 'কামসূত্র' পড়েছ দেখছি।

—জী হাঁ। উর্দু অনুবাদে।

—তোমার কয়টি বিবি, বড়াভাই?

—কয়টি বিবি? কেন? হঠাৎ বাৎস্যায়ন-প্রসঙ্গে বিবির আদমসুমারির প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন?

pathagar.net

—না, মানে, তোমরা তো চার-চারটি বিবি পুষতে পার, তাই জানতে চাইছি।

—না ভাই, আমার একটিই বিবি।

—কী নাম?

—নূরজাহাঁ!

—আরেব্বাস! জাহান-কী-নূর! জগতের আলো? তা তাঁর সঙ্গে মহব্বতটা কি সাদির পরে, না আগে থেকেই?

আহ্‌মেদ ধমকে ওঠে, তুমি তো আচ্ছা লোক! শুনতে চাইলাম তোমার প্রেমের গল্প, আর তুমি 'শাট্‌ল্ কক'টা আমার কোর্টেই ফেরত দিতে চাইছ?

—বলব, আমার প্যার-মহব্বতের কহানিও শোনাব, দাদা। লেকিন পহিলে আপ! তুমি সিনিয়ার তো!

আহ্‌মেদ আর একটু কফি ঢেলে নিয়ে স্বীকার করল তার জীবনে, তার যৌবনে, কীভাবে প্রেম এসেছিল। একবারই। ধীর পদক্ষেপে। সসঙ্কোচে। কাফ-ল্যভ থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রেম!

আহ্‌মেদের বাল্যকাল কেটেছে ঝিলম নদীর ধারে, শ্রীনগরে। একটি হাউসবোটে। তার নাম 'বার্নহিল'। আসামের চা-বাগানের কোন মালিক ছিলেন তার সত্ত্বাধিকারী। তিনি বিলাতে ফিরে যাবার আগে হাউসবোটটা ওর বড়ি আব্বাজানকে জলের দরে বেচে দিয়ে যান। পাশাপাশি হাউসবোট। ঝিলাম যেখানে এসে পড়েছে ডাহ্‌ল-হ্রদে। ঘেঁষাঘেঁষি হাউসবোটের ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা একই সঙ্গে খেলে। দৌড়-ঝাঁপ করে, একসঙ্গে বেড়ে ওঠে। এক বোটে মেহ্‌মান এলে পাশের বোটের বন্ধু-বান্ধবীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আহ্‌মেদরা পিঠোপিঠি দুই ভাই। পাশের বোটের মেহের ওর চেয়ে বছর-পাঁচেকের ছোট। আহ্‌মেদের সঙ্গেই তার দোস্তিটা বেশি। আহ্‌মেদের আব্বাজান বাজার থেকে আপেল কিনে আনলে আধখানা খায় আহ্‌মেদ, বাকি আধখানা মেহের। আবার মেহের কিছু 'ত্রেলা' পেলেও তার আধখানা দিয়ে দেয় ইসমাইলোকে। ইসমাইলো হচ্ছে আহ্‌মেদের ডাকনাম!

তারপর যেমন হয়, দুজনেরই বয়স বাড়তে থাকে। মেহেরকে এবার বোর্‌খা ধরতে হল। পর্দানসীন হয়ে গেল সে। একা মেহের নয়, ওদের পাশাপাশি বোটের সব কয়টি মেয়েই। আহ্‌মেদ ওকে দেখে—দূর থেকে— কথাবার্তা বলার সুযোগ নেই। কিন্তু বুঝতে পারে, মেহের বালিকা থেকে কিশোরী, পরের ধাপে তরুণী হয়ে উঠছে। গায়ে-গতরে আহ্‌মেদও বাড়ছে। ও তবু স্কুলে যায়, কিছুটা লেখাপড়া শিখছে। হাউসবোটের কোনো মেয়েই স্কুলে পড়তে যায় না।

তারপর একদিন ইসমাইলোর মা সন্ধ্যাবেলায় ওকে ধরে পড়ল, মেহেরকে তোর মনে আছে, বেটা?

আহ্‌মেদ তো আকাশ থেকে পড়ে। মনে থাকবে না মানে? রোজই তো তাকে দেখে, যদিও আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা। সে প্রতিপ্রশ্ন করে, এটা কী বলছ, আম্মা?

pathagar.net

মেহেরকে তো রোজই দেখতে পাই, টিউকল থেকে জল নিয়ে যেতে। হঠাৎ একথা কেন?

—ওর খুব বদনসিব। এক বুঢ্ঢার সাথে ওর সাদি ঠিক হয়েছে। বুড়োটার আরও দুই বিবি আছে, কিন্তু কারও বাচ্চা হয়নি।

আহ্‌মেদ বলে, তাহলে বুড়োটার বাচ্চা পয়দা করার হিম্মৎ নেই। আরও দু'-চারটে সাদি করলে তার কোনো সুরাহা হবে না। ইলাজ করালে হলেও হতে পারে।

—সেকথা তাকে কে বোঝাবে? সেন্ট্রাল মার্কেটে লোকটার বিরাট শালের দোকান আছে। আমীর আদমি!

—তবে আর মেহেরের বদনসীবের কথা বলছ কেন? বাচ্চা না হোক, মোটরগাড়ি তো হবে! টাকাপয়সা-গয়নাগাঁটি...

মা বললে, সেটা তুই ওকে বোঝা—

—কাকে? মেহেরকে? তার দেখা পাব কোথায়?

মা ওর হাতখানা চেপে ধরে বললে, ঘরের ভিতর আয়। মেহের এসেছে। তোর কাছেই।

মা ওকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ঘরের ভিতর নিয়ে এল। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মেহের। বোরখা-খোলা বেপর্দা হয়ে। মা ওকে ঘরের ভিতর ঠেলে দিয়েই বাইরে বেরিয়ে গেল। বাহির থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে।

সন্ধ্যা তখনো ঘনিয়ে আসেনি। পড়ন্ত রোদের একটা কৌতূহল জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর এসে লুটিয়ে পড়েছে। আহ্‌মেদ স্তম্ভিত হয়ে গেল : এ কে!

এই পূর্ণযৌবনা তরুণীকে সে তো চেনে না! না, ভুল হল! একেবারে অচেনা নয়। ওই তো ওর বাঁ-গালের সেই তিলচিহ্নটা। ওই তো সেই কাজল-কালো চোখ দুটি। নিজের অজান্তেই ও সেই পুরনো সম্বোধনে ডেকে উঠল— মোহর!

মেহের কোনো কথা বলতে পারল না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল আহ্‌মেদের বুকের ওপর।

—তব? ফির ক্যা হুয়া?

আহ্‌মেদ হঠাৎ নীরব হতেই প্রশ্নটা করে বসল হরগোবিন্দ্—কহো না, দাদা! তুম্‌নে ক্যা কিয়া?

—মেরি বাৎ ছোড় দে!

—ম্যয় জানতা হুঁ, তুম্‌নে ক্যা কিয়া—

—তো বাতা?

—তুমনে উসকি মুহ্ চুম লিয়া!

হো-হো করে হেসে উঠল আহ্‌মেদ। বললে, আমার কহানির ওখানেই তামাম শুদ্। সেই মেয়েটিই আজ আমার ঘরওয়ালী। আমার বুঢ্ঢা আব্বাজান, ঔর আম্মার দেখভাল করে। ওর কাছেই ফিরে যাব দু'দিন পরে। আমার ছুট্টি স্যাংশন্ড হয়ে গেছে—

boiRboi.net

—তোমার বাল-বাচ্চা?

—পহিলেই বাতায়া না? উস্‌কি বদনসীবী! একবারই বাচ্চা হয়েছে তার। কিন্তু যমজ। দুটিই মেয়ে। দুটোরই সাদি দিয়ে দিয়েছি। ওর কোল খালি। বালবাচ্চা বেটে কেউ নেই।

—কিন্তু ওঁর নামটা কী? মেহের, মোহর, না নূরজাহাঁ?

আহ্‌মেদ ধমকে ওঠে—ইস্কুলে ইতিহাসে কত নম্বর পেতিস? তু নেহি জানতা কি বাদশাহ জাহাঙ্গীর কি বড়ি বেগম...

—অব সাম্‌ঝা! সালাম শাহ্‌-য়েন-শাহ বাদশাহ্‌ জাহাঙ্গীর!

প্রতিশ্রুতিমতো হরগোবিন্দ্‌কেও শোনাতে হল তার প্রাক্‌-বিবাহ জীবনের মহব্বতী কিস্‌সা।

খালসা শিখদের দশজন গুরুর মধ্যে একজন— গুরু অর্জুন— শহিদ হয়েছিলেন এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে। তাঁর স্মরণদিবসে খালসা-শিখেরা তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায়—তৃষ্ণার্তকে জল বিতরণ করে। সারা ভারতেই এ উৎসব প্রচলিত। কলকাতাতেও আমরা দেখেছি, দেখছি আজও, বড় বড় ড্রামে সরবত তৈরি করে প্রখর জ্যৈষ্ঠ মাসে রাস্তার ধারে ওরা অপেক্ষা করে। পথচারীদের সরবত পিলায়।

হরগোবিন্দের বয়স তখন বিশ-বাইশ। শ্রীনগরে কলেজে পড়ে। ছাত্র-ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় সেও সেদিন জলদান ব্রত উদ্‌যাপন করতে পথে নেমেছে। সকাল থেকে বহু পথচারীর তৃষ্ণা নিবারণ করতে করতে সে নিজেও ক্লান্ত। একটা ট্রাকে চেপে ওরা এসেছে ওদের জলদান সত্রের কেন্দ্রীয় দপ্তরে। ওর সহকর্মীরা ড্রামে সরবত ভরে নিচ্ছে। এই অবকাশে ও নিজে এগিয়ে গেল কাউন্টারে। ওর বড়ি পিয়াস লেগেছিল। কাউন্টারে কয়েকটি মেয়ে জলদান করছিল। ও অন্যমনস্কভাবে সেদিকে এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ থমকে গেল।

মাঝের কাউন্টারে যে মেয়েটি জলসত্রে সরবৎ বিলি করছিল, তাকে দেখে ওর আর চোখের পলক পড়ে না। মেয়েটি অসাধারণ দীর্ঘাঙ্গিনী। পাঞ্জাবী মেয়েরা সচরাচর লম্বাই হয়। এ যেন সেই দলে দশের মধ্যে দশম। অথচ যৌবনপুষ্ট দেহে তাকে তেড্যাঙা লম্বাও মনে হচ্ছে না। হরগোবিন্দের মনে হল, ওকে পাশে রেখে ফটো তুললে লোকে বলবে : আহা! যেন মানিকজোড়!

মেয়েটি শ্যামাঙ্গিনী। হরিণ-নয়না এবং তার সর্বাঙ্গে যৌবনের জলতরঙ্গ। তবে তাকে স্থূলাঙ্গিনী বলা চলবে না। হরগোবিন্দের মনে হল, ঈশ্বর যদি শ্যামলা রঙের রজনীগন্ধা পয়দা করতে পারতেন, তাহলে এই মেয়েটির একটা উপমান পাওয়া যেত।

হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেল। মেয়েটিও কী জানি কেন, অবাক হয়ে এক নজরে ওর বিশালকায় দেহটি দেখে নিয়ে বললে—আইয়ে সরবৎ পিজিয়ে—

হরগোবিন্দ্‌ নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, সরবৎ নেহী। মুঝে স্রিফ ঠণ্ডা পানী পিলাইয়ে—

pathagar.net

—পানী? পানী তো য়্যহাঁ নেহী হ্যয়! সরবতই পিজিয়ে না। পিয়াস মিট যায়েগী!

বাধ্য হয়ে সরবতই পান করতে হল। এক-দুই-তিন গ্লাস! তবু কি জানি কেন ওর তৃষ্ণা মিটল না। বোধকরি তৃষ্ণা মিটে গেলেই ওকে এ-কাউন্টার ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে।

চতুর্থ গ্লাসটি কণ্ঠনালীতে ঢেলে দিয়ে জলপাত্রটা যখন কাঠের কাউন্টারে নামিয়ে রাখল, তখন মেয়েটি শুধায়—অব পিয়াস মিটি?

পাগড়িসমেত বিরাট মাথাটা পেন্ডুলামের মতো দু'দিকে দুলিয়ে নেতিবাচক প্রত্যুত্তর করল। মেয়েটি আচমকা হেসে ফেলে। একসার কুন্দশুভ্র দাঁত বার হয়ে পড়ল গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে। বললে—পানী ইয়া সরবত সে আপকা পীয়াস মিটনেবালা নেহী হ্যয়!

হরগোবিন্দ্ একটিমাত্র শব্দে প্রতিপ্রশ্ন করল— তো?

ঠিক সেই সময় কে যেন ভিতর থেকে ডেকে উঠল, যম্না, ভিতর আ যাও, সর্দারজী নে তুমকো বুলা রহে হেঁ।

মেয়েটি পিছন ফিরে নেপথ্যভাষীকে বললে, আভ্ভি আতি হুঁ। তারপর হঠাৎ হরগোবিন্দ্কে বললে, তব্ আপ এক কাম কিজিয়ে। কোই খুবসুরত সি লড়কি সে সাদি কর লিজিয়ে। পিয়াস তব তুরন্ত বুঝ জায়েগী।

বলেই ব্যালে-ডান্সারের মতো গোড়ালিতে ভর দিয়ে আধপাক ঘুরে গেল। হরগোবিন্দের বাক্যস্ফূরণের আগেই সে মিলিয়ে যায় পর্দার ও-প্রান্তে।

এই ওদের প্রথম সাক্ষাৎ।

আহ্মেদ জানতে চায়, তেরে ঘরওয়ালী কা শুভনাম 'যমুনাবাঈ' হ্যঁয় ক্যা?

হরগোবিন্দ্ মিটি-মিটি হাসছে। সেই হাসিতেই আছে তার স্বীকৃতি। আহ্মেদ জানতে চায়, তেরা বালবাচ্চা—?

হরগোবিন্দ্ নেতিবাচক শিরশ্চালন করে। আহ্মেদ পুনরায় প্রশ্ন করে, কতদিন সাদি করেছিস?

সেকথার জবাবে দৈত্যটা বলে, বহ্ আভি মা বন্নেওয়ালী হ্যঁয়!

—আচ্ছা!! কনগ্র্যাচুলেশনস্! ঔর কেৎনা দিন বাদ?

হরগোবিন্দ্ এবারও জবাব দেয় না। কথা বলছিল বটে, কিন্তু তার দৃষ্টি ছিল ছিদ্রপথে সড়কের দিকে। বললে, লেকিন বহ্ ক্যা হ্যয়?

আহ্মেদও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আর একটি ছিদ্রপথে চোখ লাগায়। স্টেনগানের নলটাও বার করে দেয় ফোকর দিয়ে। ওদের দু'জনেরই মনে হল, নিচের সড়ক বেয়ে ধীরগতিতে কী একটা জন্তু গুঁড়ি মেরে উপরে এগিয়ে আসছে। জন্তুটা তখনো বিশ মিটার দূরে। আহ্মেদ দ্রুতগতিতে নিভিয়ে দিল ওদের ঘরের স্তিমিত নাইট-লাইট আর জ্বেলে দিল সার্চ লাইটটা। হুঙ্কার দিয়ে উঠল—

—হল্ট! হু কামস দেয়ার।

জোরালো সার্চ-লাইটের আলোটা পড়ল বস্তুটার উপর।

pathagar.net

একটা জিপ। সাত-আটজন সেটাকে ঠেলতে ঠেলতে ঢালের বিপরীতে ঠেলে তুলছে। দূর থেকেই বোঝা গেল ওরা পাঞ্জাবী শিখ। জিপের ওপর এড়োএড়ি একটা গেরুয়া ফেস্টুন। তাতে গুরুমুখী পাঞ্জাবীতে কী যেন লেখা।

জিপটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। কে একজন একটা পাথরও গুঁজে দিয়েছে চাকার তলায়। ওরা জিপের দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সকলেরই হাত মাথার ওপর তোলা। দলপতি একজন বৃদ্ধ সর্দারজী। সে চিৎকার করে বললে— ফ্রেন্ডস্!

—কাঁহা যনা হ্যয়? ইধর কিঁউ আতে হো?

সর্দারজী হিন্দিতে বললে, এখান থেকে চিৎকার করে সব কথা বুঝিয়ে বলা মুশকিল। আমি কি কাছে আসতে পারি?

আহ্‌মেদ বললে—পার। একা। মাথার উপর হাত তুলে।

নির্দেশমতো সর্দারজি পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। কাছাকাছি এসে সে চারিদিকে পাক মেরে দেখাল যে, সে নিরস্ত্র, কোমরবন্ধে শিখধর্মের পঞ্চ -'ক'য়ের অনুষঙ্গ কৃপাণ ব্যতিরেকে। আরও কাছে এসে সর্দারজি বললে—আমরা যাব উধমপুরের গুরুদ্বারায়। এখান থেকে বিশ-বাইশ কি.মি.। কিন্তু মুশকিল কি বাৎ, পেট্রোল বিলকুল খতম হয়ে গেছে। আপনাদের ক্যাম্পের ডিপো থেকে পাঁচ লিটার পেট্রোল খরিদ করতে পারি? ক্যাশে?

আহ্‌মেদ বললে—রাত দুটোর সময় হবে না। কাল সকালে আসুন।

—তাহলে বাকি রাত আমরা ক'জন থাকব কোথায়? গাছতলায়?

আহ্‌মেদ বললে—একথার আমি কী জবাব দেব?

হরগোবিন্দ্ গুরুমুখী পাঞ্জাবীতে সর্দারজিকে কী যেন বলল। সর্দারজির দু'হাত শূন্যে তোলাই ছিল। বললে, ওয়া গুরুজীকি ফতে। ধুন গুরু রামদাস!

আহ্‌মেদ ধমকে ওঠে, তোমরা হিন্দিতে কথা বল—

হরগোবিন্দ্ ওকে বুঝিয়ে বলে যে, তার কোয়ার্টার্সে একটা জেরিক্যানে লিটার-পাঁচেক পেট্রোল আছে। সে তুরন্ত্ বাড়ি গিয়ে ক্যানটা নিয়ে এসে ওদের দান করতে চায়।

আহ্‌মেদ শুধু বললে, দান?

—হ্যাঁ, দানই। ওই ফেস্টুনটা তুমি পড়তে পারনি। এঁরা একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। কার্গিল যুদ্ধে আহতদের সেবা করতে এঁরা এসেছেন। জানের মায়া না করে।

আহ্‌মেদের আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে খাড়া দাঁড়িয়ে রইলেন সর্দারজি। হরগোবিন্দ্ চটজল্‌দি তার ব্যারাক থেকে জেরিক্যানটা নিয়ে এল। আহ্‌মেদও বার হয়ে এল গুমটি ঘর থেকে। হাতে তার স্টেনগান। তিনজন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে জিপটার দিকে। সেখানে দুই সারে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেবাব্রতীরা।

ওদের দু'জনের কেউই খেয়াল করে দেখেনি যে, সার্চলাইট জ্বলে ওঠার আগেই আগন্তুক দলের একজন শার্প শুটার জিপের পিছনে ঘাপটি মেরে রাস্তার ওপর বসে পড়েছিল। হাতে তার AK-47। ওরা তিনজন দু'চার পা এগিয়ে এসেছে-কি-আসেনি,

pathagar.net

জিপের কাছে কে যেন জোরে কেশে উঠল। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ সর্দারজি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন পিচের রাস্তায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই জিপের পিছনে আত্মগোপনকারী লোকটা লাফিয়ে বার হয়ে এল সামনে। গর্জে উঠল তার হাতের AK-47। জমির সমান্তরালে সেটা একটি অর্ধবৃত্ত রচনা করল। লুটিয়ে পড়ল হরগোবিন্দ্ আর আহ্মেদ। বৃদ্ধ লাফিয়ে উঠে অফ করে দিল গুমটি ঘরের সুইচটা।

আদিম অরণ্য ফিরে পেল তার চিরন্তন সঙ্গী নীরন্ধ্র অন্ধকারকে।

।। পাঁচ ।।

সেই নীরন্ধ্র অন্ধকারের ভিতরেই হরগোবিন্দ্ আর আহ্মেদের মৃতদেহ দুটি ওরা ধরাধরি করে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তার নয়ানজুলিতে।

'কণ্ঠ আঁকড়ি ধরিল পাকড়ি দুইজনা দুইজনে'—

হ্যাঁ, ওদের একজন শিখ আর একজন মুসলমান। তবে ওদের ওই জড়াজড়িটা হানাহানিতে নয়, দেশপ্রেমের নিবিড় আলিঙ্গন! বলাবাহুল্য, মৃতদেহ দুটি নর্দমায় ফেলে দেবার আগে তাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি সংগ্রহ করতে ভোলেনি শিখ ছদ্মবেশী মুস্তাক মিঞাদাদ—ওদের দলপতি। বৃদ্ধ সে আদৌ নয়। ছদ্মবেশে বৃদ্ধ সেজেছে। জিপটা মুখ ঘুরিয়ে প্রস্থানপথের দিকে প্রস্তুত রাখা হল। আল বদর জঙ্গী সংগঠনের সাতজন আগন্তুক গেট টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ল, শুধু অষ্টম ব্যক্তি বসে রইল কম্বল মুড়ি দিয়ে জিপের চালকের আসনে। জঙ্গলের ভিতরে একটা ফাঁকা জায়গায়।

গেট পার হতেই বাঁদিকে একসার অ্যাসবেস্টসের ছাউনি। দোতলা বাড়ি। সি-টাইপ কোয়ার্টার্স। সাতজন ছদ্মবেশী জঙ্গী মুজাহিদিন গুটি গুটি এগিয়ে চলেছে সে দিকেই। হঠাৎ পাশের একটা একতলা ঘরে পর্দা সরিয়ে একজন মহিলা টর্চের আলো জ্বাললেন। তৎক্ষণাৎ শার্প শ্যুটার মকবুলের রাইফেল গর্জন করে উঠল। কাচের সার্সি ভেদ করে বুলেট গিয়ে বিদ্ধ করেছে মহিলার বুকে। লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

বৃদ্ধ সর্দারজির বেশে মুস্তাক মিঞাদাদ চাপা গলায় বাহবা দিয়ে ওঠে, শাবাশ বেটা!

পরমুহূর্তেই দেখা গেল ভাঙা সার্সি-পাল্লার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ঘুম-ঘুম চোখে একটি কিশোরী। আহা, কতই বা বয়স হবে ওর? বারো কি তেরো। হোক কাফের! তবু ওই নিরস্ত্র অসহায় কিশোরী মেয়েটির বুকে ফায়ার করতে ইতস্তত করল আগা রহমত। সর্দারজি গর্জে ওঠে : রহমত! চালাও গোলি! শালী কাফেরকা বাচ্চি!

ঠিক তখনই ওই কিশোরী মেয়েটিকে আড়াল করে দাঁড়াল একজন বি. এস. এফ. জওয়ান। এবার আর ইতস্তত করল না আগা রহমত। সতের বছরের তরুণ মুজাহিদিন সে—'কামিকাজে' গ্রুপের! অর্থাৎ 'সুইসাইড স্কোয়াডে'র জঙ্গী। গর্জে উঠল তার হাতের AK-47।

লেকিন ওই হারামজাদা কাফের গুলি খেয়েও তার জবাব দিল। গর্জে উঠল তারও হাতের রাইফেল। বোধকরি দুটো ঘোড়াই একসঙ্গে টেনে দিয়েছে সে! একটা বুলেট বিঁধেছে শার্প শ্যুটার মকবুলের মাথায়। লুটিয়ে পড়ল সে মৃত্যুশয্যায়। আগা রহমতের বাম বাহুতে দ্বিতীয় বুলেটটা বিঁধেছে।

'আল্লাহ্'!— বলে সেও শুয়ে পড়ল।

pathagar.net

।। ছয় ।।

ঘণ্টাতিনেক পরের কথা। পুব আকাশ ক্রমশ ফরসা হয়ে উঠছে। তার আগেই এলাকার ব্ল্যাক-আউট শেষ হয়েছে। এখন প্রতিটি কোয়ার্টার্সে জ্বলছে আলো। রাস্তার জোরালো নিয়ন বাতিগুলোও। কিন্তু জনমানবের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। সবাই লুকিয়ে আছে। ইতিমধ্যে অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডান্ট নরেশকুমারের নেতৃত্বে বি. এস. এফ. ক্যাম্পের জওয়ানেরা ঘিরে ফেলেছে গোটা এলাকাটা। বাড়ির দেওয়াল বা গাছের আড়ালে পোজিশন নিয়েছে এক-একজন। এ. সি. নরেশকুমার হট-লাইনে দিল্লি হেড-কোয়ার্টার্সে সব খবর জানিয়েছেন। সেখান থেকে জানানো হয়েছে বি. এস. এফ.-এর স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল ভি. এন. সিং একটি জঙ্গী বিমানে রওনা হয়ে গেছেন। কমান্ডো আর শার্প-শুটারদের স্পেশাল প্লেনে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

কতজন জঙ্গী ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকে পড়েছে তা এখনো আন্দাজ করা যায়নি। কেউ বলে অন্তত ছয় থেকে নয়জন। কারও মতে, ওরা আছে মাত্র চারজন। একটি জঙ্গীর মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে আছে। মকবুলের।

সংখ্যায় যতই হোক, সবাই আশ্রয় নিয়েছে গেটের বাঁ দিকের প্রথম সি-টাইপ কোয়ার্টার্সে—এটার একতলায় থাকেন কনস্টেবল মহাদেবন মুনিয়ারাজান্না। প্রথম আক্রমণটা হয় তাঁর বাড়িতেই। একতলার একটি জানলার সার্সি পাল্লা ভেদ করে অনেকগুলি বুলেট প্রবেশ করেছে ও-ঘরে। কেউ হতাহত হয়েছে কি না এখনো জানা যায়নি। কারণ জঙ্গীরা ওই অ্যাপার্টমেন্টের সদর দরজায় একটা হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে দরজাটা ভেঙে ফেলে। সবাই মিলে ভিতরে ঢুকেছে। এখনো পর্যন্ত—হিসাব মতো—বারো জন পণবন্দী হয়ে পড়েছেন। একতলার তিন-তিনটি ফ্ল্যাটের সবাই। মুনিয়ারাজান্নার পরিবারের চারজন, স্যাম নাথানিয়েলের সংসারের চারজন, আর আবদুল কাসেম সস্ত্রীক; তাঁদের দুটি ছেলে-মেয়ে। একুনে বারোজন।

দ্বিতলেও ছিল তিনটি পরিবার ; কিন্তু দ্বিতলের সবাই পিছন দিকের স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছেন। তাঁদের ধারণা, মুনিয়ারাজান্নার পরিবারে কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু ওই ফ্ল্যাটে একজন ফরাসি মহিলা রাত্রিবাস করছিলেন। তাঁর কী হয়েছে কেউ বলতে পারছে না। তিনিও পণবন্দি হয়ে থাকলে বন্দির সংখ্যা বারো নয়— তেরো।

একতলায় এগারোজন বন্দিকে জঙ্গীরা বন্দুক উঁচিয়ে তিনতলার চিলেকোঠার ঘরে আটক করে রেখেছে। ঘরটি আকারে বড় নয়। লম্বায় চার মিটার, চওড়ায় তিন। দশ-বারো জন আতঙ্কিত মানুষ সেখানে ঠাসাঠাসি করে বসে আছে। ওদের পাহারায় আছে সতের বছরের কিশোর আগা রহমৎ। তার বাহুতে মহাদেবন নিক্ষেপিত বুলেটটা একটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে হাতটা। লোকটা ভ্রূক্ষেপ করেনি। ডান হাতে AK-47 নিয়ে সে এতগুলি লোককে পাহারা দিচ্ছে।

পণবন্দিদের মধ্যে জওয়ান পুরুষ মাত্র তিনজন : স্যাম নাথানিয়েল, আবদুল কাসেম আর তাঁর উঠতি জোয়ান ছেলেটা : মজিদ। মহিলা আছেন চারজন : মিসেস নাথানিয়েল,

boiRboi.net

তাঁর মেয়ে ডরোথি, সাকিনা-আম্মা, আর মিস পামেলা নাইটিঙ্গেল। বাকি পাঁচটি বালক-বালিকা বা দুগ্ধপোষ্য শিশু।

পুষ্পার বাহুমূলে একটা ব্যান্ডেজ। পামেলাই বেঁধে দিয়েছেন। স্যাম নাথানিয়েলের বাড়িতে একটা ফার্স্ট এইড বাক্স ছিল। তারপর পামেলা আগা রহমতের ক্ষতটাতেও ব্যান্ডেজ বাঁধতে এগিয়ে এসেছিলেন। দৃঢ় প্রতিবাদ করেছিল রহমৎ। তার ধারণা হয়েছিল, ওইভাবে কায়দা করে ওর ডান হাতের AK-47টা, পণবন্দিরা বুঝি হাতিয়ে নিতে চায়।

মিঞাদাদ এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে AK-47 অস্ত্রটা তুলে নিয়ে পামেলাকে বলল, ঠিক হ্যয় সিস্টার! অব পট্টি বাঁধ দিজিয়ে।

ভোরের আলো তখন সবে ফুটছে।

ইতিমধ্যে বি. এস. এফ. জওয়ানেরা একটি মাইক্রোফোন এনে বসিয়েছে। লাউড স্পিকার সহ। পামেলার ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হতে-হতেই লাউড স্পিকারে উর্দুতে ঘোষিত হল : বন্দিপুর বি. এস. এফ. ক্যাম্পের অনধিকার প্রবেশকারী জঙ্গীদের সম্বোধন করে বলছি : আপনাদের আমরা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছি। পালাবার চেষ্টা করলেই গুলিবিদ্ধ হতে হবে। আত্মসমর্পণ ছাড়া আপনাদের দ্বিতীয় কোনো রাস্তা খোলা নেই। পণবন্দিদের অক্ষত অবস্থায় হস্তান্তরের বিনিময়ে আপনাদের কী দাবি তাই এবার বলুন? আপনাদের সঙ্গে একটি ট্রান্সমিটার রয়েছে, আমরা জানি। সেটাকে 'অফ্' করে রেখেছেন কেন? প্রকাশ্যে আপনাদের শর্ত জানাতে যদি আপত্তি থাকে, তাহলে ট্রান্সমিটারটা চালু করে জবাব দিন!

সিস্টার নাইটিঙ্গেলের ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হয়েছিল। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। জঙ্গীদের উপর একবার চোখ বুলিয়ে সমঝে নিলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী তিনি। মুস্তাক মিঞাদাদকেই দলপতিরূপে চিহ্নিত করলেন অনায়াসে। তাকে বললেন, সে সামথিং ইন রিপ্লাই। টেল দেম অ্যাবাউট য়োর ডিমান্ডস লাইক য়ুজুয়াল ড্যাকয়েটস্—য়ু আর নট জোম্বি! অর ডাম্ ঈডিয়টস্!

ধ্বক করে জ্বলে ওঠে মিঞাদাদের চোখ দুটো। দলপতি সে। গালাগাল শোনা তার ধাতে নেই। দাঁতে দাঁত চিপে বলে : সোচ্-সমঝ্কে বাৎচিৎ কিজিয়ে মেমসাব, নেহি তো...

—নেহি তো?—জানতে চান পামেলা।

মিঞাদাদ জবাব দেয় না। হাতে ধরা কালাশনিকঁফটা তুলে দেখায়।

অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন পামেলা। বলেন, হাঃ। বড়ে বাহাদুর হ্যাঁয় আপ্। তোমরা দেখ AK-47 হাতে থাকলে ইনি একজন নিরস্ত্র মহিলার সঙ্গে যুদ্ধে লড়তে ভয় পান না। কী দুর্ধর্ষ বীর, এই পাকিস্তানি সোলজারটি—

—ম্যয় পাকিস্তানি নহী হুঁ!

—তো?

pathagar.net

মিঞাদাদ জবাব দেয় না। আগা রহমতের দিকে ফিরে পুস্তুভাষায় বলে, এই AK-47টা ধর। পাহারায় থাক। কেউ কোনো অছিলায় কাছে ভিড়তে চাইলে খুলি উড়িয়ে দিবি। আমি দেখি, জিপটার দিকে যাবার কোনও ফাঁক-ফোকর খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

রহমত জানতে চায়, অগর কোই টয়লেটমে যানে চায় তো?—

—সিঁড়ির নিচেই বসে থাকবে আবদুল জব্বর। ওকে ডেকে দিবি। বিনা পাহারায় কাউকে যেতে দিবি না।

আবদুল উত্তর-পাকিস্তানের লোক। পুস্তু বুঝতে পারে। এই সময় সে বলে ওঠে, ভাইসাব! আমাকে এবার ছুট্টি দিয়ে দাও। আমার ডিউটি ছিল তোমাদের পথ চিনিয়ে এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া। তা আমি দিয়েছি। কিন্তু এখন আমি নিজেই ফেঁসে গেছি। তুমি তো জানই, কাঁল রাতে উজিরে আজম...

মিঞাদাদ ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, তো?

—আমাকে সারেন্ডার করতে দাও। আমি মুজাহিদিন নই। রেগুলার পাকিস্তান আর্মির। আমার উপর অর্ডার—উজিরে-আজমকী টি.ভি. অ্যানাউন্স মোতাবেক...

মিঞাদাদ বললে, তো যাও, জানলার কাছে গিয়ে সে কথা বল—

আবদুল জব্বর বলে, কিন্তু আমাকে দেখতে পেলেই যদি ওরা গুলি করে? তুমি তার চেয়ে ওই মেমসাহেবকে বলতে বল যে, আমাদের দলে একজন পাকিস্তান-আর্মির রেগুলার সোলজার আছে। সে সারেন্ডার করতে চায়। স্রেফ একজন। ওরা ইন্তেজাম করুক।

মিঞাদাদ বলে, তাহলে প্রথমে তোমার অটোমেটিক আর রিভালভারটা জমা দিতে হবে। তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু অস্ত্রগুলো কেন বেহুদ্দো ওই কাফের বাচ্চাদের দিতে যাব?

জব্বর এককথায় রাজি। যন্ত্র দুটো হস্তান্তরিত করল। মিঞাদাদ এবার সিস্টার নাইটিঙ্গেলকে বললে, আপনি মেমসাহেব। আপনার ভয় নেই। জানলার ধারে গিয়ে ঘোষণা করুন—একজন রেগুলার পাক-সৈনিক সারেন্ডার করতে রাজি—ওরা এন্তাজাম করুক।

পামেলা পুস্তু ভাষা ভালই জানেন। গজনীতে তিনি একটি চার্চ-সংলগ্ন হাসপাতালে পাঁচ বছর সেবা করেছেন। ধর্মান্ধ তালিবান মৌলবাদীরা ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতালসহ চার্চটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার পর অনেক কষ্টে কাশ্মীরে চলে আসেন। কিন্তু তাঁর হাবেভাবে তিনি বুঝতে দিলেন না যে, পুস্তু ভাষাটা তাঁর জানা। বললেন, আমাকে এজন্য কী মজুরী দেবে?

—মজুরী? ও আচ্ছা। কী চাও বল?

—শিশু তিনটিও ওই পাকিস্তানি সোলজারের সঙ্গে ওদিকে যাবে।

—না, কিছুতেই নয়।

পামেলা বললেন, অলরাইট। অ্যাজ য়ু প্লিজ।

তিনি এগিয়ে গেলেন। খোলা জানলার দিকে নয়। দোতলার ঝোলা বারান্দায়। মাথার উপর হাত তুলে। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বললেন, আমি এখানকার লোকাল

pathagar.net

চার্চের নান। ঘটনাচক্রে পণবন্দি হয়ে পড়েছি। আমাকে এঁরা জানাতে বলেছেন যে, ওঁদের ছয়জনের মধ্যে একজন হচ্ছেন রেগুলার পাকিস্তান আর্মির। তিনি সারেন্ডার করতে চান। তাঁর কথা তিনিই এবার এসে বলবেন। আপনারা তাঁকে দেখে গুলি চালাবেন না।

সিস্টার ফিরে এসে জববরকে বললেন, যাও, এবার নিজমুখে গিয়ে বল, যা বলতে চাও।

জববর ঝোলা বারান্দার দিকে এগিয়ে এল মাথার উপর দু'হাত তুলে। চিৎকার করে বললে, ম্যয় রেগুলার পাকিস্তান ফোর্স কী জওয়ান হুঁ। আপ্‌নে জরুর সুনা হ্যঁয় কি কাল টেলিভিশন-মে পাকিস্তানি হুকুমৎকা উজিরে-আজম জনাব নওয়াজ শরিফ নে ক্যা ফর্মান দি...উন্‌হোনে হুকুম দিয়ে কি হম্ সব পাকিস্তান মে লৌট যায়...

পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, পাকিস্তান নেহী জনাব! জাহান্নম মে! যাও! ম্যয় খুদ ভেজ দেতা হুঁ...

জববর পিছন ফিরে দেখতে গেল বক্তাটি কে। পারল না। তার আগেই মিঞাদাদের রিভলভার ওর সে কৌতূহল মিটিয়ে দিল। একবার টলে উঠল জববর, তারপর উল্টে পড়ল বারান্দার রেলিং টপকে একতলার মেঝেতে।

মিঞাদাদ তখনো বলে চলেছে : হারামজাদ! বেইমান!

হঠাৎ রিভলভার উঁচিয়ে— সেটা দিয়ে তখনও ধোঁয়া বার হচ্ছে—মিঞাদাদ সিস্টারকে প্রশ্ন করে, তুম্‌নে কেঁউ বেইমানি কী?

—কৌন সি বেইমানি?

—কেঁউ বাতায়া কি ম্যয় ছেই জওয়ান হুঁ?

—তাতে কী হলো? তুমি তো বারণ করনি সে কথা বলতে?

—এরকম বেইমানি দ্বিতীয়বার কর না। বুঝলে?

পামেলা বললেন, হ্যাঁ জানি। তোমার এক হাতে রিভলভার এক হাতে AK-47। আমার তা নেই। কিন্তু আমার হেপাজতে যা আছে তোমার যে তা নেই, ডিয়ার ফ্রেন্ড।

ভ্রূ দুটি কুঁচকে ওঠে মিঞাদাদের। বলে, বহ্ ক্যা?

—মৃত্যুকে জয় করে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার হিম্মৎ। কথাটার মানে তুমি বুঝবে না। তুমি তো ভয়ে থরথর করে কাঁপছ। পালাবার পথ খুঁজছ। লাইক দ্য প্রভার্বিয়াল র‍্যাট ফ্রম দ্য সিঙ্কিং শিপ! আর তাই তো নিজের দলের লোককে গুলি করে মারলে!

।। সাত ।।

বারো ঘণ্টা অতিক্রান্ত। এখন বেলা দুটো। দিল্লি থেকে উড়ে এসেছেন বি. এস. এফ.-এর স্পেশাল ডি. জি., ভি. এন. সিং এবং ব্ল্যাকক্যাট কমান্ডো আর শার্প শ্যুটারের দল। এদিকে 'হারাধন'-এর পুত্রসংখ্যা আরও কমেছে। ছিল ছয়, মিঞাদাদের গুলিতে কমে হয়েছিল পাঁচ। বেলা একটা নাগাদ মারা গেল সেলিম আলী আর ইয়াকুব খান। ওরা দারুণ কৌশল করেছিল। ছয়টি ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্ট হাতড়ে যোগাড় করেছিল কিছু ভারতীয়

pathagar.net

জওয়ানের য়ুনিফর্ম। তারপর সবার অলক্ষ্যে টয়লেটের স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। ওদের আশা ছিল—বি. এস. এফ.-এর য়ুনিফর্মই ওদের রক্ষা করবে। তাই করেছিল প্রথমটা ;কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। গেটের কাছাকাছি ভারতীয় জওয়ানেরা ওদের দু'জনকে চ্যালেঞ্জ করে। ওরা জবাবটা দিতে চায় আগ্নেয়াস্ত্রে। তার আগেই ভারতীয় জওয়ানদের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

এখন পণবন্দিরা মাত্র তিনজন জঙ্গীর হাতের ক্রীড়নক। দলপতি জনাব মুস্তাক মিঞাদাদ, অলবাহার, আর সপ্তদশবর্ষীয় 'কামিকাজে' আগা রহমত। তিনজনেই আফগান রিলিজিয়াস টেররিস্ট দলের।

বেলা দুটো নাগাদ মিঞাদাদ অলবাহারকে অর্ডার দিল, একতলা-দোতলার ছয়-ছয়টা রান্নাঘর তল্লাশি করে দেখতে— বিস্কুট, পাঁউরুটি, দুধ কিছু পাওয়া যায় কি না। হুকুমটা দিল সে পুস্তু ভাষায়।

এবার আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না সিস্টার নাইটিঙ্গেল। পুস্তুতেই বললেন, লুক হিয়ার মিস্টার সেল্‌ফিশ জায়েন্ট! তা যদি পাওয়া যায়, তাহলে এই পাঁচটা শিশুর চোখের সামনে বসে তোমরা তা গিলো না, প্লিজ। ওই পাঁচটা শিশুও সকাল থেকে অভুক্ত। ওদের অন্তত এইটুকু সান্ত্বনা নিয়ে মরতে দাও যে, ওরা মরেছে কিছু ধর্মান্ধ কাপুরুষের নৃশংসতায়! পিশাচের পৈশাচিকতায় নয়।

—ক্যা কহা! চোপ্ রও হারামজাদি!

লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে অভুক্ত, ক্লান্ত, হতাশায় ভেঙে পড়া মিঞাদাদ। অহেতুক মেঝেতে একটা পদাঘাত করে। রিভলভারটা তুলে নেয় হাতে। সেফ্‌টি ক্যাচটা সরাতে যায়।

তৎক্ষণাৎ একটা চিতাবাঘের মতো লাফ দিয়ে পড়ে আগা রহমত। একই স্বরগ্রামে চিৎকার করে ওঠে : খামোশ!

চেপে ধরে সে দলপতির হাত। মিঞাদাদ স্তম্ভিত। ঘুরে দাঁড়ায়।

—ক্যা কহা তুম্‌নে?—প্রশ্ন করে মিঞাদাদ।

আগা রহমতের বাঁ-হাতে স্লিং বাঁধা। ডান কাঁধে AK-47। দৃঢ়স্বরে সে বললে, বহ্ মেমসাব কাফের নহী! ও ভারতীয়ও নয়। খামোকা খিস্তি করছ কেন? ভদ্রভাষায় কথা বল!

নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেয় মিঞাদাদ। বলে, তুই আমার মুখে মুখে তর্ক করছিস? তুই? আমার? এতবড় স্পর্ধা তোর?

ওর প্রশ্নের মধ্যে উত্তেজনার সঙ্গে মিশেছে বিস্ময়। আর বোধকরি তার সঙ্গে আতঙ্ক। এই ক্রান্তিকারী মুহূর্তে মেদিনী যে রথচক্র গ্রাস করতে পারে এটা সে আন্দাজ করেনি। আগা রহমত যে ওর নিজে হাতে গড়া—সন্তানের মতো!

আগা রহমত একই কণ্ঠস্বরে বললে, আমার মেজাজ শরিফ নেই, সর্দার!

হঠাৎ দু'জনের মাঝখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অলবাহার। পুস্তুতেই বলে, কী পাগলামি শুরু করেছে তোমরা দু'জন? এই কি নিজেদের মধ্যে লড়াই কাজিয়ার ওয়াক্ত?

pathagar.net

মিঞাদাদ সামলে নিল নিজেকে। অলবাহারকে বললে, এই বেয়াদপটাকে জিজ্ঞেস কর, ও কী চায়? না খেয়ে মরতে?

আগা রহমত সমান তেজের সঙ্গে বলে, আমি তো 'কামিকাজে'। সুইসাইডাল স্কোয়াডের জিন্দা কই মাছ! খেয়ে মরলাম কি না খেয়ে মরলাম তা কি ইসলামের ইতিহাসে কোথাও লেখা থাকবে? লেকিন এ বাড়িতে দুধ-রুটি যদি কিছু থাকে তবে সবার আগে তা খাবে ওই বাচ্চাগুলো। ধেড়েরা নয়।

যেন সুপ্রীম কোর্টের রায়!

মিঞাদাদ জবাব দিল না। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল হাত নেড়ে। নিশ্চুপ গিয়ে বসল সিঁড়ির ধাপে।

অলবাহার রহমতের চেয়ে বয়সে বছর-সাতেকের বড়। সে আগা রহমতকে বললে, তুই ঠিকই বলেছিস রে। ওই মেমসাহেবকে নিয়ে নিচে যা। দেখ খুঁজে কিছু খাবার-টাবার পাওয়া যায় কি না। সবার আগে ওই বাচ্চাগুলোকে খেতে দিতে হবে—তা হোক না কেন ওরা কাফের।

আবার রুখে ওঠে আগা রহমত, কে কাফের? ওই আবদুল কাসেম? না তার জরু সাকিনা বিবি? কিংবা তাদের ওই ছেলেটা মজিদ? অথবা তাদের ওই বাচ্চাগুলো?

অলবাহার ওকে মাঝপথে থামিয়ে দেয় : কেন ফালতু তর্ক করছিস আগা? যা বলছি কর—

।। আট ।।

চৌদ্দই জুলাই। সন্ধ্যা সাতটা। পরলোকগত শহিদ বি. এস. এফ.-এর জি. আই. জি. শিশির কুমার চক্রবর্তীর মরদেহ এসে পৌঁছেছে দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে। শবাধারের দুইপাশে গার্ড-অব-অনার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জওয়ানেরা। অন্ধকার এখনো ঘনিয়ে আসেনি। শবাধারটি কাচের। শ্বেতপদ্মে ঢাকা পড়েছে সারাটা দেহ। শুধু মুখটি দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে আছেন তিনি।

দুঃসংবাদ পেয়ে তাঁর স্ত্রী মুক্তাদেবী পুত্র-কন্যাকে নিয়ে আগরতলা থেকে চলে এসেছেন দিল্লিতে। উঠেছেন চিত্তরঞ্জন পার্কে। সেখান থেকে এসেছেন পালাম বিমানঘাঁটিতে। শবাধার থেকে সামান্য দূরত্বে একটি সোফায় বসে আছেন তিনি। একপাশে কন্যা : শিল্পী। কান্নায় ভেঙে পড়েছে। অন্য পাশে পুত্র সন্তোষ—ক্লাস সেভেনে পড়ে। ওদের মুখ চেয়ে নিরুদ্ধ অশ্রুর বন্যাকে আটকে রেখেছেন মুক্তাদেবী। কান্নার দিন তো পড়েই আছে! সেসব আগরতলায় ফিরে।

সংবাদ পেয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি আর স্বরাষ্ট্রসচিব কমল পাণ্ডে। সঙ্গে আদবানির কন্যা প্রতিভা। সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন ওঁরা শোকস্তব্ধ পরিবারকে।

স্বরাষ্ট্রসচিবের দিকে ফিরে আদবানি বললেন, কারগিল যুদ্ধে পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়েছে। এবার ওরা এইভাবে নিরীহ ভারতবাসীর উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাবে।

pathagar.net

তুমি আজই প্রত্যেকটি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবকে জরুরি সার্কুলার জারী করে সতর্ক করে দাও। শিশিরকুমারের মৃত্যুর দুর্ঘটনা যাতে কোথাও দ্বিতীয়বার না ঘটে।

বন্দিপুর থেকে একে-একে অন্যান্য শহিদদের মরদেহও এসে পৌঁছাচ্ছে। প্রত্যেকটি শবাধার তাঁদের নিজ নিজ শহরে অথবা গাঁয়ে প্রেরণ করা হবে সামরিক মর্যাদায় শেষকৃত্য করতে।

।। নয়।।

হিসাবে আমার কিছুটা ভুল হয়ে গেছে। পরের কথা আগে লিখে বসে আছি। চৌদ্দই জুলাই সন্ধ্যার আগে বলতে হবে সেদিন দ্বিপ্রহরের কথা।

জনাব মিঞাদাদের অনুমতি পেয়ে সাকিনা-আম্মা আর সিস্টার নাইটিঙ্গেল নেমে এলেন নিচের তলায়। ছয়টি ফ্ল্যাট তল্লাশি করে অনেক কিছুই পাওয়া গেল—দুধ, মাখন, পাঁউরুটি, ডিম, কলা ইত্যাদি। রাইফেল হাতে দোতলার একটি ঘরে পণবন্দিদের পাহারা দিতে বসল স্বয়ং মিঞাদাদ। তার মাজায় বাঁধা লোডেড রিভলভার। অলবাহার খুঁজছে পালাবার কোনও ফাঁকফোকর। আর নিচের তলার রান্নাঘরে একটা টুল টেনে নিয়ে AK-47 হাতে পাহারায় বসেছে আগা রহমত।

সিস্টার প্রথমেই দুধটা জ্বাল দিলেন একটা বড় ডেক্‌চিতে। তারপর পাঁচ-সাত পিস্ টোস্ট বানিয়ে আর পাঁচ গ্লাস দুধ সাজিয়ে দিলেন একটা ট্রেতে। সাকিনা-আম্মা ট্রে-টা নিয়ে বাচ্চাদের খাওয়াতে আবার দ্বিতলে উঠে গেলেন। সিস্টার চাল ধুয়ে একটা হাঁড়িতে বসিয়ে দিলেন। ডিমের ঝোল আর ভাত বানাবেন বাকি সকলের জন্য। শত্রুমিত্র সবাই একসঙ্গে মধ্যাহ্ন-আহার করবে। 'ইফ্‌তারি'ও বলতে পার তাকে!

টুলে বসে থাকা আগা রহমত হিন্দুস্থানীতে প্রশ্ন করে, আপনি এত ভাল পুস্তু শিখলেন কোথায়?

সিস্টার আলু কাটতে কাটতে বললেন, বলছি, তার আগে বল, তোমার বাড়িতে কে কে আছেন? তুমি যে আফগান, তা বুঝেছি।

আগা রহমত বললে, এক বড়ী বহিন আছেন, এই আপনারই বয়সী। আমার জিজাজি তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে।

—তোমার বাবা, মা? ভাই-বোন?

—আম্মা শৈশবেই মারা গেছেন। বাবা থেকেও নেই, মানে নিকা করে আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি আর আমার ছোট বোন মুন্নি দিদির কাছেই মানুষ হয়েছি। মুন্নি ছিল আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট। গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়।

সিস্টার অভ্যাসবশে বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকেন। জানতে চান, তোমার দিদির বাচ্চাটাচ্চা নেই। আবার নিকা করেনি?

—না। দিদির যে একটা হাত নেই। সে গজনীর জামা মসজিতে ভিক্ষা করে নিজের পেট চালায়।

—ইস্! হাত নেই! অ্যাক্‌সিডেন্টে কাটা গেছে?

pathagar.net

—জী হাঁ। আমার ওই ছোটি বহিন মুন্নিকে বাঁচাতে গিয়ে। মিলিটারি ওয়েপন-কেরিয়ারের ধাক্কা লেগে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। বলে, বিশ্বাস করবেন সিস্টার, দু'-দুটো মানুষকে চাপা দিয়েও ড্রাইভার শালা গাড়িটা থামায়নি। দিদি ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছিল। আর মুন্নি—

AK-47টা নামিয়ে রেখে ডান হাতে সে পাগড়ির প্রান্ত দিয়ে মুখটা চাপা দেয়।

আগা রহমতেরও ছিল পাঞ্জাবী শিখের ছদ্মবেশ। মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। হাতে কড়া, চুলে কাঁকুই আর কোমরবন্ধে কৃপাণ। ধীরে ধীরে টুলের উপর পুনরায় বসে পড়ে।

পামেলা বলেন, থাক, ওসব কথা! বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে..

—না, থামব না। আপনাকে বললে মনটা হালকা হবে সিস্টার। মিলিটারি ক্যারাভান যাচ্ছিল, গায়ে-গায়ে লেগে। একটা গাড়িও দাঁড়ায়নি। মুন্নির ছোট্ট দেহটা চাকার পরে চাকার তলায় পড়ে পিণ্ডি পাকিয়ে...

—স্টপ ইট!... তুমি অন্য কথা বল। তুমি নিজেকে 'কামিকাজে' বলছিলে। ও কথাটার মানে কী, জান?

—জানি। ধর্মযুদ্ধের জেহাদে যারা সুইসাইডাল স্কোয়াডে নাম লেখায় তাদের বলে 'কামিকাজে'। ইসলামের প্রচারে কাফেরদের যারা...

—না, রহমত। য়ু আর কম্প্লিটলি মিস্‌টেকন্। 'কামিকাজে' শব্দটা জাপানী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে একদল জাপানী তরুণ ওই 'কামিকাজে স্কোয়াড' গড়ে তোলে। ধর্মের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। দেশের স্বাধীনতার জন্য তারা স্বেচ্ছা-শহিদ হতে চেয়েছিল। তা তোমাদের দেশ তো স্বাধীন?

—স্বাধীন! আফগানিস্তান আজ স্বাধীন? সেটা তো শাসন করছে একদল মৌলবাদী তালেবান। তাদের ক্যারাভানেই তো মুন্নি...

—ফর য়োর ইনফরমেশান, আগা রহমত। ওই যে ছোট্ট মেয়েটি কাল রাত্রে তোমাদের গুলিতে মাতৃপিতৃহীন হয়েছে, ওর নামও মুন্নি! কাল ছিল তার দশম জন্মদিন। ওর জন্মদিনে নিমন্ত্রণ রাখতেই এসেছিলাম আমি। না হলে কাল রাত্রে তোমাদের হাতে পণবন্দি হয়ে পড়তাম না।

আগা রহমত উঠে দাঁড়ায়। এই কাকতালীয় নামের ধাক্কায় সে কিছু বিচলিত। কী একটা কথা বলতে যায়। বলে না। বা বলতে পারে না। আবার ধীরে ধীরে টুলে বসে পড়ে।

—তোমার কথা বল। তুমি 'কামিকাজে' দলে নাম লেখালে কেন? ইসলাম ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে?

—না, সিস্টার! আমি নিজে নাম লেখাইনি। আমার আব্বাজান... পাঁচশ দিনার হাত পেতে নিয়ে তার একমাত্র ছেলেটাকে বিক্রি করে দেয়। 'বন্ডেড-লেবার'—দেহ আর আত্মা। ওই তালেবান পলিটিক্যাল টেররিস্ট দের সংগঠনে। দু'বছর আগে। মুন্নি মারা যাবার ঠিক পরেই। আমার কিচ্ছু করার ছিল না। দু'বছর তালিম নেবার পর ধর্মযুদ্ধের

pathagar.net

'মৃত্যুপণ-সৈনিকে'র ব্রতয় আমাদের দীক্ষা দেন...

—কী হল? থামলে কেন? নামটা উচ্চারণ করতে কি ভয় হচ্ছে? নাকি ঘৃণা?

—না! আল্লাহ্‌র কাছে ওয়াদা করেছি নামটা কাউকে বলব না।

—বলতে হবে না, রহমত। আমি আন্দাজ করেছি। লোকটার নাম : ওসামা বিন লাদেন। মধ্যপ্রাচ্যের এক ধনকুবের। যিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহে তিনি মুসলমান ভিন্ন অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীকে বেঁচে থাকতে দেবেন না।

—গজনীর জামা মসজিদের মিম্‌বারে বসে তিনি স্বয়ং খুৎবা পাঠ করেন। আমার মতো বাহান্ন জন কিশোরকে ধর্মযুদ্ধে 'কামিকাজে' মন্ত্রে দীক্ষা দেন। কাশ্মীর থেকে জিন্দা ফিরে যাবার অধিকার আমার নেই। আমি আল্লাহ্‌র কাছে ওয়াদা করেছি। উনি স্বয়ং আমার হাতে তুলে দেন একটি আলা-ই-মুহ্‌লিখ্।

—আলা-ই-মুহ্‌লিখ্! তার মানে?

—ফার্সি শব্দ। মানে : 'মারাত্মক অস্ত্র'। সেকালে তার অর্থ ছিল ডবল-এজেড্ সোর্ড, এখন ওর অর্থ এইটা—AK-47টা তুলে দেখায়।

এমন সময় দ্বিতল থেকে নেমে এলেন সাকিনা-আম্মা। তাঁর হাতে সেই ট্রেতে তিনটি শূন্যগর্ভ দুধের পাত্র, কিন্তু দুটি অস্পর্শিত গ্লাস। পামেলাকে বললেন, মুন্নি আর পুষ্পা কিছুতেই খেল না। বললে, খিদে নেই।

টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আগা রহমত। বলে খিদে নেই মানে? সকাল থেকে মুখে কুটোটি কাটেনি, এখন বেলা দুটোর সময়েও খিদে নেই? দিন তো আমাকে ট্রে-টা।

সাকিনা-আম্মা থালাটা হস্তান্তরিত করলেন। আগা রহমত তার আহত বাঁ-হাতে ধরল সেটা। ডান হাতে তার AK-47। বলল, না, আপনারা দুজনও চলুন আমার সামনে সামনে।

পামেলা বলেন, তাহলে এতগুলি লোকের খাবার কে বানাবে?

—আপনিই। মুন্নিটাকে দুধটা পীলিয়ে নেমে আসতে তো পাঁচ মিনিট।

অগত্যা সিঁড়ি বেয়ে ওঁরা তিনজনে আবার দ্বিতলে উঠে এলেন। এখন পণবন্দিদের আটক রাখা হয়েছে দ্বিতলের একটি বড় ঘরে। তিনতলার চিলেকোঠায় মজুদ আছে জঙ্গীদলের নানান আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা-বারুদ।

ওদের তিনজনকে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে মিঞাদাদ জানতে চায় : ক্যাবাৎ?

আগা রহমত প্রতিপ্রশ্ন করে, অলবাহার কোথায় গেল?

—খতম্!

একটি মাত্র শব্দে মিঞাদাদ শুনিয়ে দিল অলবাহারের শেষ পরিণাম।

বাড়ির ওপাশের জলনিকাশী একটা ডাউন পাইপ বেয়ে সে পালাতে চেয়েছিল। পারেনি। ব্ল্যাকক্যাট কমান্ডো বাহিনীর শার্প শুটার তাকে পাকা আমটির মতো পেড়ে নামিয়েছে। ইতিমধ্যে জিপটাও হ্যান্ড-গ্রেনেডে ভস্মীভূত।

আগা রহমত এগিয়ে আসে মুন্নির দিকে। মুন্নি ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। জড়িয়ে ধরে দিদিকে। পুষ্পাও ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। ডরোথি উঠে দাঁড়ায়। আর্ত জিজ্ঞাসু

pathagar.net

নেত্রে বলে, ক্যা চাহিয়ে?

আগা রহমত তাকে জবাব দেয় না। আদুরে গলায় মুন্নিকে বলে, তু ডরতি কেঁউ রে মুন্নি? লে, দুধ পী লে। সুবেসে তো তু কুছ্ নেহী খায়ী!

মুন্নি অবাক বিস্ময়ে দশ সেকেন্ড নির্বাক তাকিয়ে রইল আগা রহমতের দিকে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, নেহী! ম্যয় নেহী পিউঙ্গি—

—লেকিন কিঁউ?

—তুমনে মেরি মাম্মিকো গোলিসে মার ডালা!

—নেহি রে মুন্নি! ইয়ে ঝুট হ্যয়! আল্লাহ্ কসম্! বহ্ থা মকবুল!

—তবে তুমি ড্যাডিকে মেরেছ! কী? মারনি? দিদির হাতেই বা কে গুলি মেরেছে? তুমি-তুমি-তুমি। ম্যয় জান্‌তি।

অপরাধীর মতো মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল আগা রহমত। গরম দুধের গ্লাসটা তখনো ওর হাতে ধরা।

পুষ্পা বললে, আপ্ মেহেরবানি করকে ইঁহাসে চলে যাইয়ে। মুন্নি আপসে ডরতি—

আগা রহমত মরমে মরে গেল। তার মনে হলো : এই মুন্নিটাকেও যেন একসার ধর্মান্ধতার ওয়েপন-কেরিয়ার দলিত-মথিত করে যাচ্ছে। আর সে নিজেও যেন একটি ওয়েপন-কেরিয়ারের ড্রাইভার। সসঙ্কোচে বললে, লেকিন ম্যয় তো...

কথাটা তার শেষ হলো না। পিছন থেকে জনাব মিঞাদাদ বলে ওঠে, অত খোশামোদের কী আছে রে আগা? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। যাকে দিবি সেই পীয়ে নেবে। দ্যাখ্ পরখ করে—

হঠাৎ আপাদমস্তক জ্বলে উঠল পুষ্পার। প্রতিহিংসার বারুদে ঠাসা অন্তঃকরণে সে এতক্ষণ দাঁতে দাঁত চিপে বসেছিল। মুমুর মুখ চেয়ে কাঁদতেও পারছিল না মায়ের মৃত্যুতে, বাপের দেহান্তে। মিঞাদাদের ওই কথাটা যেন সেই নিরুদ্ধ বারুদের স্তূপে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। মুহূর্তের মধ্যে হিতাহিত জ্ঞান হারালো কিশোরী মেয়েটি। চট করে উঠে দাঁড়ায়। আগা রহমতকে বলে, দিন তো? দুধটা আমার হাতে দিন।

আগা খুশি হয়। ট্রেটা বাড়িয়ে ধরে। আশা করে, দিদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মুন্নিকে দুধটা পীলাবে এবার। পুষ্পা সেদিক দিয়েও গেল না। দুধের গরম কাচের গ্লাসটা হাতে নিয়ে মিঞাদাদকে বলে, জী হাঁ। সচ্ কহা আপ্‌নে। তো পিজিয়ে! আপ্ ভি তো এক ভুখা কৌয়া হ্যয় না?

গরম দুধভর্তি কাচের গ্লাসটা সে সজোরে ছুঁড়ে মারল মিঞাদাদের মুখে। পাতলা ইয়ারা-গ্লাস। কপালে লেগে ঝন্‌ঝনিয়ে ভেঙে গেল গ্লাসটা। গরম দুধ আর রক্তে মেশানো একটা দুধে-আলতা ধারা নেমে এল মিঞাদাদের কপাল বেয়ে। বাঁ-চোখটা তার ঢাকা পড়ে গেল।

হঠাৎ যেন এক ধর্ষকামী হসিসিয়ূন (ঘাতক) মাথা ঝেড়ে জেগে উঠল মিঞাদাদের

pathagar.net

অন্তঃকরণে। প্রতিহিংসা কামনায় সে থরথর করে কাঁপছে। রিভলভারটা নামিয়ে রাখল পাশে। হাত বাড়িয়ে ছিনিয়ে নিতে গেল আগা রহমতের ডান কাঁধ থেকে ঝোলানো AK-47টা।

রহমত এক লাফে তিন-পা পিছিয়ে যায়। চিৎকার করে ওঠে আর্তকণ্ঠে : নেহী জী! খামোশ হো যাইয়ে...

মিঞাদাদ কর্ণপাত করল না। জোর করে আগা রহমতের ডান হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে গেল AK-47টা। চিৎকার করে উঠল, তু চুপ হো যা বেইমান!

—বেইমান?—অবাক বিস্ময়ে প্রতিপ্রশ্ন করল কিশোরটি।

—নেহী তো ক্যা? গুন্! হামে বারাঠো মুর্দা চাহিয়ে! সমঝা? তেরে সিওয়া ইস কামরেমে কোই নেহী বঁচেগা! অব-ওয়া-আজদাদ্ (পিতৃপুরুষেরা) বারাঠো কাফের মুর্দা মাঙতে হেঁ! তু সুন্তা হ্যাঁয় কি নেহী?—ছোড় দে মুঝকো!

কামরার প্রত্যেকটি মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে। বাচ্চারা কাঁদতে শুরু করেছে। তাদের মায়েরা বাচ্চাদের বুকের মধ্যে সাপটে ধরেছে। অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওরা লোকলজ্জা ভুলে গেছে। প্রিয়জনকে সবলে আঁকড়ে ধরেছে। যেমন এককালে গ্যাস-চেম্বারে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরত ইহুদিরা, হিটলারের জার্মানিতে।

ওরা চাইছে দৃঢ়-আলিঙ্গনের মধ্যেই যেন ঘনিয়ে আসে মৃত্যু!

অর্জুনের একটা হাত অকেজো—স্লিং বাঁধা। দগ্ধললাট দ্রোণাচার্য তাই বলপ্রয়োগে ছিনিয়ে নিতে পারল অটোমেটিক গানটা। যেটা দীক্ষার দিনে খিলাৎ পেয়েছিল আগা রহমত স্বয়ং বিন লাদেনের হাত থেকে।

গণহত্যা রোধ করতে বদ্ধপরিকর কিশোরটি নিরুপায় হয়ে সজোরে কামড়ে ধরল তার শিক্ষাগুরুর হাত। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড জোরে পদাঘাত করল মিঞাদাদ। আগা রহমত ছিটকে পড়ল তিন হাত দূরে। তার জখম-হওয়া বাঁ-হাতটাই আবার ধাক্কা খেয়েছে দেওয়ালে। অসীম যন্ত্রণায় একটা জান্তব আর্তনাদ করে উঠল সপ্তদশবর্ষীয় কিশোরটি।

এই সুযোগে সামনের দিক থেকে মিঞাদাদকে আক্রমণ করতে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এল মজিদ। কিন্তু তার আগেই মুস্তাক মিঞাদাদ তার AK-47-এর সেফটি ক্যাচ্টা সরিয়ে দিয়েছে। হাঁটু গেড়ে বসে জমির সমান্তরালে তুলে ধরেছে অটোমেটিকটা। মজিদ তখন আগ্নেয়াস্ত্র থেকে এক মিটার দূরত্বে। থমকে থেমে গেছে সে আচম্কা।

অট্টহাস্য করে উঠল মিঞাদাদ, ক্যা হুয়ারে বেটা! কিঁউ রুখ গয়ে?

রসিয়ে রসিয়ে গণহত্যা করবে বলেই কয়েকটা মুহূর্ত দেরি করে ফেলল মুস্তাক মিঞাদাদ! সেটাই তার জীবনের শেষ ভ্রান্তি। ওই আট-দশ সেকেন্ড দেরি না করলে গণহত্যা সুসম্পন্ন করতে পারত সে। কিন্তু পারল না।

ওই আট-দশ সেকেন্ডের ভিতরেই কনুইয়ে ভর দিয়ে গোখরো সাপের মতো ফণা তুলে উঠেছে আগা রহমত। আফগান-বাচ্চা হার মানেনি। যে রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে

pathagar.net

দিয়ে মিঞাদাদ কেড়ে নিয়েছিল অটোমেটিকটা—সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে ওই দশ সেকেন্ডের ভিতরেই সেই রিভলভারটা হস্তগত করেছে কিশোর 'কামিকাজে'।

অটোমেটিকটা তার 'খ্যাটা-খ্যাটা' শুরু করার আগেই ভূশয্যালীন কিশোরটির হাতে গর্জন করে উঠল সেই আগ্নেয়াস্ত্রটা!

বড় যত্ন নিয়ে টার্গেট-প্র্যাকটিস করিয়েছিল ওর গুরু। শায়িত অবস্থাতেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি সে। বুলেটটা নির্ভুল লক্ষ্যে বিদ্ধ করেছে মিঞাদাদের হৃদ্‌পিণ্ড। ধীরে, অতি ধীরে, প্রায় স্লো-মুভিং ফিল্মের মতো দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে পড়ল দলপতি মিঞাদাদ। আল্লাহ্ ওকে একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণের মতো সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও প্রার্থনামন্ত্রে সেটা বেহিসাবী খরচ করতে চাইল না মিঞাদাদ। ধীরে ধীরে ভূশয্যালীন প্রিয় শিষ্যের দিকে ফিরল। কী যেন একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করল সে প্রিয় শিষ্যের দিকে তাকিয়ে। পুস্তুতে।

ডরোথি মর্মান্তিক উত্তেজনায় চেপে ধরেছে পামেলার বাহুমূল। সোৎসাহে সে জানতে চায় : হোয়াট ডিড দ্যাট সেটান সে টু হিজ ডিসাইপ্‌ল্ ইন পুস্তু?

সম্মোহিতার মতো মিস পামেলা নাইটিঙ্গেল বললেন, হি সেড : 'এট্ টু ব্রুটাস'?

তাঁর খেয়াল হলো না, পুস্তু ভাষার মতো ল্যাটিনটাও ডরোথির কাছে গ্রীক!

।। দশ ।।

হেভিওয়েট চাম্পিয়ন বক্সার যেমন নক-আউট-কাউন্টিঙের শেষ পর্যায়ে উঠে দাঁড়ায়, সেই ভঙ্গিতে টলতে টলতে দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল আগা রহমত। তার ডান হাতে তখনো ধরা আছে রিভলভারটা। এখনো তা দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে। আহত বাঁ-হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। বললে, আপ্ সব শান্ত্ রহিয়ে। আপ্‌নে আপ্‌নে জগাহ্ প্যে বৈঠ যাইয়ে।

নির্দেশটা মেনে নিল সবাই। ঘরের দূরতম প্রান্তে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে পড়ে। যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে।

মিঞাদাদের ছদ্মবেশের গেরুয়া পাগড়িটা লুটাচ্ছিল মাটিতে। আগা রহমত প্রথমে রিভলভারটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। মিঞাদাদের বেকায়দায় পড়ে থাকা দেহটা সমান করে শুইয়ে দিল। তারপর নত হয়ে তার হাঁটু জোড়ায় নিজের ললাট স্পর্শ করল। গেরুয়া পাগড়িটার গ্রন্থি খুলে শিক্ষাগুরুর মরদেহটা আপাদমস্তক চাপা দিয়ে দিল। একমুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌তালার কাছে কী যেন প্রার্থনা করল।

তারপর সে চোখ মেলে তাকায়। সকলে রুদ্ধশ্বাস। কর্ণময়।

বিশুদ্ধ উর্দুতে কিশোরটি যা বললে তার মর্মার্থ :

পাঁচ মিনিট ওয়াক্ত আমি আপনাদের কাছে ভিখ্ মাঙছি। আমি ওয়াদা করছি : তারপর আপনারা সবাই আজাদী পেয়ে যাবেন। এ ঘর ছেড়ে চলে যাবেন। বাধা দিতে কেউ তখন থাকবে না। আমার জীবনের শেষ পাঁচটা মিনিট আমাকে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানাতে দিন। এই আমার শেষ মিনতি। আমি এ পর্যন্ত যা করেছি...থাক সেসব কথা!

boiRboi.net

আমি তো প্রায়শ্চিত্ত করেই যাচ্ছি...

সিস্টার দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকলেন। তিনি নিরুপায়।

দূর থেকে উঠে দাঁড়ায় মজিদ কাসেম। বলে, ভাইসাব, এক বাৎ পুঁছু?

আগা তার দিকে ফিরে বলে, পুছিয়ে। ক্যা পুছনা চাহ্‌তে হ্যঁয়।

মজিদ উর্দুতে বললে, আপনার সাথে কি আমরাও প্রার্থনা করতে পারি?

—আপ্‌কী মর্জি।

আগা রহমত মাথা থেকে গেরুয়া রঙের শিখ-পাগড়িটা খুলে পাশে রাখল। কাঁকুই-সমেত পরচুলোটাও। হাত থেকে কড়াটাকে বার করে রাখল তার পাশে। এবার সে হিপপকেট থেকে বার করল একটা ক্রচেটের কাজ করা সফেদ টুপি। পরে নিল মাথায়। এটা ওর দিদির উপহার। সে নিজে হাতে ওই ক্রচেটের কাজটা করেছিল—তার হাতটা কাটা যাবার আগে। আগ্নেয়াস্ত্রগুলি আগা পাশে রাখল। বসল পশ্চিমদিকে মুখ করে নিমীলিত নেত্রে। www.pathagar.net

ওপাশে আবদুল কাসেম, সাকিলা-আম্মা আর মজিদভাই নতজানু হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া মাঙছেন। সে কি শুধু প্রাণে বেঁচে গেলেন বলে?

এপাশে নাথানিয়েল সস্ত্রীক, সকন্যা দাঁড়িয়ে আছেন। নিমীলিত নেত্রে প্রার্থনা করছেন। সপরিবারে রক্ষা পাওয়ায় : থ্যাঙ্কস্ গিভিংই তো!

সিস্টার তখন মনে মনে প্রার্থনা করছেন, "Hear my prayer, O Lord, and let my cry come unto thee. Hide not thy face from me on the day when I'm in trouble."

হ্যাঁ, আজ তাঁর বড় বিপদের দিন। তাঁর উপস্থিতিতে একজন সপ্তদশবর্ষীয় কিশোর আত্মহত্যা করছে, অথচ বাধা দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

মুন্নি এপাশ ফিরে দেখল তার দিদি দু'চোখ বুজে, জোড়হস্তে বিড়-বিড় করে কী একটা গান গাইছে। সে দিদির কাছে সরে আসে। ওর মুখের কাছে কানটা নিয়ে যায়। চেনা গান : "ঈশ্বর-আল্লা তেরে নাম/সবকো সম্মতি দে ভগবান!"

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দে খান খান হয়ে ভেঙে গেল প্রার্থনাকক্ষের নৈঃশব্দ।

ডান হাতে নিজের কানের কাছে রিভলভারটা ছুঁইয়ে ট্রিগার টেনে দিয়েছে আগা রহমত। তার মৃতদেহটা পড়ে আছে বেকায়দায়।

একে-একে সবাই ঘর ছেড়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলেন। তাঁরা আর পণবন্দি নন। মুক্ত! তবু কেউ আনন্দের উল্লাসে চিৎকার করে উঠতে পারলেন না। ওদিকে খবর রটে গেছে, জঙ্গীরা কেউ বেঁচে নেই। পণবন্দিরা মুক্ত। অক্ষত। ওঁরা বাইরে থেকে পরপর দুটো ফায়ারিঙের শব্দ শুনেছেন। কে মারল? কাকে মারল?

সিঁড়ি দিয়ে সবাই ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছেন। সবার পিছনে সিস্টার আর ওরা দুই বোন। ঘর খালি হলে পুষ্পা পামেলাকে বলে, প্লিজ ট্যারি অ্যা-হোয়াইল!

—বাট হোয়াই?

পুষ্পা জবাব দেয় না। এগিয়ে যায় বেকায়দায় পড়ে থাকা আগা রহমতের মৃতদেহটার কাছে। তাকে ঠিক করে শুইয়ে দেয়। আগা যেমন দিয়েছিল মিঞাদাদকে, ঠিক সেই ভঙ্গিতে। বয়সে ওই কিশোরটি ওর চেয়ে বছর-চারেকের বড়। অসঙ্কোচে ওর হাঁটু-জোড়ায় মাথা ঠেকাল পুষ্পা। পাশে পড়ে থাকা শিখ-পাগড়িটার পাক খুলে সযত্নে আবৃত করে দিল আগা রহমতের মৃতদেহটা। শিখের গৈরিক পাগড়িটাই যেন হয়ে গেল সাচ্চা মুসলমানের সাচ্চা কফন।

সিঁড়ি দিয়ে তখন উঠে আসছে কমান্ডো জওয়ানেরা।

হঠাৎ সিস্টারের হাত ছাড়িয়ে মুন্নি এগিয়ে গেল ঘরের ভিতর। নিচু হয়ে সে যেন কী করছে।

—হোয়াট আর য়ু ডুয়িং দেয়ার, মুন্নি?

মুন্নি তার ছোট্ট হাতটা তুলে দেখায় ছোট্ট একটা কাঠের কাঁকুই। বলে, আয়াম কলেকটিং আ স্যুভেনির ফ্রম ব্রাদার আগা রহমত।

পামেলা নাইটিঙ্গেল জাতে শিক্ষিকা। ওর ইংরেজিটা শুদ্ধ করে দিতে গেলেন। কথাটা 'ব্রাদার' নয়, 'কাজিন'। কিন্তু ঠিক তখনই তাঁর মনে পড়ে গেল—স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা।

নাঃ! 'কাজিন' নয়, 'ব্রাদার'ই এখানে বিশুদ্ধ শব্দপ্রয়োগ! □

pathagar.net

"ইস্‌মাইলো"? ... ... "ওওওহ্"!

।। এক ।।

নেহাৎ জওয়ান অথবা সাংবাদিক না হলে আপনারা সবাই কাশ্মীরের কারগিল পর্বত-শৃঙ্খলকে দেখেছেন দূরদর্শনের পর্দায় অথবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়—ওই যাকে বলে 'লেখনীচিত্র'। সাদা বাংলায় : 'পেন-পিকচার'। সেদিক থেকে আমি আপনাদের চেয়ে ভাগ্যবান— কারগিলকে দেখেছি স্বচক্ষে;তবে তার তুষারের তিলক ললাটে স্পর্শ করাতে পারিনি। কারণ ওই পর্বত-শৃঙ্খলকে আমি দেখেছি গরুড়াবলোকনে। ঘাড় উঁচু করে নয়, ঘাড় নিচু করে। বিশ্বাস হল না? আচ্ছা, বুঝিয়েই বলি তাহলে :

তারিখটা সঠিক পেশ করতে পারছি একটি বিশেষ কারণে। আমার কাছে একটি ঈয়া কোঁৎকা খাতা আছে নয়শো পাতার। আমি তার নাম রেখেছি : 'স্মরণ'। প্রতি বছর বাৎসরিক-দিনপঞ্জিকাটি পুরানো কাগজ-খরিদ্‌নেবালার দাঁড়িপাল্লায় 'ওজনদাঁড়িত' হবার জন্য সরিয়ে রাখার আগে একত্রিশে ডিসেম্বর ও পয়লা জানুয়ারি একটি বার্ষিক 'সঞ্চয়িতা' রচনা করি। বছর বছর। ডায়েরির উল্লেখযোগ্য তারিখ, ঘটনা, নামধাম ওই 'স্মরণ-খাতায়' টুকে রাখি। তাই আমি নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারি চল্লিশ সালের ঠিক কত তারিখে আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল বের হয়েছিল, কত তারিখে আচার্য সুনীতিকুমার অজন্তার উপর বইটি পড়ে নিজে থেকে আমাকে বাড়িতে ফোন করেন, অথবা কত তারিখে আমি টোকিওর রেঙ্কোজি মন্দিরে নেতাজির 'তথাকথিত' চিতাভস্মের সম্মুখে প্রণাম করেছিলাম। আজ আপনাদের যে তারিখটার কথা বলছি সেটা : 17.10.58।

আমি তখন টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর পিছনে গ্রাহাম্‌স্ ল্যান্ডে একটি দ্বিতল বাড়ির একতলায় ভাড়া থাকি। বাড়ির মালিক বীরেন্দ্রনাথ নাহা থাকতেন সপরিবারে দ্বিতলে। আমার বয়স তখন চৌত্রিশ। সংসারে আছেন গৃহিণী, বড় কন্যা বুলবুল ও পুত্র রানা। বুলবুলের বয়স তখন সাত, রানার চার। সেদিন সন্ধ্যাবেলা দ্বিতল থেকে নেমে এলেন নাহাদা। এমন আবির্ভাব তাঁর মাঝে মধ্যেই ঘটত— আড্ডা দিতে। আমিও কোন কোন দিন যেতাম দ্বিতলে আড্ডা-প্রদান-মানসে। তবে সেদিন নাহাদা এসেই বললেন, নারায়ণবাবু, আজ কিন্তু আড্ডা দিতে আসিনি। এসেছি একটি জরুরী কাজে। বৌমাকে বলুন, চায়ের জল যেন না চাপান।

আমি অন্দরমহলে পা বাড়াবার উপক্রম করতেই ফের বলে ওঠেন, একটু দাঁড়ান, তার আগে বলুন তো—আপনি...মানে ইয়ে তো? ...' গেজেটেড অফিসার' তো?

pathagar.net

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটা শুনে আমি বসে পড়েছি। পথে নয়। নিজেরই বৈঠকখানার চেয়ারে। বলি, কেন বলুন তো?

—শুনুন, বুঝিয়ে বলি :

নাহাবাবু এই পুজোর ছুটিতে সপরিবারে কাশ্মীর যাবেন বলে স্থির করেছেন। নাহাবাবুর কী যেন একটা বড় জাতের বিজনেস ছিল। তারই এক ক্লায়েন্ট একটি যাত্রীদল নিয়ে কাশ্মীর ঘুরিয়ে আনতে যাচ্ছে। খুবই সস্তায়। নাহাবাবু টিকিট কেটেছেন। এখন শুনছেন যে, কাশ্মীর যেতে হলে একটি 'পারমিট' লাগবে। পাসপোর্ট নয়, পারমিট। যদিও কাশ্মীর ভারত ভূখণ্ডে, তবুও সরকারি কানুনে এবম্বিধ ব্যবস্থাপনা। বছর-পাঁচেক আগে একজন ডাকাবুকো বাঙালী ভদ্রলোক বলেছিলেন : কাশ্মীর ভারত-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত! ভারতের অঙ্গ। ভারতের কোন প্রান্তে যেতে হলে ভারতীয়ের আবার অনুমতি লাগবে কেন? ও আইন আমি মানি না। একথা সোচ্চারে ঘোষণা করে তিনি বিনা পারমিটে শ্রীনগরে উপস্থিত হন এবং কাশ্মীরের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লার আদেশে বন্দী হন 11.5.53 তে। তার পর তাঁর আর কোন খবর পাওয়া যায় না। একেবারে তেইশে জুন—তেতাল্লিশ দিন পরে—শেখ আবদুল্লা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন : ক্যা আফসোস্ কী বাত হ্যয়, পূর্বদিন ওই বাঙালী বন্দী হৃদরোগের আক্রমণে প্রাণত্যাগ করেছেন! কী জাতীয় চিকিৎসা হয়েছিল—কোনো চিকিৎসা আদৌ হয়েছিল কিনা, এমন কি সত্যই বাঘের বাচ্চার (তাঁর বাবাকে সবাই 'বাঙলার বাঘ' বলত) মৃত্যুর হেতু হৃদ্‌রোগ কিনা, শেখ আবদুল্লা জানাতে পারেননি। বা চাননি। তাই নাহাবাবু সেই একই জাতির ধাস্টামো করবেন না বলে মনস্থ করেছেন। তিনি পারমিট নিয়েই কাশ্মীর যেতে ইচ্ছুক। তবে দরখাস্তে একজন গেজেটেড অফিসারের স্বাক্ষর প্রয়োজন। এজন্যই নাহাদা আমার বাড়িতে হানা দিয়েছেন।

বিস্তারিত সব শুনে তাঁকে আশ্বস্ত করলাম যে, আমার স্বাক্ষরেই ওঁর কাজ হবে। তবে রাবার-স্ট্যাম্পটা তো বাড়িতে নেই। পরদিন অফিস থেকে ছাপ দিয়ে নিয়ে আসব।

নাহাদার গোছানো-গাছানো বাকি ছিল। তিনি তখনই চলে গেলেন। ভিতরে আসতেই গিন্নি বলেন, আজ নাহাদা যে এসেই চলে গেলেন? ব্যাপার কী? চা-টুকুও খাবার অবসর নেই?

আমি ওঁকে ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বুঝিয়ে বলার পর তিনি এমন একটা দিলতোড় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসলেন যে, আমি নেই!

—হ্যাঁগো, আমরাও ওই নাহাদাদের দলের সঙ্গে যেতে পারি না?

কোনক্রমে সামলে নিয়ে বলি, কাশ্মীর যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? ছুটি পাব কি না স্থির নেই, পুজোর বাজারে টিকিট পাওয়াও তো অসম্ভব। তাছাড়া খরচ কত হবে তার সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে তোমার?

গৃহিণী প্রত্যুত্তর করলেন না। কিন্তু আহারান্তে যখন শয়নের উপক্রম করছি তখন বললেন, শোন, নাহা-বৌদির কাছে খবর নিয়ে এসেছি। টিকিট পাওয়া যাবে। খরচ খুব বেশি নয়। আমরা গেলে ওঁরা খুব খুশি হবেন।

আমি একটা কড়া ধমক দিতে যাব তার আগেই কে যেন ডোর-বেল বাজাল। এত

pathagar.net

রাত্রে আবার কে এল জ্বালাতে? তখনই ভেসে এল সদর দরজার ওপ্রান্ত থেকে নাহাদার কণ্ঠস্বর : সান্যালমশাই! শুয়ে পড়েছেন নাকি? আমি নাহাবাবু। দোর খুলুন। জরুরী কথা আছে।

তাড়াহুড়ো করে আমি গেঞ্জির উপর হাফ শার্টটা চড়িয়ে নিই।

কাহিনী দীর্ঘায়িত করা নিরর্থক। আপনারা ঠিকই আন্দাজ করেছেন। বিশে অক্টোবর নাহাদার দলপতিত্ব মেনে নিয়ে আমরা সপরিবারে শ্রীনগরমুখো যাত্রা করলাম। নাহাদা সস্ত্রীক, সঙ্গে দুই নাবালক পুত্র এবং শ্যালিকা। আম্মো তাই। আমার সঙ্গে তদুপরি আছে আমার এক শ্যালক। সে এখন মস্তবড় সাংবাদিক। তাই শুধু তার নামটাই বদল করে রাখলাম : বিশ্ববন্ধু মৈত্র। তখন তার বয়স—সাত। এখন আটচল্লিশ।

সে বছর বিশে অক্টোবর ছিল মহাষ্টমী। আমাদের ট্রেন বেলা দশটায়। কলকাতার সহস্র মণ্ডপে তখন সন্ধিপুজোর ঢাকের বাদ্যি শুরু হয়েছে। নাহাবাবু আমাদের প্রত্যেকের বার্থ চিহ্নিত করে দিলেন। মেয়েরা স্থান পেল লোয়ার বার্থে। পরদিন সমস্ত দিন চললাম ট্রেনে। সন্ধ্যায় গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল নয়াদিল্লিতে। এখানে আমাদের বিশ্রামের অবকাশ নেই। ট্রেন বদল করে রওনা দিলাম পাঠানকোট। পাঠানকোট এক্সপ্রেসে। বাইশে পৌঁছান গেল পাঠানকোট। অপরাহ্ণে—কলকাতায় যখন সীমন্তিনীর দল সিঁদুর খেলছে—ঢাকিরা বিসর্জনের বাজনা বাজাতে শুরু করেছে— তখন আমরা পাঠানকোট থেকে প্লেনে করে রওনা হলাম শ্রীনগরমুখো। আমাদের প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা সেইরকম।

মনে আছে, এখানে একটু ধমক খেতে হয়েছিল। 'স্মরণ'-এ তা লেখা নেই। মস্তিষ্কের 'স্মরণে' খোদাই করা আছে। গৃহিণী এবং শ্যালিকা যৌথ আক্রমণ করলেন : তুমি আমাদের আগেভাগে জানালে না কেন যে, পাঠানকোট এয়ারপোর্টে আমরা এতটা সময় পাব? আর এখানে এমন সুন্দর টয়লেট আছে? তাহলে আমরা এক-সেট চেঞ্জ নিয়ে আসতাম।

আমি বুঝিয়ে বলতে গেলাম, আমি তা জানব কেমন করে?

কিন্তু তার আগেই, আমার সাত বছরের বড় কন্যা বাবার সপক্ষে সওয়াল করে, বাবা তা কেমন করে জানবে মাসি? বাবা কি এর আগে কখনও কাশ্মীর এসেছে?

বুলবুলের মা ধমকে ওঠে, তুমি চুপ কর। যা বোঝ না, তা নিয়ে তক্কো কর না। আয়নায় গিয়ে নিজের মুখখানা দেখ'গে! দু'দিনের ট্রেন-জার্নিতে তো 'কালিয়া পিরেত' সেজে বসে আছ!

বুলবুল রুমাল দিয়ে জোরে জোরে নিজের মুখটা মুছতে থাকে। পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর প্লেনে সময় লাগে এক ঘণ্টারও কম। সন্ধ্যার আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম শ্রীনগরে। এই আকাশপথের যাত্রাতেই দেখেছিলাম 'কারগিল' পর্বতশৃঙ্খলকে। তখন নামগুলি জানা ছিল না—টাইগার হিল, মাসরোহ, দ্রাস, বাতালিক, কারগিল...তবে অস্তসূর্যউদ্ভাসিত এই তুষারধবল অচিহ্নিত শৃঙ্গগুলিকে দেখেছিলাম দু'চোখ ভরে। প্লেনের জানলা থেকে। আমার ছিল উইন্ডো সিট। রানা আমার কোলে। রানার মা ঠিক আমার পিছনের সিটে। বুলবুল আর তার মাসি ভিতরের দিকের সিটে। আকাশে মেঘ ছিল। তুলো-পেঁজা শরতের 'কিউমিউলাস্' মেঘ। কিন্তু খুব ঘননিবদ্ধ নয়। সেই সাদা মেঘের

pathagar.net

ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল—সারি সারি শঙ্খধবল পর্বতশৃঙ্গ। নাম জানি না কারও—পাইলট হঠাৎ ইন্টারকমে অযাতিত ঘোষণা করলেন : বাঁদিকের জানলা দিয়ে দেখুন, বহু দূরে 'গডউইন অস্টিন'কে দেখা যাচ্ছে। যাকে বলা হয় ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ : K2।

রানা—আমার কোলে বসা বালকপুত্র— জানতে চায়, বাবা! কেতু কী করে ফার্স্ট হল? ফার্স্ট তো এভারেস্ট।

আমি খুশি হই ওর প্রশ্নে। বুঝিয়ে বলি, ঠিক কথা, রানা। ফার্স্ট হচ্ছে এভারেস্ট। কিন্তু সে হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে ফার্স্ট। সে আছে নেপালে। ভারত-ভূখণ্ডে যে ফার্স্ট, সে হচ্ছে 'গডউইন অস্টিন', মানে : কেতু।

—সেটা কোনটা বাবা?

তা আমিও চিনতে পারি না। এখানে বাপ-বেটা সমান পণ্ডিত! আমার বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল কাশীতে মালব্যজির তৈরি করা 'ভারতমাতা-মন্দির'। সেখানে ভূগর্ভস্থ একটি গবাক্ষ থেকে পর্বতশৃঙ্গগুলিকে শনাক্ত করার অতিসুন্দর ব্যবস্থা। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে মালব্যজি যা গড়তে পেরেছিলেন তেমন মন্দির স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ বছরের ভিতর ভারত সরকার কোথাও গড়তে পেরেছেন বলে জানি না।

এমন সময় আমার ক্রোড়স্থিত রানা একটা জটিল প্রশ্ন দাখিল করে : আচ্ছা বাবা! এখন যদি উল্টোদিক থেকে আর একটা প্লেন উড়তে উড়তে এসে আমাদের প্লেনের সঙ্গে নাকানাকি ধাক্কা লাগায়—তাহলে কী হবে?

আমি ওকে বোঝাতে চাইলাম, প্লেন কীভাবে গ্রাউন্ড কন্ট্রোলে ওড়ে। চোখে দেখে নয়, নাক বাঁচিয়ে কানে শুনে। কিন্তু তার আগেই রানার মা পেছন থেকে চাপা ধমক দিয়ে ওঠেন, একটি চড়ে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব। যত সব অলুক্ষুণে কথা!

।। দুই ।।

নাহাদার ব্যবস্থাপনা সুপার-এক্সেলেন্ট। হোটেল-মোটেল নয়। উনি অগ্রিম বুক করে বসে আছেন : 'ডাল-কুইন'। ডাল হ্রদে যত হাউস-বোট আছে, তাদের পর্যটন বিভাগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। থাকার আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা এবং দৈনিক ভাড়ার বিচারে। 'ডাল-কুইন' শুধু 'এ'-ক্যাটাগরির নয়, A1 শ্রেণীভুক্ত। প্রকাণ্ড হাউস-বোট। অতি সুন্দর তার সাজসজ্জা। পাঁচটি ডবল-বেড কামরা। এবারও নাহাদা আমাদের প্রত্যেকের ঘর চিহ্নিত করে দিলেন। রানা-বুলবুলের একটি ডবল-বেড ঘর। নাহাবাবুর দুই পুত্রেরও তাই। দু'জনের দুই শ্যালিকার একটি ডবল বেড। বিশ্ববন্ধু রানার খাটেই গুঁতোগুঁতি করে ঠাঁই করে নিল। বলাবাহুল্য নাহাদা এবং আমার জন্য দুটি ডবল-বেড। ঘরে ঢুকে আমার তো চক্ষুস্থির! কী দারুণ সাজসজ্জা! মনে পড়ে গেল দশ বছর আগেকার সেই সুসজ্জিত ফুলশয্যার স্মৃতি।

রাত্রে ডিনারের আয়োজনও চমৎকার! ভয়ে ভয়ে নাহাদাকে প্রশ্ন করি, এদের চার্জ কী রকম? দৈনিক এক-একজনের ভাগে কত করে পড়বে?

নাহাদা মুরগির ঠ্যাঙ চর্বণ করতে করতে বলেন, সেসব কথা আপাতত ভুলে যান,

pathagar.net

মিস্টার সান্যাল! এনজয় কাশ্মীর থরলি। টাকাটা তো আপনাকে এখনই দিতে হচ্ছে না। আমি জানি কী তাড়াহুড়ার মধ্যে আপনাকে প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। টাকাটা প্রয়োজনে বাড়ি ভাড়া থেকে ধীরে ধীরে অ্যাডজাস্ট করে নেব।

আমার মাথায় ঢুকল না। আমি আবার অঙ্কে কিছুটা কাঁচা। আমি যদি বাড়িওয়ালা হতাম আর উনি ভাড়াটে, তাহলে মাস মাস ভাড়াটা এভাবে অ্যাডজাস্ট করা যেত, কিন্তু...

মাথায় যখন ঢুকল না, তখন পেটে ঢুকুক। আমি আর দু'হাতা বিরিয়ানি পোলাও উঠিয়ে নিলাম প্লেটে।

পরদিন সকালে আমরা সদলবলে গেলাম শঙ্করাচার্য মঠে। ওরা বলে, তৎখ্ সুলেমান। প্রায় হাজার ফুট উঁচু। রানা-বুলবুল, নাহাদার দুই ছেলে, আমরা সবাই হেঁটে উঠলাম। কিন্তু নাহাদা কই? বৌদি বললেন, উনি আসবেন না।

প্রশ্ন করি, পাহাড়ে চড়তে কষ্ট হয়? হার্ট-ট্রাবল?

—সেসব কিছু নয়। উনি রান্না করবেন।

—রান্না করবেন! মানে?

—হ্যাঁ, কলকাতায় তো অফিসের নানান কাজ থাকে। রোববারেও নানান বখেড়া। তাই কোথাও বেড়াতে এলে উনি আশ মিটিয়ে রান্না করেন।

এটা অঙ্ক নয়, তবু এটাও আমার মাথায় ঢুকল না। বৌদি বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলেন। লোকের তো নানান রকম সখ থাকে? স্ট্যাম্প জমানো, পাখি পোষা, বাগান করা—তেমনি নাহাবাবুর নাকি সখ : রান্না করা। রীতিমতো খরচ করে চীনে রান্না, গোয়ানিজ রান্না, পাঞ্জাবি খানা পাকানো শিখেছেন। দুর্দান্ত রান্নার হাত। কিন্তু সেই অধীত বিদ্যার প্রয়োগ করার সুযোগ পান না। বৌদি উপসংহারে বললেন, দেখবেন, শ্রীনগরের কিছুই দেখবেন না উনি, কোথাও যাবেন না। শুধু দু'বেলা নানান পদ রান্না করে যাবেন। আপনাদের রসনা তৃপ্তিতেই ওঁর তৃপ্তি।

বুলবুলের মাসি, লাবণদি বলেন, আপনার খারাপ লাগে না?

—লাগেই তো! কিন্তু কী করব বলুন? লোকে তো মদো-মাতাল স্বামীকেও সহ্য করে? বদমেজাজী, রেসুড়ে, কঞ্জুষ স্বামীকেও বরদাস্ত করে? প্রথম-প্রথম খুব রাগারাগি করতাম। এখন আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি।

মনে মনে ভাবি : ভগবান কত রকমের বিচিত্র চিড়িয়াই না পয়দা করেছেন!

দুপুরে নাহাদা আমাদের খাওয়ালেন মিক্সড-ফ্রায়েড রাইস, চিলি প্রন, মুরগির 'জাকুতি' (xaquitee)। বললেন, এটা হচ্ছে গোয়ানিজ ডিশ। সব শেষে ক্যারামেল পুডিং।

প্রতিটি পদ অতি উৎকৃষ্ট! সত্যিই যত্ন করে রান্না শিখেছেন নাহাদা। বিকালে আমরা গেলাম সেন্ট্রাল-মার্কেটে। দুই শিকারা বোঝাই করে।

বহু পীড়াপীড়ি করেও নাহাদাকে রাজি করাতে পারলাম না। উনি বললেন, আপনারা দেখে আসুন। আমি ও-বেলা একটা মেক্সিকান ডিশ বানাবো। টার্কি'র মাংস। টার্কি খান তো আপনারা?

pathagar.net

আমি বলি, খাইনি কখনও। শুনেছি 'থ্যাঙ্কস্ গিভিং ডে'-তে আমেরিকানরা অতিথিকে টার্কির মাংস খাওয়ায়।

—একজ্যাক্টলি! সেই রেয়ার রেড-ইন্ডিয়ান প্রিপারেশন। যান মশাই, ভাল করে খিদে করে আসুন। দু'চামচ নিয়েই 'আর পারব না' বললে চলবে না কিন্তু। কী জানেন, সান্যালমশাই? কেউ আমার রান্না তৃপ্তি করে খাচ্ছে দেখলে আমি বড় তৃপ্তি পাই।

আমি বলি, আমার আবার ঠিক উল্টো। কেউ আমার তৃপ্তি করে খাওয়া দেখে তৃপ্তি পাচ্ছে জানলে আমিও বড় তৃপ্তি করে খাই।

নাহাদা হা-হা করে হেসে উঠলেন, বললেন, দেন উই আর মেড ফর ইচ-আদার!

সেন্ট্রাল মার্কেটে আমরা দুটি নরম-পশমের কল্কা করা সুন্দর লেডিজ শাল কিনলাম। বেস্ট কোয়ালিটি। একটা রানার মা'র, একটা তার মাসির। দুটো মিলিয়ে দাম পড়ল তিয়াত্তর টাকা। ভাবা যায়? রাত্রে মেক্সিকান টার্কির ঝোল আর ইতালিয়ান 'ট্রোটি' না কী নাম যেন—অনেকটা আমাদের নান রুটির মত— দারুণ জমল ডিনারটা। বারে বারে নাহাদাকে অভিনন্দন জানিয়ে উঠে পড়ি। শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াই একটা সিগারেট ধরিয়ে। ঘরে এসে মনে হল পরিবেশটা বেশ থমথমে! কী হল? শাল দুটি পছন্দ হয়নি? লাবণদিও বসে আছেন আমার ঘরে। বুলবুলও। আমি অ্যাশট্রেটা কাছে টেনে নিয়ে বলি, কী ব্যাপার? কিছু একটা শলাপরামর্শ হচ্ছিল মনে হচ্ছে। গিন্নি জবাব দেন না। লাবণদি আগ বাড়য়ে বলেন, শোন নারায়ণ! তুমি হাউস-বোট বদলাও! এভাবে আমরা সাত দিন এখানে থাকতে পারব না।

আমি তো আকাশ থেকে পড়ি। কাশ্মীর ভূস্বর্গ! 'ডাল-কুইন' তার মধ্যে বৈকুণ্ঠলোক! আর নাহাদা তো রন্ধনে দ্রৌপদী। ভয়ে ভয়ে বলি, অসুবিধাটা কী হচ্ছে?

—এ কী অসৈরণ কথা! আমরা সবাই সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়াব আর ওই ভদ্রলোক বসে বসে রান্না করবেন? এ কী মেনে নেওয়া যায়? আমার তো বাপু গলা দিয়ে কিছু নামতেই চায় না।

কী বিপদ!

আমি বলতে গেলাম, 'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ!' উনি রান্না করতে ভালবাসেন, আর আমরা রান্না করা সুখাদ্য...

বুলবুলের মা এক ধমকে আমাকে থামিয়ে দেয়, থাম তুমি! এ আমরা পারব না, পারব না। সোজা কথা! তুমি অন্য 'হাউস-বোট' দেখ। নিদেন হোটেল, অথবা ধর্মশালা...

অগত্যা মেনে নিতে হল।

নাহাদাকে ব্যাপারটা বোঝানো খুবই শক্ত হল। 'কেন? কেন? কেন? আমি তো বেড়াতে আসিনি, এসেছি রান্না করে আপনাদের খাওয়াব বলে!'

অনেক উল্টোপাল্টা যুক্তি দিয়ে ওঁকে রাজি করালাম। উনি মর্মাহত। তবু আমাদের পৃথগন্ন হতে হল। নতুন হাউস-বোটের সন্ধানে সস্ত্রীক বের হলাম একটা টাঙা নিয়ে। 'ডাল'-লেকে হাউস-বোটের দর বেশি। তাই টাঙাওয়ালার পরামর্শমতো আমরা চলে এলাম ঝিলাম নদী যেখানে ডাল হ্রদে মিশেছে সেই এলাকায়। এখন পূজা মরশুম। সব

pathagar.net

হাউস-বোটেই নোটিস ঝুলছে ইংরেজিতে। সাদা বাঙলায় যা : ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী। কী করব ভাবছি, হঠাৎ একটি দেবদূতের মতো ফুটফুটে ছেলে—রানারই বয়সী—এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে : কিস্‌কো ঢুঁড়তে হেঁ ; সাব?

আমি আমার সীমিত হিন্দিতে বলি, নেহী বেটা, কাউকে খুঁজছি না, আমি একটা খালি হাউস-বোট খুঁজছি। সন্ধান দিতে পার?

—য়ে বাৎ? তো আইয়ে মেরে সাথ! অগর আব্বাজান্‌নে মান্ লিয়া তো আপ্ হমারে হাউস-বোটমে তসরিফ রাখ সকতে হেঁ!

ওর আব্বাজান মহম্মদ আকবর গরম কোটটা গায়ে চাপাতে চাপাতে বার হয়ে এলেন। লম্বা সেলাম দিয়ে বললেন, আইয়ে সাব! পহিলে বোট তো দেখ লিজিয়ে—

ডাল-কুইনের তুলনায় বেশ ছোট। তিনটি বেডরুম। একটি খানা কামরা, একটি ড্রইং রুম। তবে খুবই রুচিসম্মত সাজান। সুন্দর ছিমছাম হাউস-বোটটা। গিন্নিরও পছন্দ হল। নম্বর ঝিলাম : ৬২ ; নাম 'বার্নহিল'। বড় বোটের সঙ্গে দড়ি বাঁধা আরও একটি নৌকা। সেটায় আকবর সপরিবারে বাস করেন। এছাড়া একটা শিকারা। জলপথে ঘোরাঘুরি করার জন্য। ভয়ে ভয়ে জানতে চাই, ভাড়াটা কত?

আকবর প্রতিপ্রশ্ন করেন, আপনারা লোক ক'জন?

জানালাম তা। আকবর বললেন, ভাড়া দৈনিক ছাবিবশ টাকা।

আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, ভাড়া দৈনিক পঞ্চাশের কম হবে। তিন কামরার হাউস-বোট। গিন্নি আমার হাতে চাপ দিলেন। অর্থাৎ এককথায় রাজি হয়ে যাও! আমাকে ইতস্তত করতে দেখে আকবর বললেন, আমি হুজুর দরাদরি করি না। আমার এক দর। আপনি হিসেব জুড়ে নিন, আপনারা বয়স্ক লোক তিনজন, বাবা-বেবিরাও—আল্লাহ্‌তালা ওদের দীর্ঘজীবী করুন—তিনজন।

দু'-চার কথা বলার পর বুঝতে পারি আকবর মিঞা বোর্ডিং-লজিং মিলিয়ে দৈনিক সর্বসমেত ছাব্বিশ টাকা চাইছেন। অর্থাৎ তার ভিতর ধরা আছে, ষাটের কোলে তিনজন ধেড়ে আর তিনজন কুচোকাচার পাঁচবারের অতিথি সেবা : বেড-টি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, বৈকালিক চা-বিস্কুট এবং নৈশাহার। সব মিলিয়ে ওই সওয়া এক কুড়ি প্লাস এক টাকা।

আমি তো এককথায় রাজি। ভূস্বর্গ কাশ্মীরেই ছিলাম। তবু মনে হল : নতুন করে স্বর্গলাভ ঘটল!

।। তিন ।।

কথা ছিল সাতদিন ভূস্বর্গ বাসের পর আমরা নাহাদাদের সঙ্গে একই পথে ফিরব। কিন্তু বার্নহিল হাউস-বোটে আসার পর আমাদের এতই ভাল লেগে গেল যে, স্থির হল সাত নয়, আমরা থাকব দশ দিন। প্লেনের আর রেলের টিকিট ফেরত দিয়ে নতুন টিকিট কাটা হল। তিন দিন বাড়তি স্বর্গবাসের অর্থনৈতিক মূল্যটা মেটাতে স্থির হল, প্লেনের বদলে আমরা ফিরব বাসে; শ্রীনগর থেকে পাঠানকোট।

pathagar.net

প্রতিদিনই শিকারা করে আমরা নানান জায়গায় বেড়িয়ে আসছি। মোঘল গার্ডেনস, শালিমার বাগ, নিশাদ বাগ। চার-চিনার দ্বীপে মধ্যাহ্ন আহার। মজিদ আর ইসমাইল—ওই দুই বাচ্চা ছেলে—বিরাট বিরাট তিনটি টিফিন-ক্যারিয়ারে নিয়ে এসেছে আলুর পরটা, মটর-পনির, গোস্। স্যালাড আর মিঠাই। ওই সঙ্গে এনেছে দুটি ছোট ছোট কাংড়ি, মানে কাঠকয়লার তোলা-উনুন। হাড় কাঁপান শীতে যখন যে খাবার পরিবেশন করছে তা সব সময় হাতে-গরম। সন্ধ্যায় ফেরার পথে রওনা দেবার আগে আবার বৈকালিক চা খাওয়াল, সঙ্গে গরম-গরম পাকৌড়া। অথচ কতই বা বয়স ওদের? বড় ভাই মজিদের বয়স বছর দশেক আর দেবশিশুর মতো সুন্দর ছোট ভাইটি—যে আমাদের প্রথম পাকড়াও করে আব্বাজানের কাছে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সেটা ঠিক বুলবুলের বয়সী : ছয়। মাঝে একদিন লাবণদির কাছে রানা-বুলবুল আর বিশ্ববন্ধুকে রেখে আমরা কর্তা-গিন্নি সকালের বাসে গুলমার্গ দেখতে গেলাম। টাঙ্গামার্গ পর্যন্ত তখন 'বাস' যেত। বাকি পথ ঘোড়ায় চেপে যেতে হল। আমরা দুজনে দুটি ঘোড়া নিলাম। যাতায়াত ঘোড়া-পিছু তের টাকা। গুলমার্গে পৌঁছালাম দ্বিপ্রহরে। প্যাকেট-লাঞ্চ খেয়ে উঠে গেলাম আরও কিছুটা উপরে : খিলান মার্গ! বরফ পড়ে আছে পথের ধারে ধারে। স্নো-বল নিয়ে সবাই ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। এর আগে আমরা বরফে আবৃত পথঘাট দেখিনি।

দু'দিন পরে সদলবলে একদিন পহেলগাঁও আর একদিন সোনমার্গ বেড়াতে যাওয়া হল। বাসে চেপে। সকালে যাওয়া, সন্ধ্যায় ফেরা। মজিদ আর ইসমাইলও গেল আমাদের সঙ্গে। তাদের টিকিট অবশ্য আমাকে কেটে দিতে হত; কিন্তু বিরাট বাক্সে আর টিফিন ক্যারিয়ারে ওরা আমাদের মধ্যাহ্ন আহার বয়ে নিয়ে যেত। নির্জন ফাঁকা জায়গায় সতরঞ্চি বিছিয়ে কাঁচকড়ার প্লেটে গরমাগরম লাঞ্চ সার্ভ করত, কাঁংড়িতে গরম করে নিয়ে। ছুরি-কাঁটা-চামচ তো বটেই, এমনকি 'টুথ-পিকার' অথবা হাত মোছার ন্যাপকিন পর্যন্ত সঙ্গে নিতে ভুল হত না।

মজিদ আর ইসমাইলের সঙ্গে রানা-বুলবুল আর বিশ্ববন্ধুর খুব নিবিড় দোস্তি হয়ে গেল। সেটাই স্বাভাবিক। সাতটা দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পেলাম না। মজিদ আর ইসমাইলের অক্ষর-পরিচয় ছিল না। ওরা দু'ভাই সন্ধ্যার পর ইংরেজি হরফে এক-দুই-তিন আর এ বি সি ডি শিখতে আসত বুলবুল আর বিশ্ববন্ধুর কাছে। হাউস-বোটে কল-বেল আছে; মাঝে মধ্যে বাড়তি দু-তিন পেয়ালা কফি খেতে ইচ্ছে হলে (সেজন্য আকবর মিঞা কোনও বাড়তি চার্জ ধরেনি) কল-বেল বাজানো নিয়ম। কিন্তু সে নিয়ম আমরা মানতে পারতাম না—রানা, বুলবুলের ব্যাঘ্রঝম্পনে। ওরা ভাইবোন হাউস-বোটের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাঁকাড় পাড়ত : 'ইসমাইলো—?'

তৎক্ষণাৎ যেন আকবর মিঞার বোট থেকে প্রতিধ্বনি হত : 'ওওহ্', অর্থাৎ, 'শুনতে পেয়েছি! এখনি আসছি!'

বেশ চলছিল সবকিছু, হঠাৎ ঘনিয়ে এল দুর্যোগ। আমাদের ফেরার ঠিক আগের দিন। সে কী বৃষ্টি আর অকাল-ঝঞ্ঝা! বড় বড় পপলার গাছগুলো পর্যন্ত হেলে পড়তে চাইছে। তিনদিনের মাথায় সাইক্লোনিক আবহাওয়া থামল। মেঘের কোলে নতুন করে রোদ

pathagar.net

হেসে উঠল। কিন্তু সেই সঙ্গে পেলাম চরম দুঃসংবাদ! শ্রীনগর-পাঠানকোট রাস্তায় বিরাট ধ্বস নেমেছে! কবে যে আবার বাস চালু হবে কেউ বলতে পারছে না। নাহাদারা তার আগেই ফিরে গেছেন। চোখে যোজন-বিস্তৃত সরষে ফুলের ক্ষেত!

উপায় নেই! প্লেনেই ফিরতে হবে! টাকার প্রচণ্ড টানাটানি, তার উপর শোনা গেল, প্লেনের টিকিটও পাওয়া যাচ্ছে না। বাসযাত্রীরা যে সবাই প্লেনের শরণাপন্ন হতে চাইছে।

আকবর মিঞাকে ডেকে আমার সমস্যার কথাটা জানালাম। বললাম, আমাকে একটা সস্তা-দামের হাউস-বোটের ইন্তেজাম করে দাও, ভাই। দৈনিক ছাব্বিশ টাকা আমি এখন দিতে পারব না। লোকটা জবাবে যা বলল, তাতে বিস্ময়ে হতবাক হতে হল। ও বললে, সা'ব, আপনারা যতদিন ইচ্ছে থাকুন। স্রিফ রোপিয়াকে বারে মে বে-ফিকর রহিয়ে। আল্লাহ্‌তালা আপনাকে তাঁর খাশ-তালুকে নিয়ে এসেছেন, এসেছেন বিবি-বেবিদের সঙ্গে নিয়ে। পিছটান তো কিছু নেই। আপনি কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমাকে রেজিস্ট্রি ডাকে 'অ্যাকাউন্ট-পেয়ী চেক'-এ আপনার মেহেরবানিটুকু পাঠিয়ে দেবেন।

মেহেরবানিই বটে!

আমি হাসতে হাসতে বলি, ভাই সা'ব, আপনার রেজিস্টার-খাতায় আমি যে নাম-ঠিকানা লিখেছি, তা যদি...

আকবর মিঞা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার দু'হাত চেপে ধরল। বলল, এমন কথা উচ্চারণ করাও গুনাহ্! আমার এটা দু'পুরুষের ব্যবসা। আজ পর্যন্ত না-আমি, না-আমার আববাজান, কখনও ইনসানকে বিশ্বাস করে ঠকিনি। কাকে বিশ্বাস করা যায়, কাকে করা যায় না, তা আমরা মানুষ দেখেই বুঝতে পারি।

এরপর আর কথা চলে না।

আমরা দশদিনের বদলে আঠার দিন ওর হাউস-বোটে ছিলাম। ওর প্রায় হাজার টাকা পাওনা হয়েছিল—হ্যাঁ, আঠার দিনের ঘর ভাড়া ছাড়াও আমরা পাঁচ-সাতটি শাল কিনেছিলাম, কিছু কাঠের কাজ, কিছু কিউরিও। সব কিছুর দাম মিটিয়েছিল আকবর মিঞা। নিঃসঙ্কোচে, নির্দ্বিধায়। পঞ্চাশের দশকে হাজার টাকার মূল্য এখন কত হবে?

শেষদিকে ওর সঙ্গে দোস্তি ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। আমি ওকে বন্ধু হিসাবে 'তুমি' বলেই কথা বলতাম। ও প্রায় আমার সমবয়সী। ও আমাকে 'আপনি' বলে কথা বলত। আমি ভাড়াটে, সে বোটওয়ালা—আমি অধমর্ণ, সে উত্তমর্ণ হওয়া সত্ত্বেও। রোজ সন্ধ্যার পর সে এসে বসত আমার কাছে। সম্রাট আকবরের মতো এই আকবরও ছিল নিরক্ষর। 'আখবর' পড়তে পারত না। শুধু আকাশবাণীর উর্দু সংবাদে দুনিয়াকে চিনে নেবার চেষ্টা করত। একদিন সে বলল, সা'ব, এক বাৎ পুঁছু?

আমি বলি, কহো না ভাই, ক্যা সওয়াল?

ও বলল, আপনার গলায় আমি জনেউ দেখেছি। আপনি তো বরামভণ। কলকাতা ফিরে গেলে আপনাদের মন্দির-পুরোহিত জানতে চাইবে না—আপনি মুসলমানের ছোঁওয়া খাবার বা পানি গ্রহণ করেছেন কিনা?

pathagar.net

আমি ওকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, মুসলমান সমাজে মসজিদের মোল্লা বা ইমামের যতটা প্রভাব, হিন্দুসমাজে পুরোহিতদের তার শত ভাগের এক ভাগও নেই। আমি মুসলমানের রান্না করা ভাত খেয়েছি কিনা কলকাতায় কেউ সে-কথা জানতেও চাইবে না। হিন্দুধর্ম এ বিষয়ে উদার!

আকবর মিঞা ঘন ঘন মাথা নাড়ল। তারপর হঠাৎ যে প্রশ্নটা পেশ করে বসল তার সঙ্গে পূর্ব প্রশ্নটি সম্পূর্ণ সম্পর্ক-বিবর্জিত। ও জানতে চাইল—ওই যে অনেক-অনেক রূপেয়ার নোবেল-প্রাইজ আছে না?—যা বংগাল-মুলুকের রবীন্দরনাথজি একবার পেয়েছিলেন—সে টাকাটা কে দেয়? অংরেজ হকুমৎ? আর কাকে দেওয়া হবে তাই বা স্থির করে কে?

ওর এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে আমি যে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছি তা গোপন রেখে ওর বোধগম্য ভাষায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করি। ঘন ঘন মাথা নেড়ে, দাড়িতে হাত বুলিয়ে সে এবার জানতে চাইল, কিন্তু খুব ভারি মেকদারের কোন অংরেজ অফিসার যদি কোশিস করেন তাহলে কি তিনি কাউকে ওই পুরস্কার পাইয়ে দিতে পারেন?

আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হচ্ছে ক্রমশ। জানতে চাই, খুব ভারি মেকদারের অংরেজ বলতে তুমি কী ধরনের মানুষের কথা বলছ?

—ধরুন, আংরেজি হকুমতের শেষ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন?

আমি বলি, যিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম বড়লাট?

—জী হাঁ! তিনি কি ইচ্ছে করলে কাউকে...

বাধা দিয়ে বলি, তোমার-আমার মতো মানুষকে?

—জী না, কোই পণ্ডিত ইনসান—সোচিয়ে কি পণ্ডিত জবাহরলাল?

আমি এবার বলি, ঠিক কী জানতে চাইছ বলতো আকবর ভাই?

আকবর ঘনিয়ে এসে বলল, কথাটা গোপন। আমাকে অনেকে একথা বলেছে। কিন্তু এটা সত্যি হতে পারে কিনা আমার ধারণা নেই। কোন পড়িলিখি আদমিকে এতদিন জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয়নি। আজ...

আজব একটা প্রশ্ন পেশ করল আকবর মিঞা। ওর দু'-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওকে বলেছে যে, সর্দার প্যাটেল যেভাবে হায়দ্রাবাদের নিজামকে বাহাত্তর ঘণ্টার ভিতর পেড়ে ফেলেছিলেন, রাজাকার বাহিনীর নেতা কাশিম রেজভির হাতে হাতকড়া পড়ালেন, ঠিক সেভাবেই নাকি সর্দারজি কাশ্মীরের মোকাবিলা করতে চাইছিলেন। রাজা হরি সিং ভারতভুক্তি চাইছেন, কাশ্মীরের বারো-চৌদ্দ আনা মানুষ—কী হিন্দু, কী মুসলমানও—তাই চাইছে, সর্দারজি তৈয়ার। সে সময় পাকিস্তান একেবারে অপ্রস্তুত। সাতদিনে গোটা কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানী ফৌজকে হাটিয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু...

মাঝপথেই থেমে যায় আকবর মিঞা।

—কিন্তু কী?

—শেষ মুহূর্তে নাকি পণ্ডিত জবাহরলাল সর্দারজির হাত চেপে ধরেছিলেন!

pathagar.net

—হ্যাঁ, আমি যতটা জানি, ঘটনাটা তাই। এরপরই নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি হয়। আর পণ্ডিতজি হরি সিং-এর ভারতভুক্তির আর্জি নাকচ করে ইউ. এন. ও.-র মাধ্যমে গণভোটের ব্যবস্থাপনায় রাজি হয়ে যান।

—লেকিন ক্যোঁউ?

—তা আমি জানি না, আকবর ভাই। কিন্তু এর সঙ্গে নোবেল পুরস্কারের কী সম্পর্ক?

আকবর আর থাকতে পারল না। বলল, ম্যয়নে সূনা হ্যয় কী...

—কী, কী শুনেছ তুমি?

—লেডি মাউন্টব্যাটেন পণ্ডিতজিকে অনুরোধ করেছিলেন একাজ করতে। তাহলে মাউন্টব্যাটেন-সাহেব নেহরুজিকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়ে দেবেন। ক্যা য়েহ্ সচ্ বাৎ?

আমি বলি, মুঝে না-মালুম আকবর ভাই! লেকিন এক বাৎ বাতাও তো—তুমি বললে, কাশ্মীরের বার-আনা মানুষ চায় যে, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি হোক—

—নেহী সাব! ম্যয়নে বাতায়া থা কি সেই সময় কাশ্মীরের মানুষ তাই চাইছিল, বারা ছোড়িয়ে পন্দর আনা! কিন্তু এখন নয়! আজ ভোট হলে দশ-বার আনা মানুষ পাকিস্তানের দিকে ভোট দেবে!

—কেন? সেদিন কেন অমন অবস্থা ছিল? আর আজই বা কী করে উল্টে গেল?

আকবর তার বুদ্ধি-বিবেচনা মতো বলেছিল—তার কতখানি যুক্তিপূর্ণ তা আমি সে সময় বুঝে উঠতে পারিনি—আজ বুঝি, আকবর যা বলেছে তা নির্ভুল। কাশ্মীরের অর্থনৈতিক বনিয়াদে আছে পর্যটন থেকে উপার্জন। পাকিস্তান থেকে পর্যটক আসে শতকরা পাঁচজন, গাঙ্গেয় ভারত থেকে আসে বাকি পঁচানব্বই। তার ভিতর বাঙালীই আসে আধাআধি। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঊষাযুগে গোটা কাশ্মীর—কী হিন্দু, কী মুসলমান—চাইছিল ভারতভুক্তি। গোটা ভারতের পর্যটকদের আসা বন্ধ হয়ে গেলে চরম সর্বনাশ! কিন্তু আজ (1958) অবস্থাটা বদলে যেতে বসেছে। পাকিস্তানী নেতারা মুসলমান মোল্লা-মৌলভীদের কব্জা করে ফেলেছে। কীভাবে সেটা ঘটল সেটা অনুক্তই থাক। আজ গণভোট হলে নিজ-নিজ গর্দানার জন্য সবাই পাকিস্তানের তরফে ভোট দেবে।—এটাই আকবরের বক্তব্য।

আমার মনে আছে জবাবে আমি বলেছিলাম, কিন্তু পণ্ডিতজি যখন বলেছেন ব্যাপারটা গণভোটে ফয়সালা হওয়া চাই...

আকবর মিঞা আমাকে মাঝপথে থামিয়ে বলেছিল, সা'ব, আপনি তো আলিম ইন্সান্। বহুৎ পড়ালিখা আদমি। আপনি আজ যে-কোন কলেজে গিয়ে ছাত্রদের মধ্যে গণভোট নিন— তোমরা কি পরীক্ষার হলে 'গার্ড' রাখার ব্যবস্থা চাও, না গার্ড না-রাখার? আপনি দেখবেন, শতকরা পঁচানব্বই জন বলবে গার্ড হঠাও! শতকরা পাঁচজন—ওই যারা স্কলারশিপ পায়, ফার্স্ট সেকেন্ড হয়—তারা বলবে, না স্যার, পরীক্ষার হলে গার্ড না থাকলে সর্বনাশ হবে! তা আপনি কি গণভোট মেনে নিয়ে...

কথাটা তার শেষ হয় না। তার আগেই নাচতে নাচতে ইসমাইল আর বুলবুল এসে

pathagar.net

হাজির : খানা তৈয়ার। গরমা-গরম খানা খা লিজিয়ে সা'ব।

আলোচনা অসমাপ্ত রেখে আকবর ফিরে গেল তার বোট-এ।

।। চার ।।

আঠার দিন বার্নহিল হাউস-বোটে কাটিয়ে আমরা ফিরে এলাম কলকাতায়। তখনও 'বাস' চালু হয়নি। আসতে হল প্লেনেই। শ'ছয়েক টাকা আরও ধার দিল আকবর মিঞা। কলকাতায় ফিরে এসে রেজিস্ট্রি-ডাকে ওকে একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠিয়ে ওর ঋণ শোধ করেছিলাম। আকবর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে উর্দুতে একটি পোস্টকার্ডে প্রাপ্তি স্বীকার করেছিল। আল্লাহ্‌তালার কাছে দোয়া মেঙেছিল আমার বালবাচ্চাদের জন্য। আমাদের জন্য।

তারপর আকবর মিঞার কথা ভুলে গেছিলাম। যদিও ওর সেই বিচিত্র প্রশ্নটা মাঝে মাঝে আমাকে হন্ট করত। পণ্ডিত জবাহরলালকে কি লেডি মাউন্টব্যাটেন নোবেল পুরস্কারের কথা বলেছিলেন? শান্তির জন্য? জবাহরলাল সদ্যস্বাধীন ভারতের উন্নতির জন্য যতটা উদ্যোগী ছিলেন, সে আমলে তার চেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন বিশ্বশান্তির ব্যাপারে।

তার আগের ইতিহাসও ভোলার নয়। মহারাজা হরি সিং প্রথমে চেয়েছিলেন কোন পক্ষেই যোগ না দিতে। তাঁর স্বপ্ন ছিল এক আজাদ কাশ্মীর। মাউন্টব্যাটেনের ভারতবর্ষ বিভাগের প্রস্তাব পাওয়ার পর প্রথম কিছুদিন হরি সিং তাই কোনও জবাব দেননি। ওই সুযোগে হাজার পাঁচেক আফ্রিদি উপজাতির জঙ্গীরা পাকিস্তানের অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হয়ে কাশ্মীরে ঢুকে পড়ে। তারা স্থানীয় কাশ্মীরীদের—কী হিন্দু কী মুসলমান—নির্বিচারে হত্যা করে চলে। লুট, গণহত্যা ও নারীহরণ ক্রমশ বাড়তেই থাকে। হরি সিং তখন ভারতভুক্তি মেনে নেন, ভারতের শরণাপন্ন হন। ওদিকে পাকিস্তান কিছু ব্রিটিশ জেনারেলের গোপন সহায়তায় গিল্‌খিট অঞ্চলটা কব্জা করে নেয়। সর্দার প্যাটেলের আদেশে ভারতীয় সৈন্যদল কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানী সেনাদের হটিয়ে দিতে শুরু করে। সাতদিন সময় পেলেই তা সুসম্পন্ন হত। হল না। পণ্ডিতজি থামিয়ে দিলেন ভারতীয় বাহিনীকে। তারপরেও পঞ্চশীল, বান্দুং সম্মেলন, হিন্দি-চিনি ভাই-ভাই অনেক কিছু কীর্তি রেখে গেছেন নেহরুজি, কিন্তু শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারটা আর পেলেন না। পেলেন কিসিংগার—অনেক পরে।

যাক ওসব অবান্তর কথা। আমাদের এ-কাহিনীর দ্বিতীয় অঙ্কটা হচ্ছে পনেরো বছর পরে—1973-এর প্রাক্‌পুজো লগ্নে। ইতিমধ্যে নেহরু প্রয়াত। লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছেষট্টি সালে পাক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছেন এবং পাক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বস্তুত পরাজয় মেনে নিয়ে তাসখন্দ সন্ধিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন। ইন্দিরাজি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন এই অজুহাতে পাকিস্তান আবার ভারত আক্রমণ করে। আমেরিকার হুমকি সত্ত্বেও ইন্দিরাজি তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল থাকেন। পাকিস্তান বাধ্য হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নেয়। কিন্তু কাশ্মীরের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন-দিন অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে

pathagar.net

পড়ে পর্যটকদের কাশ্মীর যাওয়া বন্ধ হওয়ায়। তিয়াত্তর সালের আগস্ট মাস। বাইরের ঘরে বসে পুজো সংখ্যার জন্য কী একটা লেখা লিখছি। হঠাৎ কল-বেল বাজল। দরজা খুলে দেখি একটি অতি সুদর্শন কাশ্মীরী যুবক। তার পরনে চুস্ত-মেরজাই, মাথায় কাজ-করা কাশ্মীরী টুপি, পিঠে ঈ-য়া বড় এক বোঁচকা। মস্ত সেলাম করে বললে, কাশ্মীরী শাল লায়া হ্যয়, জনাব। বহুৎ উমদা চীজ, ঔর বহুৎ সস্তা ভি হ্যয়। দেখাই?

আমি তাকে জানালাম, আমার শালের প্রয়োজন নেই। আমি ব্যস্ত আছি।

লোকটা নাছোড়বান্দা। হিন্দিতে বললে, নিতেই যে হবে এমন কোনও কথা নেই। দেখুন জিনিসগুলো—অত দূর থেকে নিয়ে এসেছি..

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, কেন অহেতুক বিরক্ত করছ আমাকে?

লোকটা এবার যে প্রশ্নটা করল তাতে আঁৎকে উঠি : বুলবুল দিদি ঘরমে হ্যঁয় ক্যা?

—বুলবুল! তুমি তাকে কী করে চিনলে?

—ম্যয় নাজির আহ্‌মেদ হুঁ, স্যার! জনাবকো য়্যাদ নেই? মেরা নাম থা ইস্‌মাইল! বার্নহিল হাউস-বোট মে—

আমি চমকে উঠি— তুমি সেই ইস্‌মাইলো?

—জী হাঁ! —আবার সে লম্বা সেলাম করল।

ডেকে আনলাম বুলবুল-রানাদের। বুলবুল বোধহয় তখন যাদবপুরে এম. এ. পড়ে। রানা সবে কলেজে ঢুকেছে। ওরা ইস্‌মাইলকে নিয়ে এসে ড্রইংরুমে বসাল।

বুলবুল বলে, তুমি এতবড় হয়ে গেছ! শোন ইস্‌মাইল! আজ তুমি দুপুরে আমাদের বাড়িতে খানা খাবে—'না' বললে শুনব না—

ইস্‌মাইল নত নেত্রে সখেদে জানাল, সেটা সম্ভবপর নয়। খানা দূর অস্তু, এক পেয়ালা চায়ে ভি ম্যয় পী নেহি সক্‌তা দিদি!

—লেকিন কিঁউ?

বুঝিয়ে বলে, এটা ওদের রমজানের মাস। সমস্ত দিন নির্জলা উপবাস করে—এমনকি মুখে জল এলে তা থুতু করে ফেলে দিয়ে—ওকে এই কলকাতা শহরের পথে পথে ভাদুরে পচা গরমের মধ্যে শাল ফিরি করতে হবে। ক্যা কিয়া যায়? বদ্‌নসীব!

বুলবুল অভিমান করে বলে, পনেরো বছর পর তুমি এলে, আর বেছে বেছে রোজার মাসে?

শুনলাম সব কথা। পরপর তিনটি বছর ওদের সেই বার্নহিল হাউস-বোটে কোনও ট্যুরিস্টের শুভাগমন হয়নি। ওদের উপার্জনের তো ওই একটাই রাজপথ। মজিদ বিয়ে করে বোম্বাই চলে গেছে। কী একটা চাকরি করছে। বোম্বাইয়ের খরচ মিটিয়ে সংসারকে সাহায্য করতে পারে না। আকবর মিঞা রীতিমতো বুড়ো হয়ে গেছে। দিন-রাত খক্‌-খক্‌ করে কাশে! 'ক্রনিক কাফ্‌'। আসলে রোগটা : দারিদ্র্য। শুধু ওদের সংসারে নয়—ঝিলাম নদীর ধারে যতগুলি হাউস-বোট মালিকের সংসার ছিল সবারই এক হালৎ। তাই বা কেন? গোটা কাশ্মীর উপত্যকা ভুগছে ওই একই রোগে—পর্যটকদের অভাব, অনাহার, দারিদ্র্য! ওরা পশমের শালে অপূর্ব নকশা আজও তোলে, 'রোজ উড' কাঠের জাফরি

pathagar.net

কাটা আসবাব আজও বানায়, পিতলের ফুলদানিতে রামধনুরঙ তসবির-আঁকে। লেকিন বিলকুল বেফজুল! খরিদনেবালা কাঁহা? যারা আসে তারা পাকিস্তানের জঙ্গী সৈন্য। লুটতরাজ করতে। খাস শ্রীনগরে না হলেও লীডার উপত্যকার ধারে ধারে অসংখ্য গ্রামে তারা একটার পর একটা বাড়িতে ঢুকে গোলি চালায়। বুড়ো-বাচ্চাদের রক্তে ভেসে যায় অন্নহীন সংসারের উঠোন। আর যৌবনবতীদের জোর করে ধরে নিয়ে যায়। শুধু কাফের নয়, সাচ্চা মুসলমানদেরও!

প্রয়োজন ছিল না, তবু বুলবুলের মা খান পাঁচ-সাত লেডিজ শাল কিনলেন। আমাকে জনান্তিকে বললেন, আত্মীয়-স্বজনের বিয়েতে শাড়ী তো উপহার দিতেই হয়, না-হয় লেডিজ শালই দেব।

আমি জানতে চাই, তোমার নাম তো ইসমাইল? তাহলে প্রথমে কেন বললে যে, নাজির আহ্‌মেদ?

ইস্‌মাইল হাসল। যথারীতি গালে টোল পড়ল তার—যেমন পড়ত তার ছেলেবেলায়। লাজুক-লাজুক মুখে ব্যাখ্যা দিল সমস্যাটার—আহ্‌মেদই ওর নাম। কিন্তু আমরা যেবার কাশ্মীর যাই, তার আগে এক সাহেব-মেম দম্পতি ওদের 'বার্নহিল'-এ উঠেছিলেন। তা সেই মেম-সাহেবই নাকি ওকে এই নামে ডাকতে শুরু করেন। সেটাই পরে ওর ডাকনাম হয়ে যায়। আংরেজিতে 'ইস্‌মাইল' মানে নাকি 'হাসি'।

আমরা সবাই হেসে উঠি। রানা ওকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে—কথাটা 'ইস্‌মাইল' নয়, 'স্মাইল'।

—ওহি তো ম্যয় ভি বোলতা হুঁ : 'ইস্‌মাইল'!

বুলবুল বলে, ঠিক বাতায়া! ইস্‌মাইলো—

নাজির আহ্‌মেদ তার আইডেন্টিটি প্রমাণ করে প্রত্যুত্তরে : ওওওহ্।

আবার সমস্বরে হেসে উঠি আমরা।

এরপর আমি উঠে গেলাম আমার পূজা সংখ্যার কাহিনীটা শেষ করতে। কিন্তু কানটা পড়ে রইল ড্রইংরুমের এ-প্রান্তে।

বুলবুল ওর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়. এরপর যখন কলকাতায় আসবে তখন রোজার মাসে এস না, আর আমাদের বাড়িতে খানা খাবে। তোমার আম্মাজানের পাকানো রান্না আমরা অনেক খেয়েছি, এবার তুমি একদিন খাবে আমার আম্মাজানের রোসুই করা খাবার। আমি নিজেও দু-এক পদ বানাব। লেকিন বাঙ্গালী-খানা।

ও সংক্ষেপে বললে : বহুৎ খুব।

—আর একটা কথা! মজিদ ভাই-এর মতো তুমিও যেন আমাদের ফাঁকি দিও না। সাদি স্থির হলে পুর্জা পাঠিও—নেওতা—আমরা সবাই কাশ্মীর যাব আবার। বার্নহিলে উঠব।

ইস্‌মাইল আবার লাজুক-লাজুক মুখে বললে, বহ্‌ভি নেহী হোগা, বুলবুল দিদি! ক্যোঁউকি, ম্যয়নে ভি...

pathagar.net

—কী? সাদি করে ফেলেছ? এর মধ্যেই? এতটুকু বয়সে?

যে ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা' আংরাখার ভেতর থেকে তার ছোট্ট মেয়ের পাঞ্জা ছাপ বার করে দেখিয়েছিল, তেমনিভাবে ইসমাইলও একটি প্লাস্টিকের প্যাকেট থেকে সযত্ন-সঞ্চিত একটা ফটোগ্রাফ বার করে বুলবুলের হাতে দিল। কাশ্মীরের কোন স্টুডিওতে তোলা ওদের যুগলচিত্র। সাদা কালো নয়, কালার্ড প্রিন্ট! বুলবুল ছবিটা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, উরিব্বাস! তুমি তো মিস্ কাশ্মীরকে সাদি করে বসে আছ ইস্‌মাইলো! মা শিগ্গির এস! দেখ' ইস্‌মাইলোর বউ কী দুর্দান্ত সুন্দরী।

বুলবুলের মা-ও বলল, সত্যি ভা-রি সুন্দর দেখতে। অনেকটা নার্গিসের মতো মুখের আদলটা। তাই না রে?

বুলবুল বলে, নার্গিস? আমার তো মনে হচ্ছে, মধুবালা।

ইস্‌মাইলের দিকে ফিরে বুলবুল জানতে চায়, স্বয়ং দুলহা কী বলে? কার মতো দেখতে? নার্গিস না মধুবালা?

বাংলা প্রশ্নের ধরতাইটা ধরতে পারে না ইসমাইল। বলে, জী নেহী! নূরজাহাঁ!

বুলবুল বলে, উরী ব্বাস! নার্গিস-মধুবালায় তোমার মন উঠল না? এক্কেবারে নূরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌কী বড়ি বেগম—নূরজা—হাঁ!

ইসমাইল ঘাবড়ে যায়। বলে, নেহী বুলবুল দিদি! বাদশাহ্ জহাঙ্গীরকী বড়ি বেগম নহী। য়্যে তো ইস্‌মাইলোকী ছোটিসি বিবি : নূরজাহাঁ।

নিরক্ষর সরল মানুষ। বেচারি এত ঘোর প্যাঁচ বোঝে না। ভেবেছে ওর সদ্যোবিবাহিতা বধূর নামটা জানতে চাওয়া হয়েছে।

।। পাঁচ ।।

এটাকে যদি তিন অঙ্কের নাটক বলে ধরে নেন, তাহলে তৃতীয় অঙ্কের পটোত্তলন হচ্ছে আবার দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর পরে—শতাব্দির এই শেষ বছরে। শতাব্দি কেন, সহস্রাব্দির! বিশ্ববন্ধু গেল কারগিল রণাঙ্গনকে 'কাভার' করতে। ওর সঙ্গে আরও একজন অবাঙালী সাংবাদিক আর আলোকচিত্রশিল্পী। যাবার আগে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেল। সেটা বোধকরি জুন মাসের শেষাশেষি অথবা জুলাই-এর প্রথম। তখনও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করতে ভিক্ষাপাত্র হাতে ওয়াশিংটনে হানা দেননি। হানাদারেরা দখল করে বসে আছে বর্ডার লাইনের গুরুত্বপূর্ণ পর্বতচূড়ার ঘাঁটিগুলি। কিন্তু একে একে তা ভারতীয় জওয়ানদের অসীম বীরত্বে ও আত্মদানে আবার ভারতের দখলে ফিরে আসছে। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সোজা জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্বীকৃত সীমান্তরেখার এপার থেকে শেষ হানাদারটিকে ফিরিয়ে নেওয়ার আগে তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও আলোচনায় বসতে নারাজ।

বিশ্ববন্ধুরা গেছে সেই রণাঙ্গনের খাশ-তালুকে—যতদূর সেনাবিভাগ ওদের যেতে দেয় : দ্রাস, বাতালিক, কারগিল, টাইগার হিল। বিশ্ববন্ধুর মাউন্টেনিয়ারিঙের ট্রেনিং আছে।

pathagar.net

এর আগেও চীন-ভারত যুদ্ধের সময় পনের-ষোল হাজার ফুট উচ্চতায় গিয়ে রিপোর্ট সংগ্রহ করে এসেছে। যাবার আগে যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল তখন বললাম, শ্রীনগর হয়েই তো যাবি। একবার 'বার্নহিল' হাউস-বোটে আকবর মিঞা বা ইস্‌মাইলোদের খোঁজ করিস তো। ইস্‌মাইল তার পরের বছর এল না কেন?

ও হেসে বলল, তাই তো নাম-ঠিকানাগুলো ঝালাই করে নিতে এলাম। ইস্‌মাইলো নাকি একবার কলকাতায় এসেছিল। আপনাদের সঙ্গে দেখাও করেছিল। আমি তখন নেপালে। দেখা হয়নি।

'স্মরণ' দেখে দেখে নামগুলো লিখে দিলাম। ঠিকানাটাও। টুকতে টুকতে বিশ্ববন্ধু বললে, আপনারা নূরজাহাঁর তসবির অন্তত দেখেছেন। আমার তো সে-সৌভাগ্যও হয়নি। দেখি যদি বন্ধু-পত্নীর সাক্ষাৎ পাই।

আমি হাসতে হাসতে বলি, তুমি দুটো কথা ভুলে যাচ্ছ শালাবাবু! এক নম্বর : নূরজাহাঁকে দেখবে আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা। দু'নম্বর : ছাব্বিশ বছর আগে নূরজাহাঁ ছিল সপ্তদশী। আজ তার চোখে নির্ঘাৎ চালশে ধরেছে।

বিশ্ববন্ধু বললে, জাহাঙ্গীর-পত্নী নূরজাহাঁ কিন্তু পঞ্চাশ বছর বয়সেও অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন—লিখে গেছেন তাঁরই কন্যা, লাডলি বেগম।

—তাই নাকি! কী করে জানলে? ফার্সি পড়তে পার?

—ফার্সি কেন? জেনেছি আপনারই 'লাডলি বেগম' পড়ে। নিজের লেখা বইগুলো অন্তত মাঝে মাঝে উল্টেপাল্টে দেখবেন, জামাইবাবু!

বিশ্ববন্ধু কারগিল রণাঙ্গন 'কাভার' করে ফিরে এল জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে। তার সচিত্র প্রবন্ধ যথারীতি মুদ্রিত হয়েছিল তাদের কাগজে। সেসব আপনারা হয়তো পড়েছেন, হয়তো পড়েননি। আমাকে ফিরে এসে সে যে ব্যক্তিগত জবানবন্দি দিয়েছিল সেটাই এই তৃতীয় অঙ্কের উপাদান।

শ্রীনগরে পৌঁছে বিশ্ববন্ধু মর্মাহত হয়েছিল। শ্রীনগরের 'নগর' পরিচয় যদিবা কিছুটা আছে—'শ্রী'টুকু সম্পূর্ণ উবে গেছে। সম্ভবত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আদায়পত্র নেই—তাই শ্রীহীন নগরে নোংরা জমে আছে এখান-ওখানে। টাঙার সংখ্যা কমেছে। বেড়েছে মোটরগাড়ি—টাটা-সুমো, ফিয়াট, জিপসি। সেন্ট্রাল মার্কেটে গিয়ে দেখে অনেক দোকান উঠে গেছে। অধিকাংশই তালা বন্ধ। সন্ধান নিয়ে জেনেছে, খরিদ্দারের অভাবেই দোকানগুলি খোলা হয় না। ডাহ্‌ল লেকে সেই পুষ্পভারনম্র শিকারাগুলি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে ও চলে এসেছিল ঝিলাম-নদীর হাউস-বোট পাড়ায়। হাউস-বোটগুলি আছে। অধিকাংশের দশ বছর রঙ ফেরানো হয়নি। প্রায় সবগুলিই ভগ্নদশায়। কোনটিতে ট্যুরিস্ট আছে বলে মনে হচ্ছে না। বস্তুত সমস্ত এলাকাটাই জনমানবশূন্য। কিছু অভুক্ত কুকুর ওকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। বিশ্ববন্ধুর নজর হল একজন মাঝবয়সী দরিদ্রশ্রেণীর লোক একটা হাউস-বোটের ছাদে বসে একটা কুর্তা সেলাই করছে। লোকটা

pathagar.net

ওকে লক্ষ্য করেছে অনেকক্ষণ, কথা বলছে না।

বিশ্ববন্ধু জানতে চাইল 'বার্নহিল' হাউস-বোট কোনটা? বাযট্টি নম্বর?

লোকটা বললে, নম্বর-বোর্ডটা ভেঙে গেছে, এর পাশেরটাই। লেকিন কিস্‌কো ঢুঁড়তে হেঁ সা'ব?

বিশ্ববন্ধু বলে, ওই হাউস-বোটের মালিককে—

—মালিক? বহ্ তো গান্ধীনগরমে রহ্‌তে। রামদাস প্যাটেলজি।

বিশ্ববন্ধু বুঝতে পারে দারিদ্র্যের তাড়নায় আকবর মিঞা হাউস-বোটটা বেচে দিয়েছে। নিশ্চিন্ত হতে সেই প্রশ্নটাই দাখিল করে। লোকটা বলে, সো হি বোলেন, আকবর মিঞাকো ঢুঁড়তে হেঁ আপ। বহ্ তো অপনা হৌসবোটমেই হ্যাঁয়। যাইয়ে না— লোকটা বুঝিয়ে বলল, প্যাটেলজি হাউস-বোটটা কিনে নিয়েছেন বটে, কিন্তু আকবরকে উচ্ছেদ করেননি। তাকেই ম্যানেজার হিসেবে রেখেছেন। মাস-মাহিনায় নয়, কমিশন-বেসিসে। যেহেতু 'মোটে মা রাঁধে না, তাই তপ্ত না পান্তা' এ-প্রশ্ন ওঠেনি। অর্থাৎ গত কয়েক বছর ট্যুরিস্ট আদৌ আসেনি। তাই কমিশন দেবার বখেড়া পোহাতে হয়নি প্যাটেলজিকে। তবে হ্যাঁ, বিনা ভাড়ায় আকবর মিঞা মাথার উপর ছাদটা তো পেয়েছে!

বিশ্ববন্ধু সহজেই বুঝল। সে পশ্চিমবঙ্গের ছেলে। জানে, কীভাবে মালিক চাষী ক্রমে ভাগচাষী হয়ে যায়, পরিণামে নিজের জমিতেই সে হয়ে যায় মজুর চাষী।

ডাকাডাকিতে ভিতর থেকে এক বৃদ্ধা প্রশ্ন করেন, কৌন?

—আকবর মিঞাজান হ্যাঁয় ক্যা?

—জী নেহী। কামপ্যে গয়ে হ্যাঁয়। করিব ঘণ্টাভর পিছে লৌটেঙ্গে।

বিশ্ববন্ধু জানতে চায়, মজিদ ভাই হ্যয়? ইস্‌মাইলো?

ভিতরে কিছু শলাপরামর্শ হয়। তারপর সর্বাঙ্গ বোরখায় ঢেকে একটি মহিলা—আকবর মিঞার বিবি কি পুত্রবধু বোঝা শক্ত—দরজার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি বসুন। আব্বাজান এখনি এসে যাবেন। কোথা থেকে আসছেন আপনি?

—কলকাত্তাসে। ম্যয় হুঁ ইস্‌মাইলোকো এক দোস্ত্। কলকাত্তামে রহ্‌তা হুঁ।

মহিলাটি নিজের মনেই একটা স্বগতোক্তি করেন, হায় আল্লাহ্!

তারপর সামলে নিয়ে বলেন, আপ বৈঠিয়ে না জি! কুর্সি পর।

বিশ্ববন্ধু আসন গ্রহণ করার পর তার মনে হল পিছন থেকে বৃদ্ধা বধূমাতাকে কিছু নির্দেশ দিলেন। হয়তো সেই নির্দেশানুসারেই মহিলাটি প্রশ্ন করে, আপ্‌কো শুভনাম?

বিশ্ববন্ধু হিন্দিতে বললে, আমার শুভনাম বললে আপনি তো চিনবেন না ;কিন্তু আপনার শুভনামটা আমার জানা আছে : নূরজাহাঁ-বেগমজি!

অস্ফুট প্রতিধ্বনি শোনা গেল, ইয়ে আল্লাহ্!

লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে বাইরে বার হয়ে এলেন বৃদ্ধা। জানতে চাইলেন, তাঁর বধূমাতার নাম বিশ্ববন্ধু কেমন করে জানল। বিশ্ববন্ধু বলল, ম্যয়নে তো পহ্‌লেই বোলা, মাতাজি, ইসমাইলো আমার দোস্ত্। তবে হ্যাঁ, অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় না।

pathagar.net

—কেৎনা রোজ?

—রোজ নয়, তা ধরুন, চল্লিশ বছর!

—পাশের ঘর থেকে আবার ভেসে এল একটা বিস্ময়সূচক ইন্টারজেকশন।

বিশ্ববন্ধু জানতে চাইল, ইস্‌মাইলো ইদানীং আর কলকাতায় যায়নি শাল বিক্রি করতে?

বৃদ্ধা বলল, নেহী বেটা! ও ব্যবসায় পড়তা পোষাতো না।

নেপথ্যচারিণী প্রশ্ন করে, আপনার জন্য কি চা আনব? না 'কফি'?

বিশ্ববন্ধু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, ইস্‌মাইলো তাহলে এখন কী করে?

—তু বাতারে বেটি। ম্যয় ঠিক ঠিকসে নেহী জানতি।

নেপথ্য থেকে প্রশ্নের জবাব এল, আপনার বন্ধু এখন বি. এস. এফ.-এ জওয়ানের কাজ করে। এখন সে লান্সনায়েক। ও আছে যে ক্যাম্পে সেটা এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল। আপনি কতদিন এখানে থাকবেন?

—কেন বলুন তো?

—আপনার দোস্ত ষোল তারিখ সাত দিনের ছুটিতে আসবে। আজ তো সাত তারিখ, তাই জানতে চাইছি।

—আমার সতের তারিখ সন্ধ্যার ফ্লাইটে টিকিট কাটা আছে। যদি সময় করতে পারি তাহলে ওই ষোল তারিখ সন্ধ্যার সময় আসব। ইস্‌মাইলোকে বলে রাখবেন। আমার নাম বিশ্ববন্ধু মৈত্র। আমার নামটা তার মনে নাও পড়তে পারে, বলবেন, বুলবুল দিদির বিশু মামা! আর সেদিন সন্ধ্যায় আপনার ওই প্রশ্নটার জবাব দেব : 'চা না কফি'। তবে একটা শর্ত আছে। সেদিন সন্ধ্যায় ইস্‌মাইলো যদি তার বেগমকে ওই বোরখার খোলস থেকে বার করে আনতে পারে, তবেই।

বিশ্ববন্ধু উঠে দাঁড়ায়। বলে, চলি।

দ্বারের ওপাশ থেকে বোরখাধারিণী, যাকে আবছা দেখা যাচ্ছিল, এবার বলে ওঠে, জারাসে ঠাহ্‌র যাইয়ে! মেহেরবানিসে!

বিশ্ববন্ধুআবার বসে পড়ে। একটা সিগারেট ধরায়।

পাঁচ মিনিটের ভেতরেই এঘরে চলে আসে নূরজাহাঁ। বোরখাটা সে খুলে এসেছে। চুস্ত্ আর কুর্তা। তার উপর আঁটো আঙরাখা জাতীয় ভেলভেটের ভেস্ট। যদিও তা জীর্ণ তবু সোনালী কাজ করা। মাথায় মুঘল-বেগম নূরজাহাঁর মুকুটটা নেই, তার বদলে ইস্‌মাইলোর বেগম নূরজাহাঁর মাথায় আস্বচ্ছ চীনাংশুকের ওড়না। তার হাতে গুটি তিন-চার লেডিজ শাল। নূরজাহাঁ অসঙ্কোচে বললে, ভাইসাব! ওয়াক্ত না মিল্‌লে আপনি আসতে পারবেন না বললেন। তাই আমার কাছে যে-কয়টি লেডিজ-শাল ছিল নিয়ে এসেছি। আপনি তো আমাদের সব কথাই জানেন, দেখছি। ভাবিজির জন্য অন্তত একটা শাল নিয়ে যান।

লাডলি-বেগম বলেছিলেন, তাঁর মা পঞ্চাশ বছর বয়সেও ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। সেটা বোধহয় ওই নামের গুণে : নূরজাহাঁ—জগতের আলো! বিশ্ববন্ধু বিয়ে করেনি।

pathagar.net

কনফার্মড ব্যাচিলার। কিন্তু সেকথা সে বলল না। দুটি শাল খরিদ করল নগদ টাকায়। আকবর মিঞা তখনও ফিরে আসেনি। বিশ্ববন্ধুর দুরন্ত কৌতূহল হল জানতে—ইস্‌মাইলোর কি সন্তানাদি হয়নি? হলে, সেই বাবা-বেবিদের মা এই চল্লিশ বছর বয়সেও এমন 'মধ্যক্ষামা' থেকে গেল কী করে?

নূরজাহাঁ আবদেরে গলায় বলে, ঔর এক বাত, ভাইসাব! বলুঁ?

—কহিয়ে, বহিনজি!

—চায়ে য়্যে কফি নহী, ষোলা তারিখ রাত মে আপ্ ইহা খানা খাকে যাইয়ে গা।

বিশ্ববন্ধু উঠে দাঁড়ায়। মোঘলাই কায়দায় একটা কুর্নিশ করে বললে, যো হুকুম নূরজাহাঁ, বেগম-সাহেবা!

ভুট্টার দানার মতো ঝকঝকে একসার দাঁত বার করে নূরজাহাঁ হাসল। বিশ্ববন্ধুর ছদ্ম কুর্নিশের প্রতিদান দিতে সেও নিচু হয়ে আদাব জানাল।

এরপর বিশ্ববন্ধুরা চলে যায় কারগিল রণাঙ্গনের খাস তালুকে। এতদিনে প্রায় প্রতিটি পর্বতচূড়া শত্রু-সৈন্যদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে ভারতীয় জওয়ানেরা। অপরিসীম বীরত্বে এবং জানের পরোয়া না করে। অনেকে শহিদ হয়েছে। ও পক্ষেও এই পররাজ্য দখলের খোয়াব দেখার শাস্তি পেতে হয়েছে অনেক জঙ্গীকে। ভাড়াটে আফগান, ইরানী সৈন্য এবং পাকিস্তান রেগুলার আর্মির জওয়ানেরাও সম্মুখ যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাভূত হয়েছে। পাকিস্তান বাহিনী ক্রমে চলে যেতে বাধ্য হল স্বীকৃত সীমান্তের ওপারে। তারপর শুরু হল নানা ধরনের চোরা-গোপ্তা ছায়া-যুদ্ধ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীকে পাত্তা দেননি। ব্রিটিশ এবং চীন সরকারও পাকিস্তানকে বলেছে ভারত সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে। ঘরে-বাইরে চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে নওয়াজ শরিফ দূরদর্শনে ঘোষণা করেছেন, পাকিস্তান বাহিনী ক্রমশ সীমান্তের ওপারে চলে যাবে। সে ঘোষণার আগেই পনেরো-আনা জঙ্গীকে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' করা হয়েছে।

তারপর শুরু হল : ছায়াযুদ্ধ। চোরাগোপ্তা হানা।

কারগিল রণাঙ্গন পরিক্রমা সেরে ওরা শ্রীনগরে ফিরে এল ষোল তারিখ সকালে। সেখানে এসেই খবর পেল শ্রীনগর থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে বন্দিপুর বি. এস. এফ. ক্যাম্পে গত দু'দিন ধরে হয়ে গেছে এক মৃত্যুমুখর নাটক। তের তারিখ রাত দুটোর সময় জনাসাতেক পাকিস্তানি ভাড়াটে জঙ্গীর একটা দল কী করে যেন ঢুকে পড়েছিল বন্দিপুর ক্যাম্পে। যথেচ্ছ গুলি চালিয়ে তারা অনেককে হতাহত করে। মারা যান এক বাঙালী ডি. আই. জি. শিশির কুমার চক্রবর্তী, তাঁর দেহরক্ষী ভাস্করণ এবং ক্যাম্পের ডেপুটি কমান্ডান্ট মহিন্দর রাজ। এছাড়াও কনস্টেবল মুনিয়ারাজান্না সস্ত্রীক নিহত। তার উপর প্রবেশ গেটে যে-দুজন পাহারায় ছিল—কনস্টেবল হরগোবিন্দ এবং ল্যান্সনায়েক নাজির আহ্‌মেদ। তারাও মারা গেছে। জঙ্গী দুশমনেরা বার-তেরজন নিরীহ আবাসিককে পণবন্দি করেছিল। তার মধ্যে কেউ কেউ আহত হলেও সকলে জীবিত অবস্থায় মুক্ত হয়েছেন। দিল্লি থেকে কমান্ডো আর শার্প শ্যুটারদের উড়িয়ে আনা হয়েছিল। তাদের হাতেই অধিকাংশ জঙ্গী প্রাণ হারিয়েছে।

pathagar.net

বিশ্ববন্ধুর সহকর্মী বললে, যাবে নাকি বন্দিপুর? মাত্র পঞ্চাশ মাইল তো দূরত্ব!

ওই 'পঞ্চাশ মাইল' শব্দটা বিশ্ববন্ধুর কানে বাজল। সেদিন নূরজাহাঁ না বলেছিল ইস্‌মাইল যে বি. এস. এফ. ক্যাম্পে পোস্টেড সেটা শ্রীনগর থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে! না—বন্দিপুর নামটা সে বলেনি। বিশ্ববন্ধু রিপোর্টটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল—নিহত সাতজনের মধ্যে 'ইস্‌মাইল' নামে কেউ নেই। কিন্তু আহতদের মধ্যে সবার নাম রিপোর্টে নেই।

ওর সহকর্মী শর্মা বলে, কী হল। জবাব দিলে না যে!

বিশ্ববন্ধু বলে, এখন গিয়ে কী দেখবে? জঙ্গীদের লাশ তো সব পাচার। শহিদদের মরদেহ তাদের নিজ নিজ গ্রামে বা শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ডি. আই. জি. চক্রবর্তী সাহেবের মরদেহও ইতিমধ্যেই পালাম বিমানঘাঁটিতে পাঠানো হয়েছে।

আলোকশিল্পী মকবুল বলে, লোকাল-পেপারে একটা বাড়তি খবর আছে। গেটম্যান যে দুজন মারা গেছে তাদের মধ্যে একজন—আহ্‌মেদ—শ্রীনগরের জওয়ান। ওর মরদেহ আজ সন্ধ্যায় বাই রোড শ্রীনগরে আনা হচ্ছে। এটা আমরা কভার করতে পারি।

বিশ্ববন্ধু বলে, আর য়ু শ্যিওর? যে লোকটা মারা গেছে তার নাম 'আহ্‌মেদ'—'ইস্‌মাইল' নয়?

মকবুল যে কাগজটা দেখে খবরটা পড়ছিল, সেটা উর্দুতে ছাপা। সে আবার দেখে নিয়ে বললে, না 'ইস্‌মাইল' নয়। পুরো নাম : নাজির আহ্‌মেদ। আমি যাব সন্ধ্যার দিকে ফটো তুলে আনতে। আপনি আসবেন?

বিশ্ববন্ধু জানতে চায়, শ্রীনগরের কোন এলাকায়?

—ঝিলাম নদী যেখানে ডাহ্‌ল লেকে পড়েছে সেইখানকার একটা হাউস-বোটে!

থমকে গেল বিশ্ববন্ধু। বললে, হাউস-বোট? কত নম্বর বোট? কী নাম?

—সেসব কিছু লেখেনি। গেলেই জানতে পারব।

বিশ্ববন্ধু ওকে জানাল না যে, সেদিন রাত্রে ওই পাড়ায় একটি হাউস-বোটে তার নৈশাহারের নিমন্ত্রণ আছে। কেমন যেন একটা 'প্রিমনিশনে' সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। নাজির আহ্‌মেদ লোকটা লান্স-নায়েক, ইস্‌মাইলোও তাই! বন্দিপুর শ্রীনগর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে, আবার নূরজাহাঁও বলেছিল...কিন্তু তা কেমন করে হবে? শহিদের নাম আহ্‌মেদ, আর ওর সেই হাস্যময় বাল্যবন্ধু হচ্ছে : ইস্‌মাইল!

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘনায়নি। পশ্চিম আকাশটা লালে লাল। সূর্যটাকে কে যেন AK-47-এর গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। ঝলকে ঝলকে রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমাকাশের শুভ্র মেঘের সর্বাঙ্গে।

ঝিলাম নদীর তীরে—সেই যেখানে সেদিন জনমানবের দেখা পায়নি— সেই পাড়াটা এখন লোকে লোকারণ্য। শহিদের মরদেহটি এই একটু আগে এসে পৌঁছেছে। কাচের ঘেরাটোপ আধারে। বার্নহিল হাউস-বোটের ঠিক সামনের ফাঁকা জায়গাটায়। মক্‌বুল ছুটে গেল তার ক্যামেরা নিয়ে।

pathagar.net

আকবর মিঞা এখন বার্ধক্যে নুয়ে পড়েছে। বসে পড়েছে ধুলোর উপরেই। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছে সে। যেন তার পাঁজরাসর্বস্ব কলজে থেকে প্রাণটা এখনি বেরিয়ে যাবে! কে একজন তাকে পিছন থেকে ঠেকা দিয়ে রেখেছে। তার লাঠি ঠুক্‌ঠুক্‌ বিবি---- বোধকরি এতদিনে সে দৃষ্টিশক্তিহীনা—হাত বাড়িয়ে আকাশে কী যেন খুঁজছে। খুঁজছে তার সেই সদাহাস্যময় সন্তানটিকেই।

আর নূরজাহাঁ? আজ তার বেশবাসের দিকে নজর নেই। মাথার চুলগুলো আলুথালু। দোপাট্‌টা লুটাচ্ছে কাদায়। দু'হাত বাড়িয়ে কাচের বাক্সটাকে জড়িয়ে ধরে সে মূর্ছিতা!

বিশ্ববন্ধুর মনে পড়ে গেল সেই অনামা কবির উর্দু শায়েরটা :

"বাল বিখারকে টুটি কবরোঁপ্যে
জব কোই মেহেজবিন রোহ্‌তি হ্যয়
মুঝকো অখসর খয়াল আতা হ্যয়
: মৌৎ কিৎনি হাসিন হোতি হ্যয়।"

আলুথালু চুলে ভাঙা কবরের উপর
যখন কোন বিধবা লুটিয়ে পড়ে কাঁদে
তখন আমার হঠাৎ মনে পড়ে
: আহা! মৃত্যু কী অপূর্ব সুন্দর!

মৃত্যু ওর প্রাণটুকুই কেড়ে নিয়েছে। পাকিস্তানী দস্যুরা কিন্তু ওর সহজাত হাসি মুখখানি বদলাতে পারেনি। সার্থক নামকরণটা করেছিলেন সেই অজানা মেমসাহেব, চার বছরের বাচ্চাটির : স্মাইল!

কাচের আধারে শহিদের সমস্ত দেহটা ফুলে-ফুলে ঢাকা। শুধু সুন্দর মুখখানি শ্বেতপদ্মের মাঝখানে ফুটে আছে! আশ্চর্য! মনে হচ্ছে না লোকটা মারা গেছে। মনে হচ্ছে, কেউ যদি আচমকা ওকে ডেকে ওঠে : 'ইস্‌মাইলো—?'

ও ওই কাচের বাক্সে চট করে উঠে বসে বলবে—'ওওওহ্‌!' □

pathagar.net

পহেলগাঁও থেকে একটা পাকদণ্ডিপথ এঁকেবেঁকে পাহাড়টাকে জড়িয়ে ধরেছে, লীডার নদীর বাম-তীর বরাবর। সে-পথে পড়বে চন্দনবাড়ি, শেষনাগ, পঞ্চতরণী। তারপর সেই পার্বত্য পথের শেষ তীর্থ : অমরনাথ। যেখানে পার্বত্যগুহার অন্তরালে প্রতি বৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমায় যুগে যুগে 'সম্ভাবিত' হন স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ। সে তীর্থপথের কথা বলছি না। বলছি, পহেলগাঁওয়ে লীডার পেরিয়ে যে পথটা এগিয়ে গেছে মমলেশ্বর শিবের মন্দির পানে, তার কথা। শহর থেকে আন্দাজ পাঁচ কি.মি. চড়াই ভাঙলে পৌঁছে যাবে শ্যামল শষ্পাচ্ছাদিত এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে— বৈশরণে। সেখানে না থেমে যদি আরও উপরে উঠতে থাক তাহলে উপনীত হবে সাড়ে তিন হাজার মিটার (11,500 ফুট) উচ্চতায় একটি হ্রদের কিনারে : তুলিয়ান লেক। তাকে ঘিরে আছে বরফে-ঢাকা পাহাড়ের প্রহরীদল। হ্রদের কিনারে ঘনিয়ে আসা ঘননিবদ্ধ পাইন গাছের ফলের মিষ্টি গন্ধ। এ হ্রদের নীল জলে সারা বছরই ভাসতে থাকে রাজহংসের মতো বরফের চাঁই— শীতকালে তো সাদা বরফের কম্বল মুড়ি দিয়ে গোটা হ্রদটা নিঃসাড়ে ঘুম যায়।

ওই পাহাড়ী পাকদণ্ডি পথে, বৈশরণ আর তুলিয়ান হ্রদের মাঝামাঝি জায়গায় একটা প্রকাণ্ড পাথর নিশ্চয় তোমার দৃষ্টি কেড়ে নেবে। অতি প্রকাণ্ড একটা পাথর ঝুঁকে পড়ে লীডার নদীকে যেন দেখছে। অতি-অতি বৃহৎ ভীমকায় পার্চিং স্টোন। স্মরণাতীতকালে, জিওলজিকাল যুগে কোন এক হিমবাহের পিঠে সওয়ার হয়ে সে নেমে এসেছিল হিমালয়ের এক চূড়া থেকে। এই অ্যাত দূর পর্যন্ত। তারপর বোধকরি লীডার নদীর জলে নিজের প্রতিবিম্বটা দেখতে পেয়ে হঠাৎ থমকে থেমে পড়ে। নার্গিস ফুলের মতো ঝুঁকে পড়ে নিজের প্রতিবিম্বটাকে একদৃষ্টে দেখতে থাকে। লক্ষাব্দির পর লক্ষাব্দি কেটে গেছে তারপর। সে যে কত কোটি বছর আগেকার কথা তা আন্দাজের বাইরে। এখন কেউ যদি বলে : এককালে ওই পাথরটার মাথায় টেরনডন অথবা আর্কিঅপটরিক্সরা বিশ্রাম নিত তাহলে কথাটা উড়িয়ে দিতে সাহস হয় না যেন।

সেই মহাভীম পার্চিং-স্টোনের কোল ঘেঁষে ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে একটা বনপথ—'পথ' ঠিক নয়, পথের বিকল্প। পাথরের পর পাথরে পা রেখে যেন স্বর্গে যাবার সিঁড়ি। এমন শ' দুয়েক ধাপ ভাঙলে পাইন আর পপ্‌লার পাড়ায় পৌঁছে যাবে একটি ক্ষুদ্র জনবসতিতে। ছড়ানো-ছিটানো খান কুড়ি দোচালা কুটির। সবই লগ-কেবিন। শতখানেক পাহাড়িয়ার বাস। সকলেই সিয়া সম্প্রদায়ের কাশ্মীরী মুসলমান। গ্রাম বলো গ্রাম, বসতি বলো তাই—কিন্তু ওর একটা জব্বর নাম আছে : খাঁকিবাবা গাঁও। এ তল্লাটে মসজিদ

pathagar.net

নেই, মকবারা নেই। কে বানাবে? অত্যন্ত গরিব ওরা। আছে ওই খাঁকিবাবার সমাধি। বালিপাথরের একটি আয়তক্ষেত্র। তার মাথায় খাড়া করা আর একটি প্রস্তরখণ্ডে কী যেন লেখা—উর্দু না ফার্সি খোদায় মালুম। কেউ পাঠোদ্ধার করতে পারেনি আজও।

গাঁয়ে যে টেলিফোন বা বিজলি বাতি নেই একথা বলাই বাহুল্য। তবে পবিত্র ইদুজ্জুহার দিনে ওই সমাধির চারদিকে ঘিরে বসে গাঁয়ের মানুষ। নামাজ পড়ে, আল্লাহ্‌তালার দোয়া মাঙে। মহরমের দিনে বুড়ো-বাচ্চা দল বেঁধে নেমে আসে পহেলগাঁওয়ে, হাসান-হোসেনের মহামৃত্যুতে বুক চাপড়ে কাঁদতে। খাঁকিবাবা গাঁও সে হিসাবে যেন দুনিয়ার বার। ত্রিসীমানায় চাষবাস হয় না, অনুর্বর পাথুরে মাটি। গাছ কাটা মানা। সরকারি আদেশ। ফলে কাঠুরিয়া বৃত্তিও নামঞ্জুর। গাঁয়ের জওয়ানেরা নেমে আসে পহেলগাঁওয়ে—দিনমজুর হিসেবে খাটতে। মেয়েরা ঘরের কাজকর্ম সারে, সন্তান পালন করে। তারপর সময় পেলে পশমের পোশাক বানায়। নীটিং কাঁটায়। দারুণ দারুণ নকশা তোলে। বুড়োরা ঘরেই থাকে। রোদ উঠলে বাইরে এসে বসে, রোদে্ পিঠ দিয়ে।

খাঁকিবাবার একটা ইতিহাস আছে। বংশ-পরম্পরায় মুখে মুখে চলে আসা সে কাহিনীটি কিন্তু রূপকথা নয়। অলিখিত ইতিহাসেরই একটা বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠা।

ওই যে পাথরে বাঁধাই করা সমাধিটা দেখছ, যার মাথায় পাইনকাঠের নিশানদণ্ডে ত্রিকোণ সবুজ পতাকাটা পৎপৎ করে উড়ছে, ওই সমাধির নিচে শুয়ে আছেন এ গ্রামের আদিপুরুষ। এককালে তিনি বিপ্লবী ছিলেন,—বৃদ্ধ বয়সে হয়েছিলেন এক মরমিয়া সুফি সাধক। কিন্তু যৌবনকালে তাঁর ছিল এক ভিন্নতর রূপ। প্রায় সাত কুড়ি বছর আগে তিনি ছিলেন আংরেজ কোম্পানির এক হাবিলদার। থাকতেন লক্ষ্ণৌ ক্যান্টনমেন্টে। সে সময় ফৌজি জওয়ানেরা—কী হিন্দু, কী মুসলমান—আংরেজ হুকুমৎ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। খাঁকিবাবা সামিল হয়েছিলেন সে বিপ্লবে। স্বহস্তে কচুকাটা করেছিলেন বহু গোরা সৈন্য। তারপর কিল্লার পতন অনিবার্য বুঝতে পেরে দুর্গের প্রাকার টপকিয়ে, দাঁতে নাঙা তরোয়াল নিয়ে সাঁতার কেটে পরিখা পার হয়ে, মিশে যান নিবিড় অরণ্যে। আংরেজ হুকুমৎ তাঁকে ধরতে পারেনি। বহু যোজন পথ অতিক্রম করে ফকিরের ছদ্মবেশে এসে উপস্থিত হন এখানে। আশ্রয় গ্রহণ করেন মহাহিমালয়ের বক্ষসম্পুটে। সংসার ত্যাগ করেছেন। ছদ্মবেশটা ত্যাগ করতে পারলেন না। সাধন-ভজন করেই কাটিয়ে গেলেন বাকি জীবন।

সেই গত শতাব্দির স্বাধীনতাকামী সৈনিকটিকে পরম শ্রদ্ধা করে এ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা। ঝড়-বৃষ্টি-তুষারপাত যে দিন হয় না, সেদিন গাঁয়ের মানুষ পালা করে ওঁর সমাধিমূলে জ্বেলে দিয়ে যায় শ্রদ্ধার চিরাগ। শুধু কি তাই? গাঁওবুড়োরা সলাহ করে প্রতি প্রজন্মে অন্তত একটি উঠতি জওয়ানকে পাঠিয়ে দেয় সেনাবাহিনীতে। তাকে পরতে হয় সৈনিকের খাঁকি পোশাক—খাঁকিবাবার অনুকরণে। তাঁর সেবক হিসাবে।

আমাদের কাহিনীর নায়ক তেমনই এক খাঁকিবাবার সেবক। সংসারে তার আব্বাজান, আম্মা আর একটি চুন্নিমুন্নি ছোটি বহিন। ওর বাপ নিজে নিরক্ষর কিন্তু পহেলগাঁওর

pathagar.net

মিশনারি খ্রিস্টান সাহেবকে ধরে ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেয়। সাহেব দয়াপরবশ হয়ে তাকে ফ্রি-শিপ দিয়েছিলেন। পরে অনুধাবন করেন, ছাত্রটি প্রচণ্ড মেধাবী। প্রতি বছর ক্লাসে প্রথম না হলেও প্রথম তিনজনের মধ্যে স্থান হতো তার। স্কুল-ফাইনাল পাস করার পর চার্চের স্কলারশিপে সে শ্রীনগরে পড়তে যায় ; কিন্তু বেশিদিন চালাতে পারে না। সংসারের কথা চিন্তা করে। আব্বাজান বৃদ্ধ, রোজগার নেই, ছোট বোন সারাদিন জল তুলতে তুলতেই হয়রান।

ও যোগ দিল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে। খাঁকিবাবার সেবকরূপে। সে আজ পাঁচ-সাত বছর আগেকার কথা। এবছর জুন মাসে তার পোস্টিং ছিল বন্দিপুর ক্যাম্পে। হঠাৎ ছয় ঘণ্টার নোটিসে তাকে এসে উপস্থিত হতে হলো কার্গিল রণাঙ্গণে। কী ব্যাপার? জানা গেল, পাকিস্তানী জঙ্গীর দল সীমান্তরেখা বরাবর প্রতিটি পর্বতচূড়ায় বাঙ্কার বানিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজির সঙ্গে পাকিস্তান হকুমতের উজিরে-আজম নওয়াজ শরিফের সৌজন্যমূলক আদান-প্রদান চলছিল। বাজপেয়ীজি একটি অসমসাহসিক কাজ করে বসেছিলেন। অমৃতসর-লাহোরের মধ্যে স্থলপথে একটি 'বাসরুট' চালু করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পাকিস্তানের তা-বড় তা-বড় কর্তারা খুশি মনে সহযোগিতা করে। অটলবিহারী বাজপেয়ী স্বয়ং সেই বাসের যাত্রী হিসাবে স্থলপথে চলে গেলেন লাহোর। মৌলবাদী পাকিস্তানি মুসলমানরা কি কালো পতাকা দেখায়নি? দেখিয়েছিল। কিন্তু সরকারিভাবে উজিরে-আজম নওয়াজ শরিফ সাড়ম্বর আমন্ত্রণ জানালেন বাজপেয়ীজিকে। খণ্ডিত ভারতবর্ষের দুটি বিচ্ছিন্ন অঙ্গ—ভারত ও পাকিস্তান হাতে-হাত মিলিয়ে সৌহার্দ্যের পথে, সমঝোতার পথে, পারস্পরিক উন্নতিতে সাহায্য করবে এমনই ছিল যৌথ প্রতিজ্ঞা। ইংরেজ বিতাড়নের পর বিগত পঞ্চাশ বছরে এমন দুঃসাহসিকতা কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীই দেখাতে পারেননি। বাজপেয়ীজি এবিষয়ে পথিকৃৎ।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতের। এবং পাকিস্তানের। এই আপাতবন্ধুত্বের ছলনার আড়ালে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান দলে দলে ভাড়াটে জঙ্গী সৈন্য পাঠিয়ে সীমান্তরেখার উপর সব কয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান—যা সেই বন্ধুত্বের বাতাবরণে ছিল অরক্ষিত—দখল করে নিল। দ্রাস-বাতালিক-তোলোলিং-টাইগার হিল। গোটা পর্বতশৃঙ্খল।

এ দুঃসংবাদ সাত নম্বর রেস-কোর্স রোডে নিজের অফিসে বসে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রথম জানতে পারলেন এই উনিশশ' নিরানব্বই সালের মে মাসের সাত তারিখে। সাউথ ব্লক থেকে হটলাইন-ফোনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ জানালেন ওই অত্যন্ত মারাত্মক দুঃসংবাদটি। যুদ্ধবিরতির স্বীকৃত রেখা অতিক্রম করে আমাদের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে মৌরসী-পাট্টা গেড়েছে একদল রেগুলার পাকিস্তানী সৈন্য—জঙ্গী ও মুজাহিদিনের ছদ্মবেশে।

বাজপেয়ীজির বিশ্বাস হচ্ছিল না—মাত্র দুই মাস আগে ফেব্রুয়ারিতে লাহোর গভর্নর হাউসে নওয়াজ শরিফের সাদর সংবর্ধনা আর মিঠে মিঠে বুলিগুলোর কথা তাঁর বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল। তবু স্মৃতিচারণের ঘোর কাটিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠালেন

pathagar.net

একান্ত সচিব শক্তি সিন্‌হাকে। আর ওই সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদবানি এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ব্রজেশ মিশ্রকে।

প্রথমে কয়েকটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেল প্রকৃত তথ্য সংগ্রহে এবং সেনাপ্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ করতে। তারপর সারা ভারত এই গোপন সংবাদ জানতে পারল চৌদ্দই মে। পি. টি. আই. আর ইউ. এন. আই.-এর মাধ্যমে। সমগ্র ভারতের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল কার্গিল যুদ্ধের কথা : কার্গিলে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পর্বতচূড়ায় যেসব জঙ্গী অবস্থান করছে তাদের বিতাড়নের জন্য ভারতীয় বাহিনী পূর্ণমাত্রায় নেমে পড়েছে। ছাব্বিশে মে ভারতের তরফে ঘোষিত হল 'অপারেশন বিজয়'। প্রথমে ভারতীয় গোয়েন্দাদের ধারণা ছিল পাহাড়চূড়ার বাঙ্কারগুলিতে শ-তিনেক জঙ্গী লুকিয়ে আছে। পরে শত্রুপক্ষের রেডিও ইন্টারসেপ্ট করে আন্দাজ করা হয় সৈন্যসংখ্যা তিনশ নয়, সাত-আটশ' তো বটেই। তার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সেনাপ্রধান স্বয়ং এসে প্রধানমন্ত্রীকে জনান্তিকে জানিয়ে গেলেন যে, পাকিস্তানী জঙ্গীদের সংখ্যা অন্ততপক্ষে তিন হাজার। তারা নিয়ন্ত্রণরেখার উপরে অবস্থিত নানান পর্বতশিখরে গোপনে বাঙ্কার বানিয়ে দখল করেছে। তারা সবাই আধুনিক সমরশিক্ষিত—কিছু বেতনভুক ইরানী ও আফগান ভাড়াটে সৈন্য আছে বটে, অধিকাংশই পাকিস্তান রেগুলার আর্মির জওয়ান। ওদের বাঙ্কারগুলির প্রত্যেকটি নিয়ন্ত্রণরেখার এপারে। গড়ে পাঁচ কিলোমিটার ভারত ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে।

স্থলসেনার অধিনায়করা অনুমতি চেয়েছিলেন, এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে ওদের পিছন থেকে আক্রমণ করে, ওদের সাপ্লাই বেসটা উড়িয়ে দিতে। প্রধানমন্ত্রী তাতে রাজি হননি। 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'—এ জাতীয় নীতিবাক্যে কবিপ্রকৃতির প্রধানমন্ত্রী প্রভাবিত হয়েছিলেন কি না বলা কঠিন, কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের তিনি নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রমণের অনুমতি দেননি। তার ফলে আজও বিশ্বের দৃষ্টিতে ভারতের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ। বাজপেয়ীজি তাঁর সেনাপ্রধানকে বলেছিলেন : নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম না করে দুশমনদের ভাগাতে হবে।

কাজটা দুরূহ। প্রায় অসম্ভব। একদল সৈন্য ষোলো-আঠারো হাজার ফুট উঁচুতে কংক্রিটের বাঙ্কার বানিয়ে অন্তরীক্ষ থেকে গুলি চালাবে, আর তার বিপক্ষ দল খোলা আকাশের নিচে পাকদণ্ডি পথে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসে বাঙ্কার দখল করবে—এ হয় না। গল্প-উপন্যাসে বা সিনেমায় হতে পারে। বাস্তবে হয় না। হতে পারে না।

কী আশ্চর্যের কথা—কী অপরিসীম অসম্ভব কথা—বাস্তবে তাই কিন্তু হয়েছিল।

আমাদের জওয়ানের দল এক হাতে রাইফেল, অন্য হাতে প্রাণবায়ুকে মুঠোয় ধরে গুটি গুটি পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠেছে। অসম যুদ্ধে একের পর এক বাঙ্কার, একের পর এক পর্বতশৃঙ্গ ছিনিয়ে নিয়েছে শত্রুর কবল থেকে। মানছি, আমাদের বহু বীর যোদ্ধা শহিদ হয়েছেন কিন্তু প্রতিটি পর্বতশিখর থেকে জবরদখলকারীদের নির্মূল করেছেন। হয় তারা খতম হয়েছে, অথবা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেছে। শতাব্দির এই শেষ লড়াইয়ে ভারতীয় যোদ্ধারা নিরঙ্কুশ জয়লাভ করেছে—এ কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

pathagar.net

এসব কাহিনী আপনারা ইতিমধ্যে বিস্তারিত জেনেছেন। সাংবাদিকের দল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং দৈনিক সংবাদপত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন।

যে কথা বলছিলাম, আমাদের কল্পনার কম্বল-মুড়ি দেওয়া বাস্তব কাহিনীর নায়ক শরিফ ইসলাম বদলির অর্ডারটা পেল জুন মাসের শেষ সপ্তাহে। সে 'রেগুলার আর্মি'র জওয়ান, কিন্তু ডেপুটেশনে একটা বি. এস. এফ. ক্যাম্পে পোস্টেড—শ্রীনগরের আশি কিলোমিটার উত্তরে বন্দিপুর বি. এস. এফ. ক্যাম্পে। ওরা দু'জন, ও আর কনস্টেবল ভীমকায় জওয়ান হরগোবিন্দ্ সিং। ওরা দু'জনে একই কোম্পানিতে একসঙ্গে আছে দীর্ঘদিন। থাকে একই সি-টাইপ কোয়ার্টার্সে। পাশাপাশি নেয়ারের খাটে। একজন শিখ, একজন মুসলমান; কিন্তু গভীর দোস্তি ওদের।

খিদ্মদগারটি এসে জানিয়েছিল, আপ দোনোকো সেলাম দিয়া ডিপ্টি কমান্ডার-সা'ব।

'সেলাম দিয়া' মানে 'ডেকে পাঠিয়েছেন'। কড়া ফৌজি হুকুমের শুগার কোটেড সৌজন্য। খিদ্মদগারটি আরও বলেছিল ডিপ্টি-সাব বসে আছেন ডি. আই. জি.-সাহেবের কোয়ার্টার্সে। দপ্তরে নয়। সেখানে ওদের যেতে বলেছেন। তুরন্ত্।

দু'বন্ধু তড়িঘড়ি ধড়াচূড়া পরে হাজির হয়েছিল ডি. আই. জি.-সাবের ড্রইংরুমে। ডি. আই. জি. বাঙালী। ত্রিপুরায় বাড়ি। নাম শিশিরকুমার চক্রবর্তী। অমায়িক মানুষ। অনায়াসে শর্টস পরে জওয়ানদের সঙ্গে ভলিবল খেলেন অথবা ব্যাডমিন্টন।

চক্রবর্তী সাহেবের বৈঠকখানায় বসেছিলেন ডেপুটি কমান্ডান্ট হরিন্দর রাজ। ওরা দু'জনে ঘরে প্রবেশ করে অ্যাটেনশনে যৌক্ত স্যালুট করল। হরিন্দর রাজ বললেন, সিট ডাউন বয়েজ।

এটা ফৌজি কেতা-বিরুদ্ধ। ফৌজি সোপান মোতাবেক ফারাকটা চার-পাঁচ-ছয় ধাপের। এখানে জওয়ান, কনস্টেবল বা সেকেন্ড লেফটেন্যান্টকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অর্ডার শুনতে হয়। কিন্তু ফৌজি নির্দেশ হচ্ছে 'মিলিটারি অর্ডার'। দু'জনে চক্রবর্তী সাহেবের দু'খানি চেয়ার দখল করে বসল।

হরিন্দর রাজ বললেন, কংগ্র্যাচুলেশনস কমরেডস! উপর থেকে অর্ডার এসেছে ছয় ঘণ্টার নোটিসে তোমাদের দু'জনকে শ্রীনগর এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে হবে। সমস্ত স্থলসৈন্যের ভিতর থেকে মাত্র চব্বিশজন অসমসাহসীকে বেছে নেওয়া হচ্ছে, একটা অত্যন্ত দুরূহ কাজের দায়িত্ব দিতে। তোমাদের সেজন্যই অভিনন্দন জানাচ্ছি—গোটা আর্মির মধ্যে চুনাও করে তোমাদের দু'জনকে ওঁরা নির্বাচিত করেছেন। এখান থেকে শ্রীনগর যেতে ঘণ্টা দুই-আড়াই লাগবে। সুতরাং তোমরা দু'জন ঘণ্টা-তিনেকের ভিতর তৈরি হয়ে এখানে এসে রিপোর্ট কর।

শরিফ ইসলাম প্রশ্ন করে, কাজটা শেষ হলে আমরা আবার এখানেই ফিরে আসব তো? মানে, আমাদের সব কিছু মালপত্র—

কথার মাঝখানেই হরিন্দর রাজ বলে ওঠেন, দিন সাত-দশের জন্য যা তোমাদের প্রয়োজন হবে শুধু তাই নিয়ে যাও। বাকি মাল আমার কোয়ার্টার্সে অথবা ডি. আই. জি.-সাহেবের কোয়ার্টার্সে রেখে যাও।

pathagar.net

হরগোবিন্দ্ বলে, আমরা কোথায় যাচ্ছি, স্যার?

হরিন্দর রাজ প্রত্যুত্তর করার আগেই চক্রবর্তী-সাহেবের আর্দালী একটা ট্রেতে করে চার পেয়ালা কফি আর বিস্কিট নিয়ে ঘরে ঢুকল। তার পিছন-পিছন মিসেস মুক্তা চক্রবর্তী। তিনি কাপগুলি ট্রে থেকে তুলে ওদের চারজনের হাতে দিলেন।

হরগোবিন্দ্ স্তম্ভিত। শরিফ ততটা নয়। সে বুঝে নিয়েছে, যে কাজে ওদের পাঠানো হচ্ছে সেখান থেকে ওরা এই বন্দিপুরে ফিরে আর নাও আসতে পারে। সাতদিনের মধ্যেই প্রমোশন পেয়ে ফৌজি সোপানের সব কটা ধাপ ডিঙিয়ে একেবারে 'শহিদ' হয়ে যাবার সম্ভাবনা ষোলো আনা। কোথাও কিছু নেই উঠে দাঁড়িয়ে সে স্যালুট করল।

চক্রবর্তী-সাহেব অবাক হয়ে বলেন, কী ব্যাপার?

ইসলাম দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, আপনারা যা আশঙ্কা করছেন তা হবে না, স্যার। যতই দুঃসাধ্য হোক, কাজটা সেরে আমরা দু'জন আবার জিন্দা ফিরে আসব।

—অফ্ কোর্স! আমরাও তো তাই আশা করছি।

—তাহলে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আশঙ্কা করেছিলাম, আপনারা ধরে নিয়েছেন আমরা ফিরব না। তাই এত আপ্যায়ন আমাদের। মাতাজি স্বহস্তে আমাদের কফির কাপ তুলে দিচ্ছেন।

ঘরের পরিবেশ নষ্ট হলো না মুক্তাদেবীর প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে। তিনি বললেন, না বাবা! তুমি ভুল বুঝেছ। আমার চোখে তোমরা দু'জন তো সন্তোষের সমান। সন্তুকে কি আমি নিজে হাতে খাবার পরিবেশন করি না?

সন্তোষ চক্রবর্তী ওঁর সপ্তমবর্ষীয় পুত্র। স্কুলে পড়ে। ত্রিপুরায়। তবে হরগোবিন্দ্ অথবা শরিফ ইসলাম তাকে ভালভাবেই চেনে।

শ্রীনগর বিমানবন্দরে নামতেই এগিয়ে এলেন একজন অফিসার। করমর্দন করে নিজ পরিচয় দিলেন, দেখতে চাইলেন ওদের মিলিটারি আইডেন্টিটি কার্ড। সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আপনাদের দু'জনের জন্য গাড়ি প্রস্তুত। যেতে আমাদের ঘণ্টাতিনেক সময় লাগবে। আপনারা কি তার পূর্বে কিছু...

শরিফ বাধা দিয়ে বলে, প্রয়োজন নেই। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি আমরা?

অফিসার হেসে বললেন, কোথায় যাচ্ছেন সেটা পৌঁছলেই জানতে পারবেন। কীসে যাচ্ছেন তা বলি : আপনারা যাচ্ছেন একটা ওয়েপন কেরিয়ারে। আপনারা দলে আছেন আটজন।

বোঝা গেল মিলিটারি মুভমেন্টটা গোপন রাখতেই প্রকাশ্য স্থানে গন্তব্যস্থলের নামটা উনি উল্লেখ করলেন না।

ওয়েপন কেরিয়ারে আলাপ হলো কয়েকজন সহযাত্রীর সঙ্গে। সকলেই গ্রেনেডিয়ার গ্রুপের। এঁরাও ওদেরই মতন কয়েক ঘণ্টার নোটিসে সমবেত হয়েছেন শ্রীনগর বিমানপোতাশ্রয়ে। দু'-এক ঘণ্টা আগে-পিছে। অধিকাংশই পাঞ্জাবি গ্রেনেডিয়ার : গুরুদয়াল

pathagar.net

সিং, কুলদীপ সিং, দুর্গেশ সিং, হরভজন সিং, এছাড়া স্যাম রবার্টস, শিবচরণ মেহতা। শরিফের খেয়াল হলো দলে সে-ই একমাত্র মুসলমান। যেমন রবার্টস একমাত্র খ্রিস্টান আর মেহতা একমাত্র হিন্দু। ওরা কেউই জানে না কোথায় যাচ্ছে, অথবা কেন যাচ্ছে। মোটামুটি জানা আছে—ওরা যাচ্ছে কোনো একটা কঠিন যুদ্ধ করতে। কার বিরুদ্ধে তাও জানা। কিন্তু 'ভেনুটা' কী? লড়াইটা হবে কোথায়? কেউ জানে না।

শ্রীনগর থেকে সোনমার্গ হয়ে কার্গিলের রাস্তায় একটু অগ্রসর হতেই একটা বেস ক্যাম্পে পৌঁছানো গেল। জায়গাটার নাম : গুমরি। নিয়ম হচ্ছে সমতলবাসী জওয়ানদের এই গুমরি-ক্যাম্পে রুখে দিয়ে অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা আবহাওয়াকে সইয়ে নিতে হয়। যাকে বলা হয়, 'অ্যাক্লামাটাইজ' করে নেওয়া। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে বাতাসের চাপ যায় কমে, অভাব হয় অক্সিজেনের। হঠাৎ অতিরিক্ত উচ্চতায় উঠলে অনেকে ফুসফুস বা হৃদ্‌পিণ্ডে চাপ বোধ করে। তাই অন্তত তিন ধাপে সমতলবাসী জওয়ানদের সইয়ে নেবার ব্যবস্থা। সচরাচর নয় হাজার, বারো হাজার এবং পনের হাজার ফুট উচ্চতায় জওয়ানের সহ্যক্ষমতা অনুসারে আটচল্লিশ ঘণ্টা অথবা বাহাত্তর ঘণ্টা অতিবাহিত করতে হয়। তারপর সমতলের জওয়ানদের সতেরো-আঠারো হাজার ফুট উচ্চতায় যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়। গুমরি বেস-ক্যাম্পের বাঙালী ডাক্তারবাবু ক্যাপ্টেন বাণীব্রত বসু ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে দিলেন। আর উপসংহারে বলেছিলেন, অবশ্য আপনাদের ক্ষেত্রে তিন ধাপ নয়, মাত্র এক ধাপ—এই গুমরিতেই আটচল্লিশ অথবা বাহাত্তর ঘণ্টা অ্যাক্লেমাটাইজ করে আমরা আপনাদের ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেব।

গ্রেনেডিয়ার গুরুদয়াল সিং সবিনয়ে প্রশ্ন করে : কেঁও ডক্টর সাব? হম্ সাত-আট জওয়ানকো পর কেঁউ এতনা মেহেরবানি?

ক্যাপ্টেন বাণীব্রত হাসতে হাসতে বলেছিলেন, যেহেতু চুনাও করার পর আপনাদের রিপোর্টে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি, আপনারা সবাই পাহাড়িয়া অঞ্চলের লোক। আপনাদের 'ঘর' ঔর 'ঘরওয়ালী' মিনিমাম তিন-চার হাজার ফুট (ন-শ' থেকে বারোশ' মিটার) উচ্চতায় বাস করেন।

কনস্টেবল হরভজন বলে ওঠে, এক্সকিউজ মি, ডক্‌ডর সা'ব। আমাদের ঘরওয়ালীরা কে কত উচ্চতায় বাস করেন তাও আপনারা জেনে নিয়েছেন? কে জানিয়েছে? 'র' না মিলিটারি ইনটেলিজেন্স?

ডক্টর বাসু হো-হো করে হেসে উঠে বলেন, না মিস্টার সিং—ওটা কথার কথা। আপনাদের মধ্যে কত জন ম্যারেড, কত জন ব্যাচিলার তাও আমি জানি না।

আটচল্লিশ ঘণ্টা ওরা নিষ্কর্মা অপেক্ষা করল গুমরিতে। একেবারে নিষ্কর্মা নয়। রুটিনমাফিক ব্যায়াম করতে হলো। সকাল-বিকাল ওদের রক্তচাপ পরীক্ষা করলেন ডক্টর বাসু। একবার বসিয়ে, একবার 'সুপাইন'। মায় ই. সি. জি.-ও করানো হলো। আটজনই উত্তীর্ণ হলো পরীক্ষায়। পরদিন ভোর রাত তিনটেয় ওরা রওনা হবে। সেদিন সন্ধ্যায় গুমরি-ক্যাম্পের কমান্ডেন্ট ক্যাপ্টেন গোলাম মোস্তাফা আবার ওদের 'সেলাম' দিলেন,

pathagar.net

ওদের বসতে বললেন ওঁর ভিজিটার্স চেয়ার দখল করে। বললেন, 'আপনারা নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে, অত্যন্ত হাই অল্টিচ্যুডে একটি কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ করার অভিপ্রায়ে আপনাদের এখানে সমবেত করা হয়েছে। কাল ভোর-রাত তিনটেয় আপনারা রওনা হবেন। কাজটা কীভাবে সম্পন্ন করা হবে তার বিস্তারিত নির্দেশ অকুস্থলে পৌঁছলেই জানতে পারবেন। আমি শুধু একটু প্রাথমিক 'ব্রিফিং' করে দেব। আপনারা জানেন, পাকিস্তানী রেগুলার আর্মি ছদ্মবেশে এবং কিছু ভাড়াটে আফগান ও ইরানি সৈন্য নিয়ে কার্গিল পর্বতচূড়ার অনেকগুলি শিখর দখল করে বসে আছে। তার ভিতর দ্রাস আমাদের দখলে এসে গেছে। বাতালিক গত সপ্তাহে এসেছে আমাদের দখলে। গতকাল এইটিথ্ গ্রেনেডিয়ার দখল করেছে 'তোলোলিং পীক'। এখন আপনারা যাচ্ছেন টাইগার হিলের চূড়ায় যেসব দুশমন জবরদখল করে আছে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। আপনারা কাল সূর্যোদয়ের আগেই অন্ধকার থাকতে থাকতে, পৌঁছে যাবেন টাইগার হিলের বেস ক্যাম্পে, হোলিয়াল গাঁয়ে। সেখানে ইনচার্জ হচ্ছেন কর্নেল সুরিন্দর সিং। তিনিই আপনাদের বিস্তারিত অর্ডার দেবেন—কখন—কীভাবে আপনারা আক্রমণ করবেন। আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি। এই অত্যন্ত কঠিন কাজে আপনারা নির্বাচিত হওয়ায় আপনাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এনি কোশ্চেন?

গ্রেনেডিয়ার কুলদীপ সিং প্রশ্ন করে, টাইগার হিলের উচ্চতাটা কত, স্যার?

—অ্যারাউন্ড সাড়ে-আঠারো হাজার ফুট। অর্থাৎ প্রায় 5,640 মিটার।

লেঃ রবার্টস জানতে চায়, আমরা কি স্নো বুট পাব? হাই অল্টিচ্যুড জ্যাকেট?

—অফ্ কোর্স! না হলে অতটা উচ্চতায় লড়াই করা অসম্ভব। আমাদের খবর : টাইগার হিলের চূড়ায় চারশ' থেকে পাঁচশ' জঙ্গী দুশমন আছে। তাদের আছে সবরকম আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।

হরগোবিন্দ্ বলে, ওরা পাঁচশ', আর আমরা আট জন?

ক্যাপ্টেন মোস্তাফা হেসে বললেন, ইয়েস—এইট! নট 'সেভেন সামুরাই!'

এরা কেউ জবাব দিল না। ক্যাপ্টেন মোস্তাফা নিজেই হেসে উঠে বললেন, নো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। আই ওয়াজ জাস্ট জোকিং। আপনাদের আগে আট-দুকুনে ষোলো জন জড়ো হয়েছেন হোলিয়াল বেস ক্যাম্পে। সবাই এইটিথ্ গ্রেনেডিয়ার গ্রুপের। আপনারা সর্বসমেত চব্বিশ জন সারপ্রাইজ অ্যাটাকে অংশ নেবেন।

পরদিন শেষরাত্রে ক্যাপ্টেন মোস্তাফা স্বয়ং উপস্থিত থেকে ওদের বিদায় জানালেন। হেডলাইট না জ্বেলে প্রকাণ্ড সরীসৃপের মতো আটজন যোদ্ধাকে নিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলল ওয়েপন কেরিয়ারটা—গুমরি থেকে হোলিয়াল গ্রামের দিকে। খানা-খন্দে আকীর্ণ পথ। বোমা বিস্ফোরণে পথের সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন। দক্ষ ড্রাইভার সেগুলি এড়িয়ে ওদের পৌঁছে দিল টাইগারহিলের পাদদেশে। হোলিয়াল বেস ক্যাম্পে তখনো সূর্যোদয় হয়নি।

একটু বেলায় ওদের প্রাতরাশ শেষ হতেই ডাক পড়ল এখানকার সর্বময় কর্তা কর্নেল সুরিন্দার সিং-এর দফতরে। বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞ সৈনিক তিনি। ওদের বুঝিয়ে দিলেন টাইগার হিলের গুরুত্ব এবং সেই শিখর জয়ের পরিকল্পনা।

pathagar.net

এখন ওরা আর মাত্র আটজন নয়। ইতিপূর্বেই যারা জড়ো হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই এই এলাকায় দীর্ঘদিন কঠিন লড়াই করেছে। সবাই অষ্টাদশ গ্রেনেডিয়ার গ্রুপের। এই গ্রুপই তোলোলিং পর্বতশৃঙ্গটা শত্রুমুক্ত করে দখল নিয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ গ্রেনেডিয়ার নামটা অপরিবর্তিত থাকলেও মানুষগুলো অধিকাংশই বদলে গেছে। গত পরশু যারা অতর্কিত আক্রমণ করেছিল তাদের কিছু হয়েছে শহিদ, কিছু আহত, কিছু বা পরিশ্রান্তিতে নিতান্ত কাহিল। টাইগার হিল আর তোলোলিং দুটি পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব খুব বেশি না হলেও তাদের চরিত্র একেবারে ভিন্ন জাতের। তোলোলিং যেন ঢেউ-এর পর ঢেউ। একটার পর আর একটা একটু বেশি উঁচু, পরেরটা আরও একটু উঁচু। তারা পরস্পর যুক্ত। অপরপক্ষে টাইগার হিল যেন দলছুট একক পর্বতশৃঙ্গ। উত্তরাংশে, পাকিস্তানের দিকে তবু কিছুটা ঢালু। ভারতের দিকে একেবারে মাটি থেকে খাড়া দেওয়ালের মতো। শোনা গেল এমনই টাইগার হিলের মাথায় ওরা গড়েছে গোটা দশ-বারো বাঙ্কার। 'জঙ্গী' নাম নিয়ে ওই বাঙ্কারে যারা ঘাপটি মেরে বসে আছে তারা সবাই রেগুলার পাক সেনাবাহিনীর নর্দার্ন লাইট ইনফ্যান্ট্রির বিভিন্ন ব্যাটেলিয়ানের বেতনভুক সেনা। তাদের হেপাজতে শুধু এল. এম. জি. নয়, আছে সমস্ত রকমের আধুনিক সমরাস্ত্র। প্রতিটি বাঙ্কারে আছে রকেট-লঞ্চার, AK-57, 60 মি.মি. মর্টার, জি. থ্রি রাইফেলস, স্টিংগার মিসাইল, অ্যাক-অ্যাক গান, এমনকি গ্যাস মাস্ক। এগুলি আমাদের সৈন্যরা বাঙ্কার দখল করার পর উদ্ধার করে। শুধু গোলা-বারুদ নয়, খাদ্যদ্রব্য যা মজুদ ছিল তাতে ওরা অনায়াসে আরও মাস দুয়েক ওখান থেকে লড়াই চালিয়ে যেতে পারত। নেহাৎ যাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল তারা 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'-এর ব্যবস্থা করে, তাই সব কিছু ফেলে ওদের রাতারাতি পালিয়ে যেতে হয়।

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সৈন্যদল গত পঞ্চাশ বছরে বারে বারেই সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। হরি সিং-এর আমলে, নেহরুর আমলে, শাস্ত্রীজি আর ইন্দিরাজির আমলে। কিন্তু এমন অসম যুদ্ধ কোনোবারই করতে হয়নি। ওরা পাহাড়ের চূড়ায় আর আমরা সমতলে—পাথর টপকে টপকে আমরা উপরে ওঠার চেষ্টা করছি আর ওরা উপর থেকে ক্রমাগত পাথর গড়িয়ে দিচ্ছে—এমনটা আগে হয়নি।

তাই সমর-নেতারা টাইগার হিল জয়ের জন্য ব্যবস্থা করেছেন 'সারপ্রাইজ অ্যাটাক'-এর—অতর্কিত আক্রমণের।

স্থির হয়েছে, একদিনের মতো জল আর খাবারের প্যাকেট নিয়ে আঠারো গ্রেনেডিয়ারের ওই চব্বিশজন বাছা-বাছা জওয়ান দোসরা জুলাই সন্ধ্যারাতে পাহাড়ে চড়তে শুরু করবে। দোসরা জুলাই, বুধবার, ছিল কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া। কৃষ্ণ-তৃতীয়ার সমতলেই চাঁদ ওঠে রাত দশটার কাছাকাছি। ওখানে পুবদিকে আছে কি-যেন-নাম একটা পাহাড়ের চূড়া। হিসাবমতো তৃতীয়ার চাঁদের উদয় হবে রাত বারোটা নাগাদ। ফলে, আধারাতে আধাপথ উঠে ওরা নোঙর গাড়বে। বড় বড় পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে পরের সারাটা দিন টেনে ঘুমাবে। যাতে চূড়াবাসী স্যাঙাতেরা দিনের বেলা বাইনোকুলারে তাদের দেখতে না পায়।

pathagar.net

পরদিন তেসরা জুলাই ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী সন্ধ্যারাত থেকে শুরু করবে নিরবচ্ছিন্ন কামান দাগা—ক্রমাগত দনাদ্দন্।

এজন্য গোলন্দাজেরা তাদের কামান সাজিয়েছে সুবিধামতো উঁচু পজিশনে। কামান মোটামুটি দু'জাতের। প্রথম আমাদের খুবই পরিচিত নাম : বোফর্স কামান। এগুলি 'হাই-রাইজ গান'। তার বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই কামানের স্টেনলেস স্টিলের নল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিরও বেশি কোণ রচনা করে দাগা যায়। ফলে সামনের পাহাড়ের মাথা টপকিয়ে ওপারের লক্ষ্যবস্তুর উপর গোলা ফেলা যায়। সে লক্ষ্যবস্তুকে কামানদার চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু এরিয়াল ফটোগ্রাফিতে প্রাপ্ত ম্যাপের নির্দিষ্ট অবস্থানে আঁক-কষে কাঁটা ঘুরিয়ে সেই লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করা যায়। সমরনায়কেরা চেয়েছিলেন সন্ধ্যারাত থেকে এভাবে পাহাড়চূড়া ডিঙিয়ে পাকিস্তানী সরবরাহ বেসগুলিকে উড়িয়ে দিতে। তাহলে ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়বে সেগুলি রক্ষা করতে। সেই সুযোগে যারা পাথরের আড়ালে দিবানিদ্রা দিয়েছে তারা গুটি গুটি গুঁড়ি মেরে পাহাড়ের মাথায় উঠতে থাকবে। এদিকে আরও একজাতের কামান দাগা হবে—হাভ্রেড থার্টি এম. এম. গানস্। এগুলি 'ডাইরেক্ট ফায়ারিং' কামান। সমতলের যুদ্ধে এগুলি খুবই কার্যকরী। গোলা প্রায় জমির সমান্তরালে সোজাসুজি চলে। কিন্তু আমাদের সেনারা আছে কামান-গোলার চেয়ে অনেক নিচের সমতলে। ফলে তাদের আহত হবার সম্ভাবনা নেই। এই কামানের গোলা গিয়ে সরাসরি আঘাত করবে বাঙ্কারে। বাঙ্কারের দেওয়াল ছয়-ইঞ্চি (পনের সেন্টিমিটার) পুরু রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের। কিন্তু মুহুর্মুহু গোলার আঘাতে সে-দেওয়ালও ভেঙে পড়ে।

কর্নেল সুরিন্দর সিং এভাবে ওদের বুঝিয়ে দিতে দিতেই কামরায় এসে উপস্থিত হলেন এইটিন্থ গ্রেনেডিয়ার্স-এর সেকেন্ড ইন কমান্ড লেফটেনান্ট কর্নেল ডি. এ. পৌখল। সামরিক সৌজন্য বিনিময়ের পর তিনি জানালেন—দু'দিন আগে যারা তোলোলিং দখল করেছিল, তাদের সবাইকে বেস-হসপিটালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দু'-চারজনের আঘাত মারাত্মক—অধিকাংশই ফার্স্ট এইড নিয়ে যে-যার গ্রামে ফিরে যাবে দশ দিনের বিশ্রাম নিতে।

সেটাই নাকি কার্গিল রণাঙ্গণের অলিখিত নিয়ম। অসম যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এলেই প্রথম পুরস্কার : দশ রোজ ছুট্টিকা তোফা।

আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য লিখেছিলেন :

> *তেসরা জুলাইয়ের রাতটা ভারতের সামরিক ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হতে চলেছে।*
>
> *বিকেলবেলা দ্রাসে পৌঁছলাম বটে, কিন্তু ফৌজি কড়াকড়ির জেরে তখন এক পাও এগোনোর উপায় নেই। দ্রাসে মিলিটারি ব্রিগেডের সামনে দাঁড় করানো মাল্টি-ব্যারেল রকেট লঞ্চার। শহরের প্রতিটি কোণে বফর্স কামান। সব কামানের মুখই ঘুরে গিয়েছে টাইগার হিলের দিকে। ... সব মিলিয়ে মোট ১৩২টা কামান দাগা হবে বরফে ঢাকা একটা পাহাড়ের চূড়া লক্ষ্য করে।"*

boiRboi.blogspot.com

সেই পাহাড়ের নামটা টাইগার হিল। ভারতের প্রায় একশ' কোটি মানুষের অগোচরে তাদের জন্য প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘন অন্ধকারের মধ্যে পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এগিয়ে চলেছে চব্বিশজন জওয়ান। যারা নাকি সবচেয়ে দুঃসাহসী, সবচেয়ে কষ্টসহিষ্ণু, মৃত্যুঞ্জয়ী দেশসেবক। ওরা জানে, ওরা সবাই ফিরে আসবে না। তবু নিঃশঙ্কচিত্তে ওরা এগিয়ে চলেছে। যেন 'গানস্ অব নাভারন' ছায়াছবির শ্যুটিং হচ্ছে।

পয়লা জুলাই ওদের ফল-ইন করিয়ে যাবতীয় নির্দেশ দেবার পর এইটিন্থ গ্রেনেডিয়ার্স-এর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড লেঃ কর্নেল পৌখল বলেছিলেন, কমরেডস্! তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি একটি করে সামান্য উপহার নিয়ে এসেছি। একটি করে মুখ-খোলা লেফাফা। তাতে দু'শীট করে কাগজ আছে। তোমরা বাড়িতে তোমাদের কোনো প্রিয়জনকে চিঠি লিখে, লেফাফার উপর ঠিকানা লিখে, খামটি বন্ধ করে আমাকে কাল সকালে ফেরত দিও। আমরা তাতে ডাকটিকিট সেঁটে ক্যুরিয়ার সার্ভিসে শ্রীনগরে পাঠিয়ে দেব। সেখানে জেনারেল পোস্ট-অফিসে সব চিঠি পোস্ট করা হবে। তোমাদের কুশল সংবাদের জন্য বাড়ির লোকেরা নিশ্চয় ব্যগ্র হয়ে আছেন।

ওরা একে একে লেফাফাগুলি নিতে থাকে, কিন্তু গোল বাধল সেকেন্ড লেফটেনান্ট শরিফ ইসলামের বেলা। সেটি গ্রহণ না করে সে হঠাৎ প্রশ্ন করে ওঠে, আগার আপ বুরা না মানে তো এক সওয়াল পুঁছু?

—ইয়েস! হোয়াটস ইয়োর কোশ্চেন, মাই ফ্রেন্ড?

—আপনি কি প্রকারান্তরে বলতে চাইছেন যে, এটাই আমাদের বাড়িতে চিঠি লেখার শেষ সুযোগ?

রীতিমতো বিব্রত হয়ে পৌখল বলেন, না-না, তা কেন?

—ফিরে যদি আসতেই পারি, তাহলে লেফাফার উপর ডাকটিকিটগুলো কি আমরা নিজেরাই সাঁটতে পারব না স্যার?

লেঃ কর্নেল পৌখল কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না।

আঠেরো দিন পরের কথা। একুশে জুলাই, বুধবার। দশ দিনের ছুটি কাটিয়ে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট শরিফ ইসলাম আজ খাঁকিবাবা গ্রাম ছেড়ে তার কর্মস্থল বন্দিপুরে ফিরে যাচ্ছে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা গ্রাম থেকে দুশ' ধাপ নেমে এসে পিচ-মোড়া সড়কে সেই ভীমকায় পার্চিং-স্টোনের কাছে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের গাঁয়ের বীর সৈনিককে—খাঁকিবাবার বর্তমান প্রজন্মের যোদ্ধা-সৈনিককে বিদায় জানাতে। গ্রামসুদ্ধ সবাই জেনে গেছে শরিফের বীরত্ব কাহিনী। টাইগার হিল জয় করে সে জিন্দা ফিরে এসেছিল। জিন্দা, লেকিন আহত। ওর বাম বাহুমূলে বিদ্ধ হয়েছিল একটা বুলেট। বেস-ক্যাম্পের ডাক্তার বাণীব্রত বসু সিসার গোলকটা বার করে দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলেন। দশ দিনের ছুটি পেয়েছিল শরিফ। এখনো তার বাঁ-হাতটা স্লিং বাঁধা। আরও দিন-সাতেক ওটা বেঁধে রাখতে হবে।

pathagar.net

পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে অক্ষত ডান হাতটা নেড়ে সে গ্রামবাসীদের বিদায় জানাল। ওর বৃদ্ধ আব্বাজানকে দেখা যাচ্ছে, মাকেও ;আর ছোট বোন ক্রমাগত হাত নেড়ে চলেছে।

খাঁকিবাবা গাঁয়ের সকলেই সিয়া সম্প্রদায়ের। তারা জানে, আফগানিস্তানে বসে যিনি এই পাক আক্রমণের কলকাঠি নাড়ছেন, সেই ওসামা বিন লাদেনের মূল লক্ষ্যটা কী। সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহ থেকে যাবতীয় অমুসলমানকেই শুধু নয়, অ-সুন্নি মুসলমানদেরও তিনি বিতাড়িত করতে চান। আদমসুমারিতে মানুষের মূল ধর্মটাই শুধু লেখা হয়—হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান। লেখা হয় না— কে যাদব, কে দলিত ;কিংবা কে প্রটেস্টান্ট, কে রোমান ক্যাথলিক ;অথবা কে সিয়া, কে সুন্নি। কাশ্মীরের মুসলমানদের নব্বই ভাগ সিয়া শ্রেণীর। তাই জঙ্গী আক্রমণকারীরা শুধু হিন্দুর গ্রাম লুট করেই থামে না, লুণ্ঠিত হয় মুসলমান জনপদও। তাদের অপরাধ এই যে, তারা সুন্নি নয়, সিয়া সম্প্রদায়ের।

শরিফ পহেলগাঁও বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখল শ্রীনগরগামী একটা বেসরকারি বাস দাঁড়িয়ে আছে। ছাড়বে মিনিট কুড়ি পরে। বসার আসন নেই। বেশ কিছু যাত্রী রড ধরে দাঁড়িয়ে। উপায় নেই। সুটকেসটা বাসের মাথায় তুলে দিয়ে ও বাসে উঠল। বাঁ হাতটা স্লিং বাঁধা। ডান হাতে ধরল উপরের রডটা। সামনেই একটি দ্বৈত-আসনে বসেছিল এক অল্পবয়সী দম্পতি। সম্ভবত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। জানলার দিকে বসা তরুণী বধূটি পরেছে জিন্‌স্-এর টাইট প্যান্ট আর ফুলহাতা সোয়েটার। চুল তার বব্‌কাট, চোখে রৌদ্র-বারণ চশমা। ছেলেটি কোট-প্যান্ট পরা। শরিফেরই প্রায় সমবয়সী। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শরিফকে বলল, য়ু বেটার সিট ডাউন হিয়ার!

—নো, থ্যাংক্স!—সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল শরিফ।

ছেলেটি শুনল না। ওর অনাহত বাহুমূল ধরে জোর করে বসিয়ে দিল। বলল, আপনি যুদ্ধরত সৈনিক তা আপনার পোশাক-পরিচ্ছদেই বুঝছি। তার উপর আপনি আহত। এটুকু সৌজন্য দেখাতে না পারলে লোকসমাজে আমি মুখ দেখাব কী করে?

এরপর আর কথা চলে না। শরিফ আর আপত্তি করল না। দাঁড়িয়ে থাকলে তার আহত বাঁ-হাতটা পুনরায় আহত হতে পারে। বসল মেয়েটির পাশে। মেয়েটি তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা চকোলেট-বার বার করে তার এক-তৃতীয়াংশ শরিফের দিকে বাড়িয়ে ধরে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, মেরি নাম : মেরী জোন্‌স্। আপকা শুভনাম?

শরিফ চকোলেট-বারটা মুখে পুরে দেখল, বাকি অংশটা ওরা স্বামী-স্ত্রীতে ভাগ করে নিচ্ছে। বলল, শরিফ ইসলাম।

—শরিফ ইসলাম? মোহামেডান। সিয়া ইয়া সুন্নি?

শরিফ লক্ষ্য করে দেখে আশেপাশের অনেকেই কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে পড়ে শুনছে। এরা সকলেই স্থানীয় গাঁয়ের মানুষ। শরিফ তাই বলে, লেটস্ স্পিক ইন ইংলিশ!

—অল রাইট! আর য়ু সিয়া অর সুন্নি?

শরিফ বলল, লুক হিয়ার মিসেস্ জোন্‌স্। আয়াম অ্যান ইন্ডিয়ান বাই ন্যাশ্‌নালিটি অ্যান্ড এ মুসলিম বাই রিলিজিয়ন। নাথিং মোর।

pathagar.net

মেয়েটি চুপ করে কী যেন ভেবে নিল। তারপর ইংরেজিতে বলল, আপনি কেন ধরে নিলেন আমি মিসেস্ জোন্স্? আয়াম অলসো অ্যান ইন্ডিয়ান বাই ন্যাশ্নালিটি অ্যান্ড আ 'মিস্' বাই ম্যারিট্যাল স্ট্যাটাস।

শরিফ অবাক হয়ে ইংরেজিতে জানতে চায়, উনি তাহলে কে?

—কে? ও? আমার বয় ফ্রেন্ড।

শরিফকে চুপ করে যেতে দেখে মেয়েটি আবার বলে, আপনাদের সমাজে কোর্টশিপ আর ডেটিং নেই বলে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছেন, তাই না?

শরিফ জবাব দিল না। মেয়েটিই পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, আপনার বাম বাহুমূলে চুমুটা কে খেয়েছে? আপনার ম্যারিটাল স্ট্যাটাসটা জানি না বলেই জানতে চাইছি।

শরিফ কৌতুক বোধ করে ওর প্রগল্ভতায়। বলে, আমি অবিবাহিত। বাহুমূলের চুম্বনটি করেছিল পাকিস্তানের একজন ভাড়াটে সৈনিক। আমি অবশ্য প্রতিচুম্বন করেছি তার হৃদপিণ্ডে। শেষ চুম্বন।

মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বলে, ঘটনাটা ঘটল কোথায়? কার্গিল রণাঙ্গনে নিশ্চয়, কিন্তু কোন অঞ্চলে?

—টাইগার হিলে।

—বাই জোভ! তেসরা জুলাই?

—আপনি কি করে জানলেন?

—সংবাদপত্রে। তেসরা জুলাইয়ের টাইগার হিল জয় তো এখন ইতিহাস। আপনি কি এইটিন্থ গ্রেনেডিয়ার গ্রুপের?

—আশ্চর্য! তাও জানেন আপনি?

—জানি। কারণ আমার কাজিন স্যামও আছে ওই গ্রুপে। তাকে চেনেন? স্যাম? লেফটেন্যান্ট স্যামুয়েল রবার্টস?

সজ্ঞান মিথ্যাভাষণ করল শরিফ : না।

কারণ ছিল। এই আনন্দময় পরিবেশে ও স্বীকার করতে চাইছিল না যে, স্যামকে সে-রাত্রে ও স্বচক্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে অতল খাদের দিকে গড়িয়ে পড়তে দেখেছে।

আবার ওই মানসপটে ফুটে উঠল সেই বিচিত্র, বীভৎস, বীরত্বপূর্ণ রাত্রির ঘটনাগুলি। টাইগার হিল জয় করেছিল ওরা। এক এক করে এগারোটা বাঙ্কারই দখল করেছিল। ওর সে-রাত্রে মনে পড়ে যাচ্ছিল স্কুলে-পড়া সেই ইংরেজি কবিতাটি : 'চার্জ অব দ্য লাইট ব্রিগেড'। সেই 'ক্যানন্ টু রাইট অফ দেম, ক্যানন্ টু লেফ্ট অব দেম... ভলিড অ্যান্ড থান্ডার্ড!' মাথার উপর দিয়ে ক্রমাগত ছুটছে গোলা—এদিক থেকে ওদিক এবং ওদিক থেকে এদিক। সেই কামান গর্জনে ক্ষণিক বিদ্যুৎচমকে চিনে নিতে হচ্ছিল—কোন্টা কালো পাথর, কোন্টা নিকষ কালো খাদ। হামাগুড়ি দিয়ে তিল তিল করে উঠে যাচ্ছিল পর্বতশিখরে।

ওরা পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রওনা হয়েছিল চব্বিশজন তরতাজা জওয়ান।

pathagar.net

ফিরে এসেছিল সতেরজন যুদ্ধক্লান্ত বিজয়ী সৈনিক। কম-বেশি সকলেই আহত। হিসাবের বাকি সাতজন... আর তাদের মধ্যে ছিল এই মেয়েটির সেই কাজিন-ব্রাদার : স্যাম। লেঃ স্যামুয়েল রবার্টস!

তবে শ্রীনগর থেকে যে আটজন সবশেষে যোগদান করেছিল তাদের ভিতর থেকে ওই একজনই হারিয়ে গেছে। ফিরে এসেছিল আট নয়, 'সেভেন সামুরাই'! পাঁচ তারিখ সকালে। মাতালের মতো টলতে টলতে। কুলদীপের বুকের বাঁ-দিকেই বুলেটটা বিঁধেছিল। আল্লারসুল রক্ষা করেছেন তাকে—অথবা কে জানে হয়তো গুরুগোবিন্দ্‌জী। হৃদপিণ্ডটাতে লাগেনি বুলেট। শেষপর্যন্ত সে বেঁচে গেছে। তাকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে এসেছিল অমিতবিক্রম ভীমকায় হরগোবিন্দ সিং। সে নিজে ছিল আশ্চর্যজনকভাবে অনাহত। গ্রেনেডিয়ার দুর্গেশ সিং-এর ডান পায়ে বিঁধেছিল গুলি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শরিফের অনাহত ডান কাঁধে ভর দিয়ে সে ফিরে আসে। দলের বাকি কজন...

—আপনি শ্রীনগরে কোথায় উঠবেন?

স্মৃতিচারণ স্তব্ধ হয়ে গেল শরিফের। মেয়েটির প্রশ্নের জবাবে বলল, আমি শ্রীনগর পর্যন্ত যাবই না। নেমে পড়ব কোকরনাগে।

—সেখানেই বুঝি বাড়ি আপনার?

—না। আমার গ্রাম পহেলগাঁওয়ের কাছাকাছি। সেখান থেকেই আসছি এখন। কোকরনাগে আমার এক বন্ধুর বাড়ি—সড়ক থেকে কিছুটা ভিতরে, গোবিন্দ্‌ওয়াড়া গাঁয়ে।

—সেখানে কদিন থাকবেন বুঝি? বন্ধুর বাড়িতে?

—না, মিস্ জোন্স। বন্ধুর স্ত্রীকে একটি চিঠি আর একটি উপহার পৌঁছে দিয়ে আজই বিকালের বাস-এ শ্রীনগরে ফিরে যাব। সেখানেও থাকব না। আমাকে যেতে হবে আরও মাইল পঞ্চাশ উত্তরে একটা বি. এস. এফ. ক্যাম্পে। ওই ক্যাম্পে পোস্টিং আমার।

মিস্ জোন্স্ কৌতূহলী হলো। জানতে চাইল, যদি না কিছু মনে করেন, আপনার বন্ধুর উপহারটা কী? আপনি দেখেছেন সেটা?

—হ্যাঁ। আমরা দু'জন 'ইয়ারিংটা' শ্রীনগরে সেন্ট্রাল মার্কেট থেকে পছন্দ করে কিনেছিলাম। দেখুন তো, কেমন হয়েছে—

হিপ পকেট থেকে একটা ভেলভেটের ছোট্ট কেস বার করে খুলে দেখাল। ইমিটেশন পার্ল বসানো জড়োয়া ঝোলা দুল।

মিস্ জোন্স বললে, দারুণ দুলটা। আমারই লোভ হচ্ছে—

শরিফ হেসে বলে, সরি ম্যাডাম, আপনাকে লোভটা সংবরণ করতে হবে। আমার বন্ধু এটা তার স্ত্রীকে উপহার দিচ্ছে একটা বিশেষ অকেশনে।

—কী আশ্চর্য! আমি কি তাতে বাধা দিচ্ছি? বাই দ্য ওয়ে, বিশেষ অকেশনটা কী?

শরিফ সবিস্তারে বলতে থাকে ঘটনাটা।

যারা টাইগার হিল-এর লড়াইয়ে গিয়েছিল, বরং বলা উচিত যারা জিন্দা ফিরে এসেছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল আহত। তারা ছুটি পেয়েছে ফিরে আসার পর। আঘাতের

pathagar.net

পরিমাণ অনুযায়ী। কেউ দশ দিন, কেউ তিন সপ্তাহ, কেউ পুরো মাস। দুর্ভাগ্য হরগোবিন্দের। তার গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। ফলে তাকে সরাসরি বন্দিপুর ক্যাম্পে ফিরে যেতে হয়েছে। কিন্তু শরিফ জানত, হরগোবিন্দের বউ বর্তমানে সন্তানসম্ভবা। এই সে প্রথম মা হতে চলেছে, সাদির তিন বছর পরে। শরিফ বন্ধুকে বলেছিল, তুই 'আর্নড-লীভ' নে না। 'আর্নড লীভ' জমেনি তোর? জবাবে হরগোবিন্দ্ বলেছিল, জমেছে, লেকিন আর চার মাহিনা বাদ আমাকে ছুটি নিতেই হবে। ওকে নার্সিংহোমে ভর্তি করাতে। আমাদের গাঁও—গোবিন্দ্ওয়াড়ার ত্রিসীমানায় ভাল লেডি ডক্টর নেই, নার্সিংহোম বা হাসপাতালও নেই।

সব এন্তাজাম ওকেই করতে হবে। তাই এখন বেফজুল ছুটিটা ও নষ্ট করতে চায় না। তবে সন্তানধারণের সপ্তম মাসে ওদের ধর্মে কী একটা উৎসব হয়। আসন্নপ্রসবাকে নতুন পোশাক পরতে হয়। গাঁওওয়ালেদের মিঠাই খাওয়াতে হয়। প্রিয়জনেরা ওই উৎসবে আসন্ন জননীকে সাধ্যমতো কিছু উপহার দেয়। হরগোবিন্দ্ তো ছুটি পায়নি, তাই বন্ধুর হাতে এই উপহারটি তার সন্তানসম্ভবা প্রিয়তমাকে উপহার পাঠাচ্ছে। সে বার বার বলেছে, আমার পিতাজি তোকে খুব আদরযত্ন করবেন, গাঁয়ের তালাওয়ে তুই আস্নান করে নিবি। দুপুরে ওখানেই দুটি খেয়ে বিকালের বাসে শ্রীনগর হয়ে বন্দিপুরে ফিরে আসিস। আমি বাবাকে চিঠি লিখে দেব।

মিস্ জোন্স্ জানতে চায়, বন্ধুর স্ত্রীকে আপনি দেখেছেন? আলাপ আছে তার সঙ্গে?

—না। সে সুযোগ হয়নি। এবারও হবে কি না জানি না। শুনেছি, গ্রামের শিখ পরিবার খুব কনজারভেটিভ!

—আমি হলেও এসময় বরের বন্ধুর সামনে বার হতাম না।

—কেন?

—ইন অ্যান এস্বারাসিং স্টেট অব 'অ্যানান্সেশান'। পেট-কোঁচড়ে নেয়াপাতি ডাবটা লুকাবো কেমন করে?

বাসটা অবশেষে এসে দাঁড়াল কোকরনাগে। এখানে পনেরো মিনিটের বিশ্রাম। বাসস্ট্যান্ডের গা-ঘেঁষে ছুটে চলেছে ফেনোচ্ছল একটা পাহাড়ি ঝরনা—কলমুখর একটি শাখা বা উপশাখা হয়তো লীডারের। ওরা তিনজনই নামল বাস থেকে। শরিফের এখানে যাত্রা শেষ আর ওরা দু'জন একটু হাত-পা খেলিয়ে নিতে। ছাদ থেকে শরিফের সুটকেসটা পেড়ে নামানো হলো। মেরী জোন্স-এর বয়-ফ্রেন্ড বলল, কাম-অন মিস্টার ইসলাম, নদীর ধারে ওই পাথরটার উপর বস। তোমার একটা ফটো তুলে নেব।

শরিফ প্রতিবাদ করে, আমার কেন? মেরীর ফটো তোল।

—বেশ তো, তোমরা দুজনেই বস, পাশাপাশি।

ফটো তোলার পর্ব মিটলে শরিফ ভদ্রলোককে বলে, এতক্ষণ একসঙ্গে এলাম, অথচ তোমার নামটাই জেনে নেওয়া হয়নি।

ছেলেটি মানিব্যাগ খুলে তার নামাঙ্কিত একটি কার্ড এগিয়ে দিল : এ. সি. জোন্স, এরিয়া ম্যানেজার...

pathagar.net

শরিফ অবাক হয়ে বলে, বাঃ! তুমিও জোন্স?

—মানে? এতে অবাক হবার কী আছে?

—মেরী তোমার কে হয়?

মিস্টার জোন্স অবাক হয়ে মেরীর দিকে তাকায়। সে নির্বিকারে চিউইংগাম চিবিয়ে চলেছে। জোন্স শরিফকেই এবার প্রতিপ্রশ্ন করে, তুমি কী ভেবেছিলে? আমার আন্টি? না কি গ্র্যান্ড-মা?

শরিফ মেরীর দিকে ফিরতেই সে চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে সরাসরি ওর দিকে তাকায়। সপ্রতিভভাবে বলে, ভেব না, আমি তোমার লেগ-পুলিং করছিলাম। আমি একটা তথ্য যাচাই করে দেখছিলাম মাত্র। আমার এক বান্ধবী বেমক্কা একজন আর্মি অফিসারকে বিয়ে করে বসে। তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম—অফ অল পার্সনস্ সোলজার কেন? ও জবাবে বলেছিল, কারণ সোলজার মাত্রই দারুণ ক্রেডুলাস! তাদের যা বলা যায়, তারা তাই গপ্ করে গিলে ফেলে। বিশ্বাস করে বসে! তা কথাটা সত্যি কিনা—

বাসের কন্ডাকটার ওদিক থেকে হাঁকাড় পাড়ে, আ যাইয়ে আপলোগ। বস্ আভভি ছুটেগি।

মেরী তার হাতটা নেড়ে বলল, টা-টা! বেটার ল্যাক্ নেক্সট্ টাইম!

রাস্তার ধারেই একটা বড় স্টেশনারি দোকান। এত বেলায় এখন খদ্দেরপাতি কম। শরিফ এগিয়ে গিয়ে কাউন্টারে-বসা লোকটার কাছে জানতে চাইল, গোবিন্দ্ওয়াড়া গ্রামটা কোন দিকে।

দোকানদার ভদ্রলোক ওকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, আপনি কি সেখানে যেতে চান? কিন্তু সে পথে তো বাস যায় না। গোবিন্দ্ওয়াড়া এখান থেকে আট-নয় মাইল ভিতরে। আপনাকে হেঁটেই যেতে হবে।

শরিফ জানতে চাইল কোকরনাগে কেউ কি সাইকেল ভাড়া দেয়?

—কিন্তু আপনার বাঁ-হাত তো স্লিং-বাঁধা, আপনি সাইকেল চালাবেন কেমন করে?

—এক হাতেই হ্যান্ডেল ধরে। কারণ আমি ও গাঁয়ে একজনের সঙ্গে দেখা করে এখনই ফিরে আসব। বিকেল চারটের এক্সপ্রেস বাসটা ধরে আমাকে আজই শ্রীনগরে ফিরে যেতে হবে।

দোকানদার বললেন, তাহলে এক কাজ করুন। আমার সাইকেলটা নিয়ে যেতে পারেন। সন্ধ্যার আগে ওটা আমার ওটা দরকার নেই।

—এই চার-পাঁচ ঘণ্টার জন্য কত ভাড়া দিতে হবে? ডিপোজিটই বা কী দিতে হবে?

ভদ্রলোক বললেন, ভাড়া লাগবে না। ডিপোজিটও লাগবে না। গোটা কাশ্মীর রাজ্যে জওয়ানদের ডিপোজিট তাদের রণসজ্জা।

শরিফ বলল, থ্যাঙ্কু। সেক্ষেত্রে আমার সুটকেসটা কেন অহেতুক বয়ে নিয়ে যাই? আর আমার আইডেন্টিটি কার্ডটা রাখুন।

pathagar.net

—ডিপোজিট হিসাবে?

—না। সাইকেল চালাতে গিয়ে যাতে ওটা হারিয়ে না ফেলি।

বাসের পিচমোড়া সড়ক থেকে একটা কাঁচা রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে মাঠের মাঝখান দিয়ে। দু'পাশে জোয়ার অথবা ভুট্টার ক্ষেত। পথের সমান্তরালে নাচতে নাচতে ওকে এগিয়ে দিল সেই পাহাড়ি ঝরনাটা। তারপর দিগন্ত-অনুসারী কাঁচা-সড়ক। গোযানের গভীর ক্ষতচিহ্ন বুকে। জনমানব বিশেষ নজরে পড়ে না। পথে মাইলপোস্টও নেই। কিন্তু আন্দাজ সাত-আট মাইল পাড়ি দেবার পর, গ্রামের কাছাকাছি এসে মানুষজনের সাক্ষাৎ পেল। গ্রামে পৌঁছে একজন পথচলতি মানুষকে প্রশ্ন করায় সে দেখিয়ে দিল : সর্দার গুরুবচন সিংজীকি কোঠী? বহ্ দেখিয়ে। সর্দারজি চারপাইমে শোয়া হুয়া হ্যঁায়।

একতলা কোঠাবাড়ি। অনেকটা বাগান। আপেল, ন্যাসপাতি গাছে ভরা বাগান। একটি বড় গাছের ছায়ায় চারপাই বিছিয়ে রোদ পোয়াচ্ছেন বৃদ্ধ সর্দারজি। হরগোবিন্দ্-এর মতোই বিশালকায় বলিষ্ঠ গঠন। মাথার চুল খোলা। বোধহয় স্নানান্তে রোদে শোকাচ্ছেন।

গেট খুলে ওকে বাগানে ঢুকতে দেখে উঠে বসলেন বৃদ্ধ। চোখের উপর রোদ আড়াল করা হাতটা বিছিয়ে প্রশ্ন করেন : কৌন?

শরিফ দূর থেকে জবাব দেয় না। সাইকেলটা স্ট্যান্ডে তুলে এগিয়ে আসে। নত হয়ে নমস্তে জানিয়ে হিন্দিতে বলে, আমার নাম শরিফ ইসলাম। আপনি হয়তো হরগোবিন্দের কাছে আমার নাম শুনে থাকবেন। আমি তার সহকর্মী এবং দোস্ত।

একটু দেরি হলো জবাবটা দিতে। কী যেন সামলে নিয়ে বৃদ্ধ বললেন, হাঁ বেটা। সুনা হ্যয় তুম্হারা নাম। বৈঠো।

তারপর বললেন, গোবিন্দ্ চিঠি লিখে জানিয়েও দিয়েছে যে, তুমি ছুটি কাটিয়ে ফেরার পথে এ গাঁয়ে আসবে। তা তোমার এক হাতে তো স্লিং বাঁধা—এতটা পথ সাইকেল চালিয়ে এলে কী করে?

শরিফ লাজুক হাসল। সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, আপনার তবিয়ৎ কেমন আছে বলুন? বন্দিপুরে ফিরে গেলেই তো গোবিন্দ্ জানতে চাইবে।

এ প্রশ্নের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কোথায়? কিন্তু শরিফের মনে হলো বৃদ্ধ যেন প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন—যেন হরগোবিন্দের মনে ও প্রশ্ন উঠতেই পারে না। অনেকক্ষণ স্তব্ধ বসে থেকে বৃদ্ধ যে জবাবটা দিলেন তা একেবারে অন্য প্রসঙ্গ : তুমি তো তোমার সেই খাঁকিবাবা গাঁও থেকে আসছ—সে গাঁয়ে তো খবরের কাগজ যায় না, তাই নয়?

শরিফও প্রতিপ্রশ্ন করে, কেন চাচাজি? দু'-চার দিনের মধ্যে তেমন কোনো খবর কি বার হয়েছে?

অসীম মনোবলে সদ্যসন্তানহারা পিতা সামলে নিলেন নিজেকে। বুঝতে পারেন : দিন-আষ্টেক আগে—তেরই জুলাই বন্দিপুরের বি. এস. এফ. ক্যাম্পে যে মর্মান্তিক নৃশংস দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে সে-সম্বন্ধে কিছুই জানে না এই ক্লান্ত সৈনিকটি। ওই অভুক্ত আহত শ্রান্ত সৈনিকটি জানে না যে, টাইগার হিল জয়ী 'টাইগার' হরগোবিন্দ্ সিং আজ

BanglaBook.net

শহিদ! ওদের ক্যাম্পের ডি. আই. জি. শিশিরকুমার, তাঁর দেহরক্ষী ভাস্করণ, ডেপুটি কমান্ডান্ট হরিন্দর রাজ থেকে শুরু করে মুনিয়ারাজান্না, তার স্ত্রী ভারতী, এবং ফটকের প্রহরীদ্বয়—হরগোবিন্দ্ আর ইস্মাইলো—

না। ভুল হলো আমার। 'ইস্মাইলো' নামটা জানা ছিল না সর্দার গুরুবচন সিংজির। তাঁর জ্ঞান মতে হরগোবিন্দের সঙ্গে ডিউটি দিচ্ছিল ল্যান্সনায়েক নাজির আহ্মেদ।

শরিফ পুনরায় বলে, ক্যা হুয়া জি? অখবরমে কুছ খবর...

ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন বৃদ্ধ। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—ওই শ্রান্ত আহত সৈনিকটিকে জানানো হবে না এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে পরাজিত কৌরবপক্ষের তিন প্রতিহিংসাকামী—অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য আর শকুনী যেমন পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করে হত্যা করেছিল পাণ্ডব সন্তানদের, ঠিক তেমনি ওই পরাজিত পাকিস্তানী দুশমনের একটা প্রতিহিংসাকামী দল ঘুমন্ত বন্দিপুরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করে। পৈশাচিক উল্লাসে তারা মৃত্যু মহোৎসবে মেতেছিল। আহা! শরিফবেটা তা এখনো জানে না। না, তাকে জানতে দেওয়া হবে না। এক হাতে হ্যান্ডেল ধরে এতটা পথ তাকে আবার সাইকেল চালিয়ে ফিরে যেতে হবে তো?

—চাচাজি! আখবরমে কুছ...

—হাঁ বেটা। তোমাদের টাইগার হিল দখলের খবরটা বিস্তারিতভাবে ছাপা হয়েছে সব কাগজেই...

হঠাৎ দূর থেকে একটা শিকল নাড়ার শব্দ ভেসে এল। ঘাড় ঘুরিয়ে শরিফ দেখতে পেল সদর দরজার শিকল ধরে ভিতর থেকে কে যেন ঝাঁকাচ্ছে। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। বলেন, বৈঠো বেটা। বহুমাঈনে মুঝে বোলাতি—

ধীর পদক্ষেপে সদ্যসন্তানহারা বৃদ্ধ এগিয়ে চললেন বাড়ির দিকে—আসন্নপ্রসবার আহ্বানে। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন টলে টলে উঠছেন। যেমন আকণ্ঠ মদ্যপানান্তে মাতালের মতো টলতে টলতে ফিরে এসেছিল সেদিন টাইগার হিল জয়ী সপ্তদশ শ্রান্ত সৈনিক। আর সবার পিছনে অনাহত ভীমকায় মধ্যমপাণ্ডব—হরগোবিন্দ্, পিঠে তার মুমূর্ষু সহযোদ্ধা!

একটু পরে একগ্লাস পানীয় হাতে উনি ফিরে এলেন। বললেন, পী লেও বেটা। বহুমাঈ বলছেন যে, তুমি ওই স্নানঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এস। ও ঘরে বালতিতে জল তোলাই আছে, সাবুন ঔর আঙোছাভি রাখা আছে। লেকিন পহিলে বহ্ সরবৎ তো পী লেও।

শরিফ হাত বাড়িয়ে সরবৎটা নেয়। জানতে চায়, মাতাজি কোথায়? কেমন আছেন তিনি?

বৃদ্ধ বলেন, ওর তবিয়ৎ ভালো নেই বেটা। শুয়ে আছেন।

একটু পরে দশ-বারো বছরের একটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে ওকে স্নানঘরের দিকে ডেকে নিয়ে গেল। ফিরে এসে দেখে কয়েকজন প্রতিবেশী এসে দাওয়ায় বসেছেন। বৃদ্ধ বললেন, এঁরা তোমার কাছে টাইগারহিল জয়ের কাহিনীটা শুনতে চান।

এ-কথা জানালেন না যে, প্রতিবেশীদের উনি আগেই বলে দিয়েছেন, হরগোবিন্দের

pathagar.net

মৃত্যুর কথাটা উত্থাপন না করতে। ওই আহত সৈনিকটা এতটা পথ সাইকেলে চেপে ফিরে যাবে। আহা! ওকে এই দুঃসংবাদটা এখন না জানানোই মঙ্গল।

শরিফ তার অভিজ্ঞতার ঝাঁপি খুলে বসল। কিন্তু সে একটু হতাশও হলো। শ্রোতৃবৃন্দ নির্বাক শুনে যাচ্ছে— কোনো উৎসাহ, উদ্দীপনার লেশমাত্র নেই। এমনকি হরগোবিন্দ্ কীভাবে তার আহত সহযোদ্ধাকে পিঠে বহন করে পাহাড় থেকে নেমে এসেছিল শুনেও কারও মুখে কোনও প্রশংসাবাক্য শোনা গেল না। একটু হতাশই হলো শরিফ। তার নজর হলো কয়েকজন প্রতিবেশিনী বাইরে থেকে এসে বাগানের গেট খুলে টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে অন্দরমহলের দিকে এগিয়ে গেলেন। কেন, কী বৃত্তান্ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

ঘণ্টাখানেক পরে সেই অল্পবয়সী মেয়েটি—সে বোধকরি পাশের বাড়ির একটি কুমারী কন্যা—এসে খবর দিল : খানা তৈয়ার!

প্রতিবেশীরা ওকে মৌখিক ধন্যবাদ জানিয়ে, নমস্তে করে, নীরবে একে একে বিদায় হলেন। গুরুবচন সিংজি ওকে নিয়ে এসে বসালেন ঘরের ভিতর। পাশাপাশি দুটি আসন পাতা। ওঁরা আহারে বসলেন। হাতে সেঁকা রুটি, আলু-মটর, কোয়াশ-এর তরকারি, অড়হরের ডাল, গোস্, দহি এবং ঘরে করা মিষ্টান্ন। সেই ছোট মেয়েটিই সব কিছু পরিবেশন করে গেল। হরগোবিন্দের মা অথবা স্ত্রী অন্তরালেই থেকে গেলেন। অভ্যর্থনার ত্রুটি হলো না, কিন্তু নিরুত্তাপ সৌজন্য। প্রচণ্ড ভুখ লেগেছিল শরিফের। তার লক্ষ্য হলো না বৃদ্ধ প্রায় কিছু খেলেনই না।

আহারান্তে শরিফ বলল, চাচাজি, হরগোবিন্দ্ আমার হাতে ভাবীজির জন্য একটা চিঠি আর একটা তোফা পাঠিয়েছে। সেটা কি—

নির্লিপ্তের মতো চিঠিখানা আর কৌটোটা নিয়ে বৃদ্ধ চলে গেলেন ভিতরে। শরিফ আবার এসে বসল বাগানের চারপাইতে। এমন নিরুত্তাপ উদাসীনতায় শুধু হতাশ নয়, কিছুটা বিরক্তও বোধ করছিল সে। একটু পরে বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন অন্দরমহল থেকে। শরিফ বলল, আমাকে তো আবার অনেকটা পথ ফিরতে হবে। কোকরনাগে এক্সপ্রেস বাসটা আসবে চারটের সময়। আমি এবার তাহলে যাই?

বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে কী যেন চিন্তা করছিলেন। ওর কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে পেয়ে বলেন, উঁ? কী বললে?

—অনুমতি দিন, চাচাজি! আমি এবার রওনা হই।

—হাঁ! বহ্ তো সহি বাৎ। এৎনা দূর তুম্কো যানা পড়েগা।

শরিফ উঠে দাঁড়ায়। সাইকেলটার দিকে এক পা অগ্রসর হতেই আবার শিকল ঝঞ্ঝনা শোনা গেল। বৃদ্ধ বললেন, জরাসা ঠাহ্র যাও, বেটা! বহুমাঈ সায়েদ কুছ্ কহ্না চাহ্তি হ্যায়।

আবার তিনি এগিয়ে গেলেন সদর দরজার দিকে। অন্তরালবর্তিনীর সঙ্গে দু'-একটা কথা বলে এদিকে ফিরলেন। শরিফকে বললেন, ইধার আ-যাও, বেটা। বহুমাঈ তুম্কো কুছ্ কহ্নে চাহ্তি। আও বহুরানি!

pathagar.net

রীতিমতো অবাক হয়ে যায় শরিফ। পায়ে পায়ে দাওয়ায় উঠে দাঁড়ায়। বৃদ্ধ ভিতর দিকে দৃক্‌পাত করে বললেন, ইয়ে শরমানেকা কোই ওয়াক্ত নেহি হ্যয় রে বেটি। আ-যা।

মাথায় আধো-ঘোমটা তুলে ভিতর থেকে বার হয়ে এল হরগোবিন্দের স্ত্রী। সেই ছোট মেয়েটির হাত ধরে। মেয়েটা এখন অঝোরে কাঁদছে!

বজ্রাহত হয়ে গেল শরিফ ইসলাম।

দীর্ঘদেহী আসন্নপ্রসবা সম্পূর্ণ নিরাভরণা। ফেনশুভ্র তার বাস। সদ্য বিধবার বেশ। হাতে সেই ভেলভেটের কৌটাখানি। নতনেত্রেই মেয়েটি বললে, আপ্ আভিতক্ নেহি জানতে, সায়েদ। পিতাজি ভি আপকো নেহি বাতায়া... বন্দিপুরমে তেরা তারিখ রাত দো বাজে...

বাকিটা বলতে পারল না। উদ্‌গত অশ্রুকে আড়াল করতে মুখে আঁচল চাপা দিল। শরিফ প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে : লেকিন কৈসে?

বৃদ্ধ হিন্দিতে বললেন, 'হ্যাঁ বেটা। তোকে বলিনি। এতটা পথ তো তোকে এক হাতে হ্যান্ডেল ধরে সাইকেল চালাতে হবে। লে, পড়লে...'

একগুচ্ছ পুরনো সংবাদপত্র ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বিভ্রান্ত পদচারণে বৃদ্ধ অন্দরমহলের দিকে চলে গেলেন। ছোট মেয়েটি তাঁর হাতটা ধরে নিয়ে গেল।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বজ্রাহত শরিফ ইসলাম আর তার বন্ধুপত্নী বিগতভর্তা গর্ভিণী নারী। একটু সামলে নিয়ে সে নিঃশব্দে নামিয়ে রাখল শরিফের পদপ্রান্তে জড়োয়া দুলজোড়া। অলঙ্কারধারণের অধিকার শেষ হয়ে গেছে তার প্রথম যৌবনেই। হঠাৎ সে মুখ তুলে শরিফের চোখে চোখে তাকাল। তরলিত মুক্তার মতো দুটি অশ্রুবিন্দু তার দু-চোখে টলমল করছে। অস্ফুটে ওর শুষ্ক ওষ্ঠাধর শুধু উচ্চারণ করল : ভাইয়া...

শরিফের দুরন্ত ইচ্ছা করছিল ওই মেয়েটির করমুষ্টি অনাহত হাতটা বাড়িয়ে চেপে ধরতে। কিন্তু তা পারল না। শুধু প্রত্যুত্তরে বললে, 'কহো বহিনজি?'

না, ভাবীজি নয়, বহিনজি।

—থোড়া ঠাহর যাও। আভি সাইকেল পর মৎ চড়না। উস্ চারপাই পর বৈঠ যাও আধাঘণ্টা।

ধীরে ধীরে সেও ভিতরে চলে গেল।

শরিফ ওর অনুরোধটা শুনল। অনুরোধ নয়, নির্দেশ। ছোটি বহিনের আদেশটা। ফিরে এসে বসল চারপাইতে। খবরের কাগজগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকে। বিশ্ব চরাচরে সে যেন একলা। স্তব্ধ মধ্যাহ্নে শুধু একটানা একটা ক্লান্ত ঘুঘুর আর্তডাক। শরিফ বুঝতে পারে, শেষ মুহূর্তে বৃদ্ধ কেন ওকে 'তুমি' ছেড়ে 'তুই' সম্বোধন করলেন। সেই খণ্ড মুহূর্তে শরিফ হয়ে গেছিল হরগোবিন্দ্। আর কেন ওই সদ্যবিধবা তাকে 'ভাই' বলে ডেকে একটু বিশ্রাম করে যেতে বলল। একটু সামলে নিতে না পারলে ও হয়তো সাইকেলের ব্যালান্স রাখতে পারবে না। আহত বাঁ-হাতটা...

সেই মেয়েটি— মেরী জোন্স, কী যেন বলেছিল? জওয়ানেরা নাকি খুব বিশ্বাসপ্রবণ

BanglaBook.org

হয়। দেশের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সহজ-সরল মানুষগুলো সহজে ধরতে পারে না অপরের কুচক্রী মিথ্যাচারণ। মধ্যমপাণ্ডবের মতো শক্তিধর হরগোবিন্দও একই ভুল করেছে। গেরুয়া রঙের ফেস্টুনে গুরুমুখীতে লেখা সেবাধর্মের বাণী দেখে ওর সন্দেহ হয়নি যে, আগন্তুকেরা সেবাব্রতী শিখ সম্প্রদায়ের নয়, পৈশাচিক হত্যালীলায় উন্মুখ ছদ্মবেশী যমদূত।

কাগজগুলো গুছিয়ে রেখে ও উঠে দাঁড়াল। কারও কাছ থেকে বিদায় নেবার প্রয়োজন নেই। জড়োয়া দুলটা পড়ে আছে দ্বারপ্রান্তে। থাক। স্ট্যান্ড থেকে সাইকেলটা নামিয়ে ও গেটের দিকে পা বাড়াল। ঠিক তখনই পিছন থেকে কে যেন ডেকে ওঠে : 'বাবুজি?'

শরিফ থমকে থেমে পড়ে। দেখে, ওকে ডাকছে সেই প্রতিবেশিনীর ছোট্ট মেয়েটা। সে এগিয়ে আসে। হাত বাড়িয়ে ভেলভেটের দুলটা শরিফকে দিতে চায়। সঙ্গে একটা চিরকুট। বলে, 'দিদিনে ভেজা হ্যায়।'

শরিফ সে দুটি হাতে নিয়ে দেখে চিরকুটে লেখা আছে—

'ভাইয়া,

'ইয়ে তোফা ভাবীজিকে লিয়ে। যব্ বহ্ আয়েগী—

তেরি বহিন।'

চোখ তুলে শরিফ দেখতে পায় জানলায় দু-হাতে দুটি গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘাঙ্গী বিগতভর্তা হরগোবিন্দের স্ত্রী। তার নামটাও ও জানে না। অথচ সে ওর 'বহিন'। শরিফকে দেখতে পেয়ে সেই বহিন তার হাতটা নাড়ল। বিদায় জানাবার ভঙ্গিতে। যেমন জানিয়েছিল ওর সহোদরা বহিন খাঁকিবাবা গাঁয়ের পাদদেশে ভীমকায় পার্চিং স্টোনটার পাশে দাঁড়িয়ে।

শরিফ তার এই বহিনের পাশেও যেন দেখতে পেল একটি ভীমকায় পার্চিংস্টোন। আহত সহযোদ্ধাকে পিঠে নিয়ে যে হিমালয় টপকাতে পারত। শুধু শিখ সম্প্রদায়ের সেবাধর্মের ফেস্টুনটা দেখে যে বিশ্বাসপ্রবণ বেঅকুফটা... খ্যয়ের— ছোড় বহ্ বাত— বহ্ 'শের-ই-টাইগারহিল' তো অব শহিদ বন চুকা। □

pathagar.net

Humpty Dumpty sat on a wall;
A push from the back & they had a great fall.
All the neighbour's knaves and their A.K.47
Couldn't stop H & D going atop the wall again